ত্রিপুরায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য

মোহিত পুরকায়স্থ

অধ্যাপক, বীরবিক্রম কলেজ, আগরতলা

কলিকাতা

ফার্মা কে. এল্‌. মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক :
ফার্মা কে. এল্. মুখোপাধ্যায়
৬।১এ, বাঞ্ছারাম অক্রূর লেন,
কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ : ১৯৫৮

মুদ্রাকর :
শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল
কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস প্রাইভেট্ লিঃ,
৯, পঞ্চানন ঘোষ লেন,
কলিকাতা ৯

গুরুদেবের শ্রীচরণে

১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৮

ভূমিকা

সে কয়েক বছর আগের কথা। সামন্ত শাসিত ত্রিপুরায় এসে দেখেছিলাম 'মন্ত্রী অফিস'-এ একটা ঘরে বড়-বড় হরফে লেখা রয়েছে 'ত্রিপুরা রাজ্যের রাজভাষা বাঙ্গালা'। ত্রিপুরায় বাঙলা ভাষার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করবার ইচ্ছা তখনই জেগেছিল। সময় ও সুযোগের অভাবে এতদিন তা হ'য়ে ওঠে নি।

কবে থেকে বাঙলা ভাষা ত্রিপুরায় রাজমর্যাদা লাভ করেছিল তা এখনো নির্ণয় করা যায় নি। তবে অনেকদূর পর্যন্ত এর প্রাচীনত্বের ধারা খুঁজে পাওয়া গেছে। মুসলমান আমলে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতে যখন ফারসীর একাধিপত্য তখনো বাঙলা ভাষা ত্রিপুরায় নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। আবার ব্রিটিশ শাসনে ইংরেজী শিক্ষার প্রবল প্লাবনের মধ্যেও ত্রিপুরার রাজভাষা তার মর্যাদা হারায় নি। বাঙলা দেশের পূর্ব প্রত্যন্তে অবস্থিত এই ক্ষুদ্র, বিচিত্র, অনগ্রসর পার্বত্য রাজ্যে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের যে-প্রসার দেখা যায় বাস্তবিক তা বিস্ময়কর।

কিন্তু এ পর্যন্ত এ-নিয়ে কোন বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে ব'লে আমার জানা নেই। কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে এ-সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। আমি তার থেকে উপকৃত হয়েছি। সুখের বিষয় সম্প্রতি ত্রিপুরার ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনার উৎসাহ দেখা গেছে। কয়েকজন এ নিয়ে গবেষণা করেছেন ও সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁদের অনুসন্ধানের ফলে আরও অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হ'বে এ-ই আশা করি।

ভূমিকা লিখতে ব'সে একটা নতুন খবর পাওয়া গেল। বিখ্যাত উইলিয়ম কেরীর পুত্র ফেলিকস কেরী কিছু দিন ত্রিপুরায় ছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এখানে আসেন। তখন বহু ঝামেলার পর মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য সবেমাত্র সিংহাসনে বসেছেন। তিনি তিনশ' টাকা মাইনে দিয়ে ফেলিকস কেরিকে রাজসভায় রাখতে চেয়েছিলেন। ফেলিকস থাকতে রাজি হন নি। ত্রিপুরায় তাঁর অবস্থান সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানা যায় নি। আর এখন অনুসন্ধান ক'রে নতুন তথ্য সন্নিবেশ করবার সময়েরও অভাব, ভবিষ্যতে এ-বিষয়ে আলোকপাত করবার বাসনা রইল।

এ-বই রচনার মূলে যাঁর আদেশ ও উপদেশ রয়েছে তিনি আমার শ্রদ্ধেয় আচার্যদেব অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। গুরুশিষ্যের সম্পর্কের মধ্যে

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশ নেই। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আমার পূজনীয় শিক্ষাগুরু অধ্যক্ষ সুশান্তকুমার চৌধুরীর উৎসাহও এর পেছনে অনেকখানি। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্কের চাইতেও গভীর। আমি শুধু তাঁকে প্রণাম জানাই। ত্রিপুরার স্বর্গত মহারাজের সহকারী একান্ত সচিব শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত তাঁর গ্রন্থাগারের মূল্যবান গ্রন্থসম্পদ ও দুষ্প্রাপ্য দলিলপত্র আলোচনা করতে দিয়ে আমাকে চির-ঋণী করেছেন। 'রবি' পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষ শ্রীসত্যরঞ্জন বসু তাঁর কাছে রক্ষিত পত্রিকাগুলি দেখতে দিয়ে ও অন্যান্য অনেক তথ্য সরবরাহ ক'রে আমার প্রতি আনুকূল্য দেখিয়েছেন। এঁদের দু'জনকে আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত ও তাঁর ভ্রাতা শ্রীশান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত তাঁদের বাড়িতে রক্ষিত মুদ্রাগুলি দেখতে গিয়ে আমার অশেষ উপকার করেছেন। আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার পরম সুহৃদ শ্রীগোপিকারঞ্জন দত্ত বইখানি প্রকাশের ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করেছেন, আর প্রুফ সংশোধনে সাহায্য করেছেন বন্ধুবর ডক্টর হীরালাল চট্টোপাধ্যায়। এঁদের কথা আজ প্রীতিভরে স্মরণ করি। এ ছাড়াও নানাভাবে যাঁদের কাছ থেকে সাহায্য ও উৎসাহ পেয়েছি তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক সোমেন বসু, অধ্যাপক বৈদ্যনাথ শীল, অধ্যাপক পরেশ চক্রবর্তী, অধ্যাপক অচিন্ত্যকুমার রায়, অধ্যাপক জলদ গাঙ্গুলী, শ্রীহৃষীকেশ চৌধুরী, শ্রীদ্বিজেন দাশগুপ্ত, শ্রীশৈলেশচন্দ্র সেন, শ্রীমান সুদর্শন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান ভবানী মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান চিদানন্দ গোস্বামী ও শ্রীমতী ইলা বর্মনের নাম স্মরণ করছি। আমার সামান্য কর্মে তাঁদের সক্রিয় শুভেচ্ছা ভোলবার নয়।

এ-বই রচনার গোড়ো থেকেই শ্রীমতী রুবি পুরকায়স্থ বরাবর আমাকে প্রেরণা দিয়ে এসেছেন। আমার কাছে তার মূল্য অনেকখানি।

বইখানি নির্ভুল ক'রে ছাপবার যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু কিছু ভুল রয়ে গেছে। এর জন্য পাঠকদের কাছে মার্জনাপ্রার্থী।

শ্রাবণী পূর্ণিমা, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

বাঙলা বিভাগ

মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ

আগরতলা, ত্রিপুরা

মোহিত পুরকায়স্থ

সূচীপত্র

ত্রিপুরায় বাঙলা ভাষা

অবিভক্ত বাঙলার এক প্রান্তে ক্ষুদ্র ত্রিপুরারাজ্য। ইংরেজ আমলের ভূগোলে এ-অঞ্চলের নাম ছিল পার্বত্য ত্রিপুরা। এর সংলগ্ন ত্রিপুরা জেলা ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল, বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের কুক্ষিগত। আগেকার দেশীয় রাজ্য পার্বত্য ত্রিপুরা এখন কেন্দ্র শাসিত ত্রিপুরা। এর তিন দিকে পূর্ব-পাকিস্তান, শুধু পুব দিকে আসামের সঙ্গে সংযুক্ত। ত্রিপুরার পার্বত্য প্রদেশে কুকি, হালাম, রিয়াং, খাসিয়া, মঘ ও চাকমা প্রভৃতি নানারকম পার্বত্য জাতির বাস। শোনা যায় আদিমকালে এ-রাজ্যে হালামদেরই আধিপত্য ছিল। পরে বর্তমান রাজবংশের পূর্বপুরুষ এদের পরাস্ত ক'রে রাজ্য অধিকার করেন। এই বংশের পঁচিশ জন রাজা ত্রিপুরার বাইরে বাঙলার কোন কোন অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেন। তার ফলে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ ঘটে। ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্রে প্রধানত ত্রিপুরী, মণিপুরী ও বাঙালীদের বাস। পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুদের আগমনে বাঙালীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

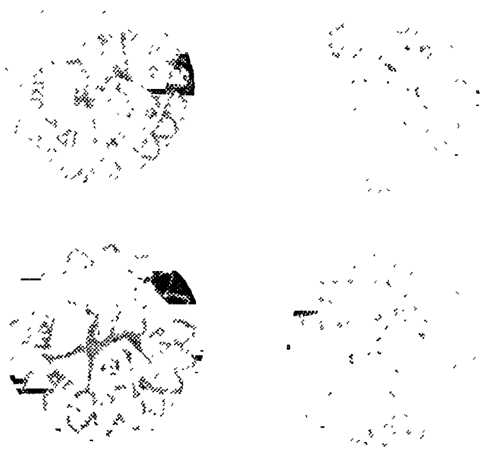
ত্রিপুরার বিভিন্ন পার্বত্য জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের ভাষা প্রচলিত। কিন্তু বহুদিন থেকেই এ-রাজ্যের রাজভাষা বাঙলা।

কোন অজানা অতীতে বাঙলা ভাষা ত্রিপুরায় রাজমর্যাদা লাভ করেছিল তা নির্ণয় করা কঠিন। কত রাজার উত্থান-পতন হয়েছে, কত রাজনৈতিক বিপ্লবের বন্যা ত্রিপুরার ওপর দিয়ে ব'য়ে গেছে কিন্তু বাঙলা ভাষার দৃঢ় ভিত্তিকে বিচলিত করতে পারেনি। পার্বত্য জাতির লোকেরা পর্যন্ত বাঙলা ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। রাজমালা-সংগ্রাহক কৈলাসচন্দ্র সিংহ লিখেছেন—

"ত্রিপুরার রাজভাষা বাঙ্গালা, ইহার অধিকাংশ তাম্রশাসন বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত। এই রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস রাজমালা প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের রত্নমালা স্বরূপ। সুতরাং ত্রিপুরার গৌরবে বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা ভাষা গৌরবান্বিত।"

ত্রিপুরার রাজচিহ্ন ও স্ট্যাম্পে বাঙলা ভাষারই প্রাধান্য। শীল-মোহর (আজ্ঞা ও পদ্মমোহর) বাঙলা ভাষায় অঙ্কিত। মুদ্রায় বাঙলা ভাষা ও অক্ষর উৎকীর্ণ। কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর তাঁর "দেশীয় রাজ্য" গ্রন্থে লিখেছেন—"ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার সোনার চেনের সহিত একখানা সোনার মোহর দোদুল্যমান দেখিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'তোর চেইনের ঝলমলানির সঙ্গে যে মোহর চকচক করিতেছে ইহা কোন মোহর?" আমি বিনম্র বচনে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম (১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের কথা) ইহা আমাদের রাজ্যের মোহর। তিনি হাতে করিয়া পাঠ করিলেন 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণপদে শ্রীযুত মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য শ্রীশ্রীমহারাণী গুণবতী দেব্যা।' ইহা পাঠ করিয়াই তিনি পুলকিত হইয়া উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তি-দিগকে বলিয়াছিলেন ইহাতে যে বাঙ্গালা ভাষার ছাপা। তবে আমার বাঙ্গালা রাজভাষা।' এই বলিয়া তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া এসিয়াটিক সোসাইটীতে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নিকট লইয়া যান। তারপর ত্রিপুরার তদানীন্তন মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের নিকট তাঁহারা উভয়ে পত্র লিখিয়া উক্ত মহারাজকে 'বঙ্গভাষা সংবর্ধন সভার' পৃষ্ঠপোষকরূপে পাইয়াছিলেন।"

গোবিন্দমাণিক্য সম্রাট শাজাহানের সমসাময়িক। 'রাজর্ষি' ও 'বিসর্জন'-এ রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দমাণিক্যকে অমর ক'রে গেছেন। আমাদের দেখা দুটি মুদ্রার প্রতিলিপি নিচে দেওয়া গেল—



ত্রিপুরার রাজাদের দেওয়া সনদের ভাষাও বাঙলা, যদিও তার মধ্যে আরবী ও ফারসী শব্দ মেশান রয়েছে। বাঙলা ভাষায় সবখানেই দলিলের ভাষায় আরবী ও ফারসীর বাহুল্য দেখা যায়। ত্রিপুরার মঠ ও মন্দিরে যে-সমস্ত শিলালিপি রয়েছে তার অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায় রচিত হ'লেও বাঙলা হরফে লেখা। কোন কোন মন্দিরে বাঙলা-ভাষায় লেখা প্রস্তর ফলকও দেখা যায়। পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের বেষ্টনীর মধ্যে ত্রিপুরার মহারাজের নির্মিত মন্দিরের গায়ে বাঙলায় লেখা প্রস্তর ফলক রয়েছে। উদয়পুরে ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরের উত্তর দিকের ও দক্ষিণ দিকের দেয়ালে দুটি প্রস্তরফলক বাঙলায় লেখা। উত্তর দিকের ফলকে 'শক ১৬৩' লেখা। মনে হয় এটা ভুল। কারণ এতে বলিভীমনারায়ণের নাম আছে। বলিভীমনারায়ণ ১৬০৩ শকে বর্তমান ছিলেন। কাজেই ১৬৩র বদলে ১৬০৩ হ'বার কথা। দক্ষিণ দিকের ফলকেও 'শকাব্দা ১৬০৩' হয়েছে।

১৭৫১ শকে বা ১২৩৯ ত্রিপুরাব্দে মহারাজ কাশীচন্দ্র মাণিক্য ত্রিপুরা সুন্দরীর বাড়ীতে একটি বড় ঘণ্টা স্থাপন করেন। ঘণ্টাতে মহারাজের নাম, নির্মাতার নাম ও ঘণ্টাপ্রদানের সন তারিখ বাঙলায় লেখা রয়েছে। আগরতলায় উমামহেশ্বর বিগ্রহের পাদপীঠে এবং পুরাণ আগরতলায় চৌদ্দ দেবতার সিংহাসনে বাঙলায় লেখা শ্লোক দেখা যায়।

ত্রিপুরায় প্রচলিত বাঙলা ভাষাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়,—কথ্য ভাষা, লেখ্য ভাষা ও দরবারী ভাষা। শ্রীহট্ট, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার উপভাষার সংমিশ্রণে এ-অঞ্চলের কথ্যভাষার সৃষ্টি। তবে দীর্ঘকাল রাজদরবারের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে থাকায় এর মধ্যে খানিকটা দরবারী ঢং এসে গেছে। যেমন সম্মানিত ব্যক্তিকে কথা বলতে মধ্যম পুরুষ ব্যবহার না করা। এটা রাজপরিবার থেকে জনসাধারণের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছিল। পূজ্য ব্যক্তিকে এক গ্লাস জল বা পান খেতে দিয়ে ত্রিপুরার অধিবাসীরা এখনো বলে "পান খাইতে মর্জি হয়।" আদিবাসীদের ভাষা, বিশেষ ক'রে ত্রিপুরা ভাষার সংস্পর্শে এসেও এ-অঞ্চলের কথ্যভাষা ঈষৎ পরিবর্তিত হয়েছে। "ভইতারি খেলবনি" (বোন বোন খেলা অর্থাৎ সই পাতান), 'দাদা ডাঙ্গর', 'দাদা ছুট' প্রভৃতি কথা প্রায় লোকের মুখেই শোনা যায়।

এখানকার লেখ্য ভাষা বিশুদ্ধ বাঙলা। ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস 'রাজমালা' বাঙলা পয়ারে লিখিত। মহারাজ ধর্মমাণিক্যের শাসনকালে এর প্রথম ভাগ রচিত হয়। ধর্মমাণিক্য ১৩৫৩ শক থেকে ১৩৮৪ শক পর্যন্ত (১৪৩১—১৪৬২ খৃঃ) রাজত্ব করেন। কাজেই এটি পাঁচশ বছরের পুরনো গ্রন্থ। এর মধ্যে বাঙলা সাধুভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখা যায়।

দরবারী ভাষা—ত্রিপুরার বিশিষ্ট সম্পদ তার দরবারী ভাষা। একমাত্র পররাষ্ট্র বিভাগ ছাড়া এখানকার সরকারী কাজে সর্বত্র বাঙলা ভাষার ব্যবহার ছিল। সরকারী আদেশ বাঙলা ভাষায়

প্রচারিত হ'ত। সরকারী চিঠিপত্র, হিসাব-নিকাশ, রেজিষ্ট্রী, ফর্ম, ইত্যাদি সবখানেই বাঙলা ভাষার ব্যবহার ছিল। আদালতে সাক্ষীর জবানবন্দি, রায় ইত্যাদি বাঙলায় লেখা হ'ত। বাঙলা দেশে ফৌজদারী দণ্ডবিধি প্রচলিত হ'বার অনেক আগে ত্রিপুরায় বাঙলা ভাষায় "চলৎ দণ্ডবিধি" আইন প্রচলিত হয়েছিল। ইংরেজী শিক্ষিত কর্মচারীদের দ্বারা সময় সময় শাসন ও বিচার বিভাগে ইংরেজী ভাষা প্রয়োগের চেষ্টা যে না হ'ত তা নয়। কিন্তু, মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য পররাষ্ট্র বিভাগ ছাড়া সরকারী কাজে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার আইন দ্বারা নিবারণ করেন। মহারাজ রাধাকিশোর মন্ত্রী রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে ইংরেজী ভাষায় আদেশ প্রচার করতে দেখে তাঁকে লিখেছিলেন—"এখানে আবহমান কাল রাজকার্য্যে বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার এবং এই ভাষার উন্নতিকল্পে নানারূপ অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে, ইহা বঙ্গদেশীয় হিন্দু রাজ্যের পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক মনে করি। বিশেষতঃ আমি বঙ্গ ভাষাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসি এবং রাজকার্য্যে ব্যবহৃত ভাষা যাহাতে দিন দিন উন্নত হয় তৎপক্ষে চেষ্টিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য মনে করি। ইংরেজী শিক্ষিত কর্ম্মচারী-বর্গের দ্বারা রাজ্যের এই চিরপোষিত উদ্দেশ্য ও নিয়ম ব্যর্থ না হয় সে বিষয়ে আপনি তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন।"

এ-প্রসঙ্গে রাজাদেশ ও রাজকীয় ভাষার কিছুটা নমুনা দেওয়া গেল। রাজকীয় ঘোষণার নাম ছিল রোবকারী।—

১। রোবকারী কাছারি এলাকে রাজগী পর্ব্বত ত্রিপুরা হুজুর শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজা ঈশানচন্দ্র ম্যাণিক্য বাহাদুর। ইতি সন ১২৭২ ত্রিপুরা, তারিখ ১৬ই শ্রাবণ।

এ পক্ষ বাতব্যাধি পীড়াতে শারীরিক কাতর হওয়া প্রযুক্ত রাজত্ব ও জমিদারী শাসন বিষয়ী কার্য্য সুচারুমতে নির্ব্বাহ হইতেছে না এবং যে প্রকার ব্যামোহ ৺ ইচ্ছাধীন কোন সময় প্রাণ বিয়োগ হয় তাহারও নিশ্চয় নাই এ মতেই এ পক্ষের

খান্দানের চিররীতিমতে ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ তদর্থক যুবরাজ ও বরঠাকুর ও কর্ত্তা নিযুক্ত করা প্রয়োজন, সে মতে হুকুম হইল যে—

যুবরাজীপদে এ পক্ষের ভ্রাতা শ্রীল শ্রীমান বীরচন্দ্র ঠাকুর ও বরঠাকুরী পদে প্রথমপুত্র শ্রীল শ্রীমান ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ঠাকুর ও কর্ত্তা পদে দ্বিতীয় পুত্র শ্রীল শ্রীমান নবদ্বীপচন্দ্র ঠাকুরকে নিযুক্ত করা যায় ও এ বিষয়ের এত্তেলা স্বরূপ এই রোবকারীর এক এক কিত্তা নকল জেলা চট্টগ্রাম ও জেলা ঢাকা প্রদেশের শ্রীল শ্রীযুক্ত দায়ের সায়ের কমিসনর সাহেব বাহাদুরান ও জেলা ত্রিপুরা ও জেলা শ্রীহট্টের শ্রীল শ্রীযুক্ত জজসাহেব ও শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব ও শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরান হুজুরে প্রেরণ হয় ইতি।

২। রাজ্যে সতীদাহ নিবারণ ক'রে বীরচন্দ্র মাণিক্যের ঘোষণা—

রোবকারী স্বাধীন ত্রিপুরা দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। সন ১২৯৯ ত্রিং তাং ৮ই জ্যৈষ্ঠ।

যেহেতু জানা যায় এ রাজ্যের পার্ব্বতীয় প্রদেশের কোন কোন স্থানে সতীদাহ অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে লয়প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তাহা রহিত করা আবশ্যক। সেমতে—

হুকুম হইল যে—

এতদ্দারা উল্লিখিত সতীদাহ প্রথা রহিত করা যায়, ও এই আদেশ প্রচারের তারিখের পর হইতে এই আদেশ লঙ্ঘনক্রমে কোন স্থানে উক্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে কি তাহার উদ্যোগ করা হইলে সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ দণ্ডনীয় হইবে। কার্য্যে পরিণত হওয়ার আদেশে এই রোবকারী রাজস্ব বিভাগে পাঠান যায়।

৩। বীরচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যুর পর নিম্নলিখিত ঘোষণা দ্বারা রাধাকিশোর মাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন—

রোবকারী দরবার শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর দেববর্ম্মণ যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর, এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজধানী আগরতলা। ইতি সন ১৩০৬ ত্রিং তাং ২৮শে অগ্রহায়ণ—

যেহেতু গতকল্য অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় পিতৃদেব ৺ মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর কলিকাতা মোকামে পরলোকগমন করিয়াছেন আমি খান্দানের রীতি এবং এই রাজবংশের চিরপ্রসিদ্ধ কুলাচার মতে পিতৃদেবের মৃত্যুর পর হইতে তৎত্যজ্য জমিদারী চাকলে রোসনাবাদ ও রাজগী ত্রিপুরা ও অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তিতে মালিক দখলকার হইয়াছি, এখন হইতে রাজগী ও জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সম্পূর্ণরূপে এ পক্ষের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইবে। ইতি।

নিয়োগ, বদলি, উন্নয়ন, অপসারণ ইত্যাদির জন্য মেমোর আকারে আদেশ প্রচারিত হ'ত। নিচে তার নমুনা দেওয়া গেল।—

৪। **নিয়োগ**—যেহেতু খাস সেরেস্তায় জনৈক কার্য্যকারক বৃদ্ধি করার আবশ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে এবং শ্রীযুক্ত বাবু নীলকণ্ঠ সেন বি. এ. কে উক্ত সেরেস্তায় নিযুক্ত করা এ পক্ষের অভিপ্রায় অতএব—

আদেশ হইল যে—

আপাতত উক্ত বাবু নীলকণ্ঠ সেনকে মাসিক মং ৮৫ পঁচাশি টাকা বেতনে কার্য্যনির্ব্বাহক ও ব্যবস্থাপক সভার পেস্কারের পদে নিযুক্ত করা যায়। অবগতির কারণ এই মেমোরে এক প্রতিলিপি রাজস্ব বিভাগে পাঠান যায়। ইতি ১৩১০ ত্রিং ২৯শে জ্যৈষ্ঠ।

৫। বদলি—যেহেতু শ্রীযুক্ত মিষ্টার ঈ, এফ, সেণ্ডিস সাহেবকে এ পক্ষের প্রাইভেট সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত করা অভিপ্রায়, অতএব—

আদেশ হইল যে—

পূর্ত্ত বিভাগের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট পদ হইতে উক্ত সেণ্ডিস সাহেবকে পরিবর্ত্তন ক্রমে এ পক্ষের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করা যায়। পরিণতির জন্য প্রতিলিপি সংসৃষ্ট আফিস হায়ে ও উক্ত মিষ্টার ঈ, এফ, সেণ্ডিস সাহেব নিকট প্রেরিত হয়। ইতি ১৩১১ ত্রিং ৫ বৈশাখ।

৬। ছুটি—শ্রীযুক্ত ম্যাকসিন সাহেব শারীরিক অস্বাস্থ্য নিবন্ধন কিয়ৎকাল বিশ্রাম করা আবশ্যক বলিয়া বিদায় চাহিয়াছেন। জানা

যায় তাঁহার পোনর দিবসের অনুগ্রহ বিদায়ের স্বত্ব আছে। অতএব বিগত ৯ই মে তারিখ হইতে তাহার পোনর দিবসের অনুগ্রহ বিদায় মঞ্জুর করা যায়। ঐ সময় তিনি বর্ত্তমান (অর্থাৎ মাসিক ১৩৫০ টাকার) হারে বেতন পাইবেন। তৎপর আরো অধিককাল বিদায়ে থাকা আবশ্যক বোধ করিলে পীড়িত বিদায় পাইতে পারিবেন। ঐরূপ পীড়িত বিদায়কালে তিনি পাঁচশত টাকা হারে বেতন পাইবেন। বিদায়ান্তে কার্য্যে হাজির হইলে মাসিক এক হাজার টাকা হারে বেতন পাইবেন এবং কুমিল্লা ভিন্ন সরকারী কার্য্যে অন্যত্র থাকিলে এই বেতনের অতিরিক্ত দৈনিক দশটাকা হিসাবে ভাতা পাইবেন। ইতি—১৩১২ ত্রিং ৯ই জ্যৈষ্ঠ।

৭। **উন্নয়ন**—যেহেতু খাস সেরেস্তার কেরাণী শ্রীযুক্ত তারামোহন চৌধুরী বহুদিবস যাবৎ এ পক্ষ সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহের সহিত কার্য্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে, অধুনা তাহাকে কথঞ্চিৎ উন্নতি দেওয়া সঙ্গত বোধ হয়। অতএব—

আদেশ

উক্ত তারামোহন চৌধুরীকে খাস সেরেস্তার হেডক্লার্ক লকব দেওয়া যায়। অবগতার্থে প্রতিলিপি রাজস্ব বিভাগে প্রেরিত হয়। ১৩০৮ ত্রিং ৪ঠা অগ্রহায়ণ।

৮। **অপসারণ**—যেহেতু নানা কারণে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু নাএব দেওয়ানকে রাজকার্য্যে রাখা এ পক্ষের অনভিপ্রেত বটে ও তদ্ধেতু অদ্যকার স্বতন্ত্র আদেশ দ্বারা তাহার জিম্মার কার্য্যের পৃথক বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, অতএব—

হুকুম হইল যে—

অদ্য হইতে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু নাএব দেওয়ানকে কার্য্য হইতে অবসর করা যায়। উক্ত নাএব দেওয়ান তাহার জিম্মার কার্য্যের চার্জ্জ শ্রীযুক্ত ঠাকুর গোপীকৃষ্ণ দেববর্ম্মণ নিকট বুঝাইয়া দেয়। ইতি—সন ১৩০৬ ত্রিং তাং ১৫ই পৌষ।

৯। **বহিষ্কার**—নানা কারণে এইক্ষণ শ্রীমান—এ রাজ্যে বাস করা সঙ্গত নহে। অতএব আদেশ করা যায় যে উক্ত শ্রীমান আগামী ২১শে আষাঢ় মঙ্গলবারের মধ্যে এ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর যায়। স্থানান্তর গিয়া জানাইলে তাহার খরচাদির জন্য মাসিক অনধিক এক হাজার টাকা করিয়া তাহাকে দেওয়া যাইবে। ইতি সন ১৩১৪ ত্রিং তারিখ ১৩ই আষাঢ়।

১০। **পেন্সন**—চাকলার দেওয়ান শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এ সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করায় তাহাকে পেন্সন ও দাতব্য দেওয়ার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ম্যাকসিন সাহেবের প্রস্তাব সঙ্গত বোধ করি। অতএব—

আদেশ হইল যে—

গত ১১ই বৈশাখ হইতে দেওয়ান শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পেন্সন মাসিক মং ১০০৲ একশত হারে মঞ্জুর করা যায় এবং তাহাকে এককালীন গ্রেটুইটী স্বরূপ মং ১০০০৲ এক হাজার টাকা দেওয়া যায়। কার্য্যে পরিণতির জন্য প্রতিলিপি চাকলা কাছারীতে পাঠান যায়। ইতি সন ১৩১২ ত্রিং তাং ২১শে বৈশাখ।

১১। রাধাকিশোর মাণিক্যের সময়কার একটি মামলা সম্পর্কিত আদেশের নমুনা—

রোবকারী দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর, রাজধানী আগরতলা, ইতি সন ১৩১৩ ত্রিং তাং ২৫শে আশ্বিন।

নং ৭

শ্রীশ্রীযুত সরকার বাহাদুর পক্ষে মদনমোহন লস্কর হেড কং—বাদী ১নং ছৈয়দালী—২ নং গারবদী —বিবাদী মোং—জ্ঞানকৃত বধ	যেহেতু পার্শ্বের লিখিত মোকদ্দমার বিচারে সেসন আদালত কর্ত্তৃক ১নং বিবাদীর প্রাণদণ্ডের এবং ২নং বিবাদীর যাবজ্জীবন কা রা বা সে র আদেশ হওয়ায়—

বিবাদীদ্বয় খাস আপীল দায়ের করিয়াছে এবং বর্ত্তমান শারদীয় অবকাশ উপলক্ষে প্রোক্ত খাস আপীল আদালতের জনৈক বিচারপতি স্থানান্তর গমন করায় এবং অপর দুইজন মধ্যে প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত রাজা মুকুন্দরাম রায় পীড়াপ্রযুক্ত কার্য্য করিতে অক্ষম বিধায় এই মোকদ্দমার বিচারকার্য্য সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত করার জন্য খাস আপীল আদালত হইতে ইস্তমেজাজ আগত হইয়াছে অতএব—

আদেশ

শ্রীযুক্ত উজীর গোপীকৃষ্ণ দেববর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত মন্ত্রী রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর স্থায়ী বিচারপতি শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি.এ.র সহিত একত্র উপবেশন ক্রমে উল্লিখিত মোকদ্দমার আপীল রীতিমত শ্রবণ ও নথী আলোচনা করিয়া অধিকাংশের মতানুসারে বিচার নিষ্পত্তি করিবে।

অবগতি ও আচরণার্থ ইহার প্রতিলিপি সংসৃষ্ট আদালত ও ব্যক্তিগণ নিকট পাঠান যায়।

বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের সময়ে ভাষা আরো প্রাঞ্জল হয়েছে। সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর পঞ্চম জর্জ্জ রাজা হ'লে বীরেন্দ্রকিশোর এক ঘোষণা দ্বারা তাঁর রাজ্য মধ্যে এ সংবাদ প্রচার করেন—

১২। **ঘোষণাপত্র**—যেহেতু সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের অলঙ্ঘনীয় বিধানে পরম সৌভাগ্যশালী মহামহিমান্বিত যশস্বী সম্রাট মহারাজা সপ্তম এডওয়ার্ড বিগত ৬ই মে মোতাবেক ২৩শে বৈশাখ রাত্রে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে গমন করিয়াছেন এবং ইংলণ্ডের চিরাগত ব্যবস্থানুসারে তাঁহার পুত্র গৌরবান্বিত প্রতাপশালী রাজকুমার জর্জ্জ ফ্রেডারিক আর্ণেষ্ট অ্যালবার্ট মহোদয় স্বর্গীয় সম্রাটের পরিত্যক্ত বিপুল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছেন এবং পঞ্চম জর্জ্জ নামে ব্রিটীশ রাজ্য ও ভারত সাম্রাজ্যের আধিপত্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং যেহেতু এই সংবাদ রাজ্য মধ্যে ঘোষিত হওয়া এ পক্ষের অভিপ্রায় অতএব—

আদেশ হইল যে—

এই ঘোষণাপত্র এতৎরাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। এ পক্ষ ইহাও ইচ্ছা করেন যে এ পক্ষের প্রজাবৃন্দ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে গৌরবান্বিত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের দীর্ঘজীবন ও মঙ্গল কামনা করে। ইতি। রাজধানী আগরতলা—১৩২০ ত্রিং ৩১শে বৈশাখ।

প্রতিজ্ঞাপত্র বা Oath-ও বাঙলায় রচিত হয়েছিল। বীরবিক্রম মাণিক্যের মঞ্জুরীকৃত দেওয়ান শাসনের ১৯।৬।৩৯ ত্রিং তারিখের প্রস্তাবের প্রতিজ্ঞাপত্রের নমুনা—

১৩। প্রতিজ্ঞাপত্র (Oath)—আমি এতদ্দ্বারা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের ও তদীয় শাসন নীতির প্রতি আমার গভীর ভক্তি ও একনিষ্ঠ আনুগত্য জ্ঞাপন করিতেছি এবং প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক জানাইতেছি যে আমি সর্ব্বথা শাসন বিভাগের দেওয়ানের প্রবর্ত্তিত নীতি প্রতিপালন করিতে স্বীকৃত হইয়া নিরপেক্ষ ও নিঃস্বার্থ ভাবে তাঁহার সহায়তা করিব। ইতি সন ১৩৩৯ ত্রিং তারিখ ১৯শে আশ্বিন।

এ সমস্ত আদেশের মধ্যে ইতস্তত নানারকম পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ রয়েছে। যেমন "পরিণতির জন্য প্রতিলিপি সংসৃষ্ট আফিস হায়ে প্রেরিত হয়।" "উল্লিখিত বিভাগে রীতিমতে ইসমনবিসি হয়।" "বর্ত্তমান দখলকারগণকে আবশ্যক ও সুবিধামতে অন্যস্থান এওজ দেওয়া কর্ত্তব্য।" ইত্যাদি। রাজ-আজ্ঞায় নিজেকে এ পক্ষ বলা হয়েছে। উত্তম পুরুষের ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। রাজার সম্পর্কে বলতে গেলে "শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাৎ" বলা হত। নিচে কতগুলি পারিভাষিক শব্দের অর্থ দেওয়া গেল।—

রোবকারী—Royal proclamation.
আদেশ—Executive order.
হুদ্দা—Title.

হুদ্দা প্রদান ঠিক উপাধিদান নয়। রাজকার্যে পদাধিকার বলে 'উজির' 'নাজির', সামাজিক হিসেবে 'সরদার' 'কবরা' 'ঠাকুর' ইত্যাদি প্রদানকে বলা হ'ত হুদ্দা প্রদান।

ইসিমনবিসি—List of names.

বন্ধান—Provision.

লকব—Designation.

এস্তমেজাজ—Review.

আহাকাম জারি ও তামিল—Execution of an order

ফয়ছল—Expedition.

খান্দান—Convention.

কায়েমি—Permanent settlement,

তসখিচি—20 years' Taluk settlement.

খরচি—মহারাণী, কুমারী ও উচ্চপদস্থ রাজপরিবারবর্গের পেন্সন।

দরমাহ—চাকুরে লোকের পেন্সন।

তনখা—রাজপরিবারের অন্তর্গত ঠাকুর লোকের পেন্সন।

এ ছাড়া ও জিম্বা, দ্বিরাদেশ, বহাল, বরতরফ, সসপেণ্ড, মোতায়েন, ইরসাল (আমদানী), মোসাহেরা (মাসোয়ারা) ইত্যাদি নানারকম পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

এ-ভাবে রাজমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে ত্রিপুরায় বাঙলা ভাষা এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল। এখানকার বাঙলা ভাষায় একটা বিশেষ দরবারী ঢং ফুটে উঠেছে। ইংরেজী শিক্ষিত ভারতের সর্বত্র যখন ইংরেজী ভাষার প্লাবন চলেছে তখন তার এক প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যে বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দে মণ্ডিত হ'য়ে বাঙলা ভাষা শাসনতান্ত্রিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করেছিল এটা কম গৌরবের কথা নয়। আজকাল বাঙলায় পরিভাষা নিয়ে যাঁরা আলোচনা করছেন তাঁরা ত্রিপুরার রাজভাষা থেকে অনেক সাহায্য পেতে পারেন। বাঙলা সাধু ভাষার সঙ্গে এর অনেক

তফাৎ রয়েছে এ-কথা সত্যি। কিন্তু এই পার্থক্যের মধ্যেই এর বৈশিষ্ট্য। রাজমালা সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত বলেছেন "ত্রিপুরার দরবারী ভাষা সকল ক্ষেত্রে ঠিক বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষার ন্যায় বিশুদ্ধ না হইলেও অন্যান্য প্রদেশের আমলাই ভাষার তুলনায় অনেক উন্নত, একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে।"

প্রাচীন যুগ

রাজমালা—প্রথম খণ্ড

রাজবংশের ইতিহাস বর্ণনা এবং রাজাদের গৌরবগাথা কীর্তন ক'রে গ্রন্থ রচনার ধারা ভারতের অনেক রাজ্যেই প্রচলিত ছিল। কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিনী' কাশ্মীরের রাজবংশকে অমর ক'রে রেখেছে। মহীশূরের ইতিবৃত্ত 'রাজাবলী কথে।' তেমনি ত্রিপুরার ইতিহাসের নাম 'রাজমালা।' এই রাজমালার আগেও ত্রিপুরার ইতিহাস নিয়ে আরো কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হ'য়েছিল।

রাজাবলী—বাঙলায় লেখা ত্রিপুরার প্রাচীনতম ইতিবৃত্তের নাম 'রাজাবলী'। এটি আটশ বছরের পুরনো গ্রন্থ। রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' এই গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' বাঙলা ভাষার উৎপত্তি বিষয়ক প্রবন্ধে 'রাজাবলী'র নাম করেছেন। বইখানি গদ্যে লেখা। এটি বাঙলার প্রাচীনতম গদ্যগ্রন্থের অন্যতম। গ্রন্থটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

এ ছাড়া সংস্কৃতে লেখা ইতিহাসও রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার ইতিহাস জানবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ ক'রে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যকে এক চিঠি লেখেন। তার উত্তরে ১২৯৬ ত্রিপুরাব্দের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ মহারাজ লিখিয়াছিলেন।

"রাজরত্নাকর নামে ত্রিপুর রাজবংশের একখানা ধারাবাহিক সংস্কৃত ইতিহাস আছে। এই গ্রন্থ ধর্ম্মমাণিক্যের রাজত্ব সময়ে সঙ্কলিত হইতে আরম্ভ হয়। ধর্ম্মমাণিক্য 'জীবারি বসুমানে' ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ত্রিপুরা ৮৬৮ সনে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এখন ত্রৈপুর ১২৯৬ সন। উক্ত রাজরত্নাকরে আর একখানা প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'রাজমালার' উল্লেখ আছে। কিন্তু সেই প্রাচীন রাজমালা

এখন কোথাও অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না। 'রাজমালা' বলিয়া যাহা প্রচলিত তাহা রাজরত্নাকর হইতে সংক্ষিপ্ত ও সংগৃহীত এবং বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত। সাধারণে পাঠ করিয়া যেন অনায়াসে বুঝিতে পারে এই অভিপ্রায়েই দ্বিতীয় 'রাজমালা' রচিত হইয়াছে। ইহাতে মহারাজ দৈত্যের জীবনবৃত্ত হইতে বর্ণিত আছে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অনেক রাজার ইতিহাস নাই।"

যে-রাজমালা অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না ব'লে মহারাজ লিখেছেন সেটি পরে আগরতলা উজিরবাড়িতে পাওয়া গেছে।

'রাজরত্নাকর' মহারাজ ধর্মমাণিক্যের সময়ে চন্তাই দুর্লভেন্দ্র ও পণ্ডিত বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর মিলে রচনা করেন। সংস্কৃত রাজমালা-ও এঁদেরই লেখা। বাঙলা রাজমালাও এঁরাই লিখতে আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থের প্রস্তাবনায় আছে—

ত্রিলোচন বংশে মহামাণিক্য নৃপতি।
তানপুত্র শ্রীধর্ম্মমাণিক্য নাম খ্যাতি॥
বহু ধর্ম্মশীল রাজা ধর্ম্মপরায়ণ।
ধর্ম্মশাস্ত্র ক্রমে প্রজা করিছে পালন॥
এককালে মহারাজ বসি ধর্ম্মাসনে।
রাজবংশাবলীকীর্ত্তি শ্রবণেচ্ছা মনে॥
দুর্ল্লভেন্দ্র নাম ছিল চন্তাই প্রধান।
চতুর্দ্দশ দেবতা পূজাতে দিব্যজ্ঞান॥
ত্রিপুরের বংশাবলী আছয়ে অশেষ।
রাজকুলকীর্ত্তি সব জানেন বিশেষ॥
বাণেশ্বর শুক্রেশ্বর দুই দ্বিজবর।
আগমাদি তন্ত্র তত্ত্ব জানেন বিস্তর॥

* * * *

তারা তিনে কহে রাজা কর অবধান।
তোমার বংশের কথা নিশ্চয় প্রমাণ॥

ভাষাতে না কহি তন্ত্র তাতে পাপ হয়।
ত্রিপুর ভাষাতে চন্তাই রাজাতে কহয়।

ত্রিপুরার কুলদেবতা চৌদ্দ দেবতার প্রধান পুরোহিতকে চন্তাই বলে। রাজবংশের ইতিহাস এঁদের কণ্ঠস্থ ছিল। চন্তাই ত্রিপুর ভাষায় ব'লে গেলেন আর বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর বাঙলায় লিখে যেতে লাগলেন। এভাবেই হ'ল বাঙলা রাজমালার সূচনা।

কিন্তু সমগ্র রাজমালা একই সময়ে লেখা হয় নি। মহারাজ দৈত্য থেকে কাশীচন্দ্র মাণিক্যের শাসনকাল পর্যন্ত বিবরণ ছয়বারে রাজমালায় গ্রথিত হয়েছে। এই ছয় খণ্ডের পরিচয় নিচে দেওয়া গেল—

প্রথম খণ্ড

বিষয়—দৈত্য থেকে মহামাণিক্য পর্যন্ত।
বক্তা—বাণেশ্বর, শুক্রেশ্বর ও দুর্লেভেন্দ্র নারায়ণ।
শ্রোতা—মহারাজ ধর্মমাণিক্য।
রচনাকাল—খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর আরম্ভ।

দ্বিতীয় খণ্ড

বিষয়—ধর্মমাণিক্য থেকে জয়মাণিক্য পর্যন্ত।
বক্তা—রণচতুর নারায়ণ।
শ্রোতা—মহারাজ অমর মাণিক্য।
রচনাকাল—খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ।

তৃতীয় খণ্ড

বিষয়—অমর মাণিক্য থেকে কল্যাণ মাণিক্য পর্যন্ত।
বক্তা—রাজমন্ত্রী।
শ্রোতা—মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য।
রচনাকাল—খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ।

চতুর্থ খণ্ড

বিষয়—গোবিন্দমাণিক্য থেকে কৃষ্ণমাণিক্য পর্যন্ত।

বক্তা—জয়দেব উজির।

শ্রোতা—মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য।

রচনাকাল—খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ।

পঞ্চম খণ্ড

বিষয়—রাজধর মাণিক্য থেকে রামগঙ্গা মাণিক্য পর্যন্ত।

বক্তা—দুর্গামণি উজির।

শ্রোতা—মহারাজ কাশীচন্দ্র মাণিক্য।

রচনাকাল—খৃঃ উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ।

ষষ্ঠ খণ্ড

বিষয়—রামগঙ্গা মাণিক্য থেকে কাশীচন্দ্র মাণিক্য পর্যন্ত।

বক্তা—দুর্গামণি উজির।

শ্রোতা—মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য।

রচনাকাল—খৃঃ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

রাজমালা পাঠ করলে জানা যায় যে মহারাজ ধর্মমাণিক্যের আদেশে এ গ্রন্থ প্রথম রচিত হয়। কিন্তু তার মধ্যে ধর্মমাণিক্যের শাসনকালের কোন উল্লেখ নেই। ধর্মমাণিক্য ১৩৮০ শকে ধর্মসাগর উৎসর্গ করবার সময় ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেছিলেন এবং মোট বত্রিশ বছর রাজত্ব করেন এ দুটি কথা রাজমালায় আছে। তাছাড়া, দ্বিজ বঙ্গচন্দ্রের 'ত্রিপুর বংশাবলী' নামে কবিতাপুস্তকে লেখা আছে, মহারাজ ধর্মমাণিক্য ৮৪১ থেকে ৮৭২ ত্রিপুরাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অর্থাৎ ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকাল ১৩৫৩ থেকে ১৩৮৪ শকাব্দ। এর থেকে রাজমালায় উল্লিখিত বত্রিশ বছর রাজত্ব ও ১৩৮০ শকে ভূমিদান উভয় তথ্যই সমর্থিত হয়। তাহ'লে ১৪৩১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৪৬২ খৃষ্টাব্দ এই বত্রিশ বছরের মধ্যে রাজমালা প্রথম লেখা হয়। অতএব এটি পাঁচশ বছরের প্রাচীন গ্রন্থ।

বাঙলায় লেখা ত্রিপুরার প্রাচীনতম ইতিবৃত্ত রাজাবলী। এটি বর্তমানে পাওয়া যায় না। এর পরে 'রাজমালা'ই বাঙলায় লেখা প্রাচীনতম

ইতিহাস। অনেকের ধারণা বৈষ্ণব মহাজনেরাই বাঙলায় ইতিহাস রচনার ধারা প্রবর্তিত করেন। রাজমালা তার ও আগে লেখা। অধুনা দুষ্প্রাপ্য রাজাবলীর কথা বাদ দিলে রাজমালাই বাঙলা সাহিত্যে একমাত্র ধারাবাহিক রাজত্বের ইতিহাস।

রাজমালা রাজাদের ইতিহাস, রাজ্যের ইতিহাস নয়। বিভিন্ন রাজাদের সিংহাসন প্রাপ্তি, রাজ্যচুতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শাসনপ্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ এর মধ্যে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত ত্রিপুরাবাসীর শৌর্যবীর্যের ও পরিচয় রয়েছে। কিন্তু তখনকার ত্রিপুরার সামাজিক রীতিনীতি, অর্থনৈতিক অবস্থা ও ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপ সম্পর্কে এর থেকে কিছু জানবার উপায় নেই। তাই ত্রিপুরার জাতীয় ইতিহাস হিসেবে রাজমালার কোন মূল্য নেই। রাজমালা-লেখকেরা রাজাদেশে রাজকাহিনী লিখে গেছেন, জনগণের সুখদুঃখের ইতিহাস রচনা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। অবশ্যি এর জন্য শুধু এঁদের দোষী করা চলে না। আমাদের অধিকাংশ ঐতিহাসিক সম্পর্কেই এ-কথা খাটে। আমাদের ইতিহাস অর্থই রাজরাজড়ার জয়পরাজয়ের ইতিহাস, জাতির জীবনেতিহাস নয়।

রচয়িতার পরিচয়—রাজমালা সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত অনেক অনুসন্ধান করে রাজমালার আদিকবি বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বরের পরিচয় সংগ্রহ করেছেন। এঁদের জন্ম শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ বংশে, কৌলিক উপাধি চক্রবর্তী। এঁরা দুই ভাই, বাণেশ্বর জ্যেষ্ঠ, শুক্রেশ্বর কনিষ্ঠ। এঁদের নিবাস ছিল শ্রীহট্ট জেলার ঢাকাদক্ষিণ পরগণার ঠাকুরবাড়ি গ্রামে। এই গ্রামেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পিতৃভূমি। দুই ভাই-ই ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত। এঁরা দুজনেই ত্রিপুরার রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন।

ত্রিপুর নামকরণ—ত্রিপুর জাতির নামকরণ সম্পর্কে রাজমালায় নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া যায়। প্রথম খণ্ডে 'ত্রিপুর বংশের আখ্যান' অধ্যায়ে লেখা আছে—

শ্রীধর্ম্মমাণিক্য রাজা পরে জিজ্ঞাসিল।
ক্ষত্রিয় বংশেতে কেন ত্রিপুর নাম হইল॥
চন্তাই কহে মহারাজা তাহা বলি আমি।
যেইমতে ক্ষত্রিয় বংশে ত্রিপুর হৈলা তুমি॥
দক্ষকন্যা সতীঅঙ্গ পতন যে স্থানে।
মহাপীঠ নির্ণয় মুনি বলিছে পুরাণে॥
শিববাক্য পীঠমালা তন্ত্রের প্রমাণ।
যেই রাজ্যে যেই অঙ্গ সেই পীঠস্থান॥
সেই রাজ্যে এক দেবী ভৈরব আরজন।
দুই নামে পীঠস্থান করে নিরূপণ॥

* * * *

সতীর দক্ষিণ পদ পড়ে ত্রিপুরাতে।
ত্রিপুরাসুন্দরী খ্যাতি ত্রিপুর ভূমিতে॥
ত্রিপুরেশ নামে শিব ত্রিপুর রাজ্যেতে।
তান বরে ত্রিলোচন ত্রিপুর পত্নীতে॥
সেই সে কারণে ক্ষত্রী ত্রিপুর জাতি বলে।
অবধান কর রাজা মন কুতূহলে॥

তারপর ত্রিপুর জাতির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে মহাভারতের প্রমাণ লিখিত হয়েছে।—

মহাভারতের সভাপর্ব্বেতে লিখিছে।
সহদেব দিগ্বিজয় দক্ষিণে গিয়াছে॥
অথ শ্লোকঃ সভাপর্ব্বণি।
ত্রিপুরং স্ববশে কৃত্বা রাজানমোমিতৌজসম্।
নিজগ্রাহ মহাবাহু স্তরসা পৌরবেশ্বরঃ॥
তথার পয়ার
ত্রিপুরাকে বশ করি রাজা মহৌজস।
আনিলেক মহাবাহু পৌরবেশ্বর বশ॥

তারপর ভীষ্মপর্বের প্রমাণ—

অথ প্রমাণং ভীষ্মপর্ব্বণি।

প্রাগ্‌জ্যোতিষাদনু নৃপঃ কোশলোঽথ বৃহদ্বলঃ।
মেখলৈস্ত্রৈপুরৈশ্চৈব বর্ব্বরৈশ্চ সমন্বিতঃ॥

অথ শ্লোকের পয়ার।

প্রাগজ্যোতিষদনু আর কোশল নৃপগণ।
মেখল ত্রিপুর বর্ব্বর রাজাতে বেষ্টন॥
এইত কহিল ত্রিপুর বংশের আখ্যান।
বেদে তন্ত্রে ধরিয়াছে যেমন প্রমাণ॥

চতুর্দশ দেবতা—রাজমালা প্রথম খণ্ডে ত্রিপুরার চতুর্দশ দেবতার বিবরণ আছে। ত্রিপুরা চৌদ্দ দেবতার দেশ। কথায় বলে—

চৌদ্দ দেবতার মাটি।
সেলাম দিয়া হাঁটি॥

ত্রিপুরার লোকের ধারণা চৌদ্দ দেবতার মাটিতে একবার এসে পড়লে আর সহজে ছেড়ে যাওয়া যায় না। এ-অঞ্চলে এই চৌদ্দ দেবতার খুব প্রভাব। এখনো চৌদ্দ দেবতার মন্দিরে অসংখ্য পশুবলি হয়, আগে নাকি নরবলি ও হ'ত। বিপদে আপদে এখনো ত্রিপুরার লোকে চৌদ্দ দেবতার বাড়িতে বলি দেবার মানত করে।

ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে 'পুরান আগরতলা'। এখানেই চৌদ্দ দেবতার মন্দির। এখানেই আগে রাজধানী ছিল, পরে বর্তমান আগরতলা সহরে রাজপাট স্থানান্তরিত হয়। পুরনো দলিলপত্রে তাই আগরতলার নাম 'নয়া হাবেলী' বা নতুন সহর।

এই চৌদ্দ দেবতাই ত্রিপুর রাজবংশের আদি কুলদেবতা। রাজমালার মতে মহারাজ দৈত্যের পুত্র অন্যায়কারী ক্রূরমনা ত্রিপুরকে মহাদেব হত্যা করলে রানী হীরাবতী সিংহাসনে আরোহণ ক'রে রাজ্য চালনা করেন। পরে পুত্রলাভের জন্য বিধবা রানী মহাদেবের

আরাধনা ক'রে গর্ভবতী হন। তখন উপযুক্ত পুত্রলাভের জন্য তিনি এই চৌদ্দ দেবতার আরাধনা করেছিলেন। ত্রিলোচন নামে তাঁর এক সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্র হয়। মহারাজ ত্রিলোচনই এই চৌদ্দ দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ক'রে পুজো প্রচলিত করেন।

প্রথমে ত্রিপুরার রাজধানী ত্রিবেগ নগরে মূর্তি স্থাপিত হয়। পরে রাজধানী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উদয়পুরে এবং উদয়পুর থেকে বর্তমান পুরান আগরতলায় নেওয়া হয়েছে। উদয়পুরে চৌদ্দ দেবতার জীর্ণ মন্দির এখনো অতীতের স্মৃতি বহন করছে।

কিন্তু, এই চৌদ্দ দেবতার কোন সম্পুর্ণ অবয়ব নেই। চৌদ্দটি দেবতার মাথা শুধু। তেরটি মাথা অষ্ট ধাতুর, শুধু শিবের মাথাটি রুপোর। দেবতাদের নাম হচ্ছে—

হরোমা হরিমা বাণী কুমারো গণপা বিধিঃ।
ক্ষাব্ধির্গঙ্গা শিখী কামো হিমাদ্রিশ্চ চতুর্দ্দশ॥ রাজমালিকা।

আরেক জায়গায় আছে—

শঙ্করঞ্চ শিবানীঞ্চ মুরারিং কমলাং তথা।
ভারতীঞ্চ কুমারঞ্চ গণেশং মেধসং তথা॥
ধরণীং জাহ্নবীং দেবীং পয়োধিং মদনং তথা।
হুতাশঞ্চ গণেশঞ্চ দেবতাস্তাঃ শুভাবহাঃ॥
সংস্কৃত রাজমালা।

বাঙলা রাজমালায় আছে—

মহাদেব বিধি কহে শুনে মন্ত্রিগণে।
করপুটাঞ্জলি হৈয়া শুনে সর্ব্বজনে॥
হর উমা হরি মা বাণী কুমার গণেশ।
ব্রহ্মা পৃথ্বী গঙ্গা অব্ধি অগ্নি যে কামেশ॥
হিমালয় অন্তে করি চতুর্দ্দশ দেবা।
অগ্রেতে পূজিব সূর্য্য পাছে চন্দ্রসেবা॥

পূজার যে পূর্ব্বদিন প্রাতঃকাল লাভে।
সংযম করিবে চন্তাই দেওড়াই সবে ॥
পূজাবিধি দেওড়াই সবে তাকে জানে।
সমুদ্রের দ্বীপে তারা রহিছে নির্জ্জনে ॥
তাহাকে আনিবে যাইয়া রাজার সহিতে।
যেখানে পূজিবা আমি আসিব সাক্ষাতে ॥
চতুর্দ্দশ দেবতার চতুর্দ্দশ মুখ।
নির্ম্মাইয়া দিল শিবে আপনা সম্মুখ ॥

কিন্তু এদের পূজা পদ্ধতির সঙ্গে হিন্দু আচার বিধির কোন মিল নেই। চন্তাই এবং দেওড়াই নামে অনার্য পুরোহিতেরা এখনো এই দেবতাদের পুজো করেন। গালিম নামে এক পাহাড়ী সম্প্রদায় দেবালয়ের কাজে নিযুক্ত আছেন। পশুবলি ছাড়াও এখানে প্রতিদিন হাঁস ও পায়রা বলি হয়। দৈনন্দিন পুজো ছাড়াও এই চৌদ্দ দেবতার ছুটি বিশেষ পুজো আছে। খার্চি পুজো আর কের পুজো।

খার্চি পুজো—আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমীতে চৌদ্দ দেবতার বাড়িতে খার্চি পুজো হয়। তখন অসংখ্য পশুবলি হয়। আগে নাকি নরবলিও হ'ত।

কের পুজো—খার্চি পুজোর চৌদ্দ দিন পরে শনি বা মঙ্গলবারে চৌদ্দ দেবতার বাড়িতে এই পুজো হয়। এই পুজোর সময় একদিন ছুই রাত ত্রিপুরাবাসীদের ঘরে বন্ধ হ'য়ে থাকতে হয়। এমন কি মহারাজও ঘর থেকে বের হ'লে চন্তাই তাঁর অর্থদণ্ড করতে পারেন। অবশ্যি রাজ্যের সর্বত্রই এ-নিয়ম প্রতিপালিত হয় না। কের পুজো উপলক্ষে একটি বিশেষ এলাকা নির্ধারণ ক'রে দেওয়া হয়। ওই এলাকার ভেতর পুজোর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জন্ম মৃত্যু হ'তে পারে না, মানুষ-পশু বের হ'তে পারে না, জামা, জুতো, খড়ম, পাগড়ি, ছাতা, ব্যবহার করা যায় না। গান-বাজনা, হৈ চৈ, এমন কি জোরে কথা বলা পর্যন্ত নিষেধ। তোপধ্বনি দিয়ে ঘর থেকে বের হ'বার

সময় ঘোষণা করা হয়। আবার তোপধ্বনি হ'লেই ঘরে ঢুকতে হয়। ত্রিপুরার লোকেরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এ-সব নিয়ম মেনে চলেন। তাঁদের বিশ্বাস এ-পুজোর সাফল্যের ওপর রাজ্যের এক বছরের শুভাশুভ নির্ভর করে। রাজধানীতে পুজো হ'য়ে যাবার পর প্রত্যেক পার্বত্য পল্লীতে কের পুজো হয়।

আগরতলা নামোৎপত্তি—ত্রিপুরার বর্তমান রাজধানীর নাম আগরতলা। এর আগে যেখানে রাজধানী ছিল তাকে এখন 'পুরান আগরতলা' বলে। এই আগরতলা নামের উৎপত্তির বিবরণ রাজমালায় রয়েছে। ত্রিপুরায় ডাঙ্গর ফা নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর আঠারোটি পুত্র ছিল। তিনি একদিন পুত্রদের বুদ্ধির পরীক্ষা ক'রে বুঝলেন কনিষ্ঠ রত্ন ফা-ই সব চাইতে বুদ্ধিমান, এবং ভবিষ্যতে তিনিই রাজা হ'বেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠকে বঞ্চিত ক'রে কনিষ্ঠের রাজ্যলাভ ন্যায়বিধিসংগত নয়, এই ভেবে তিনি রত্ন ফাকে দূরে সরিয়ে দিতে মনস্থ করলেন। তিনি তাকে বিস্তর অর্থ ও লোকলস্কর দিয়ে গৌড়ের নবাবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এবং ভ্রাতৃবিরোধ নিবারণের জন্য শুধু জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যের অধিকারী না ক'রে অবশিষ্ট সতেরোটি পুত্রের মধ্যেই রাজ্য ভাগ ক'রে দিলেন। তাঁর এক পুত্রের নাম ছিল আগর ফা। এই আগর ফাকে যে-অঞ্চল দান করলেন তার নামই হ'ল আগরতলা। রাজমালায় আছে—'আগর ফা পুত্রে রাজা আগরতলা দিল।'

রত্ন ফা—এদিকে রত্ন ফা গৌড়েশ্বরের পুত্রস্নেহে সেখানে বাস করতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে অনেক কুকি সৈন্য ছিল। তারা ঘুঘুরা পোকা খেত। তাই দেখে গৌড়ের লোকেরা তাদের উপহাস করত। একদিন নবাব স্বয়ং রত্ন ফাকে এ নিয়ে পরিহাস করলে বুদ্ধিমান রত্ন ফা সবিনয়ে তাঁকে সুন্দর উত্তর দিয়েছিলেন—

কার্ত্তিক মাসেতে ঘুঘুরা কীট যে পড়িল।
গর্ত্ত খনি কুকী লোক তাহাকে খাইল॥

লোক মুখেতে তাহা শুনেন গৌড়েশ্বর।
হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে কুমারের তর॥
তোমার রাজ্যের কুকী কীট ধরি খায়।
প্রণমিয়া রাজপুত্র বলিল তাহায়॥
তোমার রাজ্যেতে যত জাতি প্রজা বৈসে।
তাহার ভক্ষণ দ্রব্য তোমাকে কি আসে॥
নানা জাতি লোক সব আমা সঙ্গে আছে।
কুকী কিরাত জাতি পিতায়ে সঙ্গে দিছে॥
সে সকল লোকে নানা দ্রব্য আনি খায়।
কখনেহ অনাচার নাহি ত্রিপুরায়॥
গৌড়েশ্বর জানিলেক এই বড় রাজা।
নানাবিধ জাতি আছে এহান যে প্রজা॥

একদিন কিন্তু রত্ন ফা এক হাস্যকর কাণ্ড ক'রে বসলেন। তখনকার দিনে গৌড়ে বারাঙ্গনাদের প্রভূত আধিপত্য ছিল। বিচিত্র বসনে ভূষণে সজ্জিত হ'য়ে তারা নবাব দর্শনে আসছে। রত্ন ফা তাদের বেগম মনে করে প্রণাম ক'রে বসলেন। এই কৌতুককর ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ রাজমালায় আছে—

একদিন গৌড়েশ্বর দ্বারেতে কুমার।
সময় না পায়ে তাতে বসিছিল দ্বার॥
শুভক্ষণ শুভদিন ছিল সোমবার।
বেশ্যাগণ আসে গৌড়পতি মিলিবার॥
হিরণ্যরচিত ভূষা স্বর্ণ বস্ত্র পৈরি।
যোগান ধরিছে তাতে পরম সুন্দরী॥
শকটে চলিছে কেহ ঘোটক উপর।
নিশান ধরিছে কেহ নফর চাকর॥
প্রধানিকা চলিয়াছে চতুর্দ্দোলে চড়ি।
আগে পাছে চলে যত হাতে লৈয়া ছড়ি॥

লোক সব নিকটে যায় দেখিবার তরে।
ছড়িদারে মারিয়া অন্তর করে দূরে॥
এ সব ব্যভার দেখি রাজার নন্দন।
গৌড়েশ্বর পত্নীজ্ঞান করিল তখন॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া গিয়া আগে দাঁড়াইল।
ভূমিগত হইয়া শির প্রণাম করিল॥
কোথাকার পুরুষ সে বেশ্যা জিজ্ঞাসিল।
সুন্দর অবোধ দেখি কটাক্ষে হাসিল॥

এরপর যা স্বাভাবিক তা-ই হ'ল। নগরবাসী সবাই এই অবোধ রাজকুমারকে দেখে উপহাস করতে লাগল। ক্রমে নবাবের কানে এ-কথা গেল। তিনিও শুনে হাসলেন।—

তাহা শুনি হাসিলেক গৌড় অধিপতি।
কুমারেকে ডাকাইয়া নিল শীঘ্রগতি॥
পুছিলেক গৌড়াধিপে এ সব বৃত্তান্ত।
তুমি ভক্তি কর কেন বেশ্যাকে একান্ত॥
প্রণাম করিয়া কহে রাজার কুমার।
গৌড়েশ্বর পত্নীজ্ঞানে করি নমস্কার॥
আড়ষ্ট ভাব কথা তাহার শুনিয়া তখনে।
বহু দয়া উপজিল গৌড়েশ্বর মনে॥

তারপর গৌড়েশ্বরের সহৃদয়তায় বিগলিত হ'য়ে রত্ন ফা একদিন তাঁর নিজের দুঃখের কথা নিবেদন করলেন। রাজা ডাঙ্গর ফা সতেরোটি পুত্রের মধ্যে রাজ্য ভাগ ক'রে দিয়ে কনিষ্ঠ রত্ন ফাকে রাজ্য থেকে বঞ্চিত করেছেন শুনে গৌড়েশ্বর রুষ্ট হ'লেন। তিনি অনেক সৈন্য সামন্ত দিয়ে রত্ন ফাকে ত্রিপুরায় পাঠিয়ে দিলেন পিতৃ-রাজ্য অধিকার করবার জন্য। তখনো ডাঙ্গর ফা জীবিত ছিলেন। পিতাপুত্রে যুদ্ধ বাঁধল, পিতা পরাস্ত হলেন।—

গড় জিনি রাঙ্গামাটি ছাড়াইয়া লৈল।
ডাঙ্গর ফার সৈন্য সব পর্ব্বতেত গেল॥
আর রাজপুত্র সভে ভঙ্গ দিল তায়।
গৌড় সৈন্য তার পাছে খেদাইয়া যায়॥
থানাংচি পর্ব্বতে রাজা ডাঙ্গর ফা মরিল।
আর যত রাজপুত্র লড়াইয়া ধরিল॥

যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে রত্ন ফা ত্রিপুরার রাজা হ'ন। গৌড়েশ্বরের সাহায্য গ্রহণ করে তিনি একটি কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। আত্মবিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বহিঃশত্রুর সহায়তায় জন্মভূমি আক্রমণের যে-নীতি রত্ন ফা অবলম্বন করেন ত্রিপুরার পরবর্তী ইতিহাসে তা অনেকবারই অনুসৃত হয়েছে। তার ফলে অনেক সময় ত্রিপুরার সিংহাসন গৌড়ের নবাবের খেলার সামগ্রীরূপে পরিণত হয়েছে। অবশ্যি, এর জন্য শুধু রত্ন ফাকে দোষী করা চলে না। তার পিতা ডাঙ্গর ফা-ই এর জন্য মূলত দায়ী। তিনি বিনাদোষে বুদ্ধিমান পুত্রকে নির্বাসিত না করলে হয়ত এ কাণ্ড ঘটত না।

ফা উপাধি—ত্রিপুরার রাজবংশের কৌলিক উপাধি দেববর্মা। কিন্তু রাজাদের অনেকেই আগে 'ফা' উপাধি ধারণ করতেন। মহারাজ ত্রিলোচনের আগেকার রাজাদের কোন উপাধি ছিল ব'লে জানা যায় নি। ত্রিলোচনের পরে পঁচিশ জন রাজার-ও কোন উপাধি দেখা যায় না। তারপর ছাব্বিশ সংখ্যক রাজা ঈশ্বর 'ফা' উপাধি গ্রহণ করেন। সেই থেকে রাজা ফা পর্যন্ত একাত্তর জন রাজার 'ফা' উপাধি ছিল। কারো কারো মতে শ্যানবংশের রাজাদের 'ফ্রা' উপাধি থেকেই এই 'ফা' শব্দ এসেছে। কিন্তু, রাজমালা সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত প্রমাণ প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন এই ফা শব্দ ত্রিপুরা ভাষারই শব্দ। ত্রিপুরা ভাষায় ফা শব্দের অর্থ পিতা। রাজা প্রজার পিতৃস্বরূপ তাই তাঁর উপাধি ছিল ফা। ফ্রা শব্দের অর্থ প্রভু। কিন্তু ত্রিপুরার রাজাদের উপাধি যে প্রভু বাচক নয়, পিতৃবাচক তার প্রমাণ রয়েছে। যেমন

রাজাদের উপাধি 'ফা', রানীদের উপাধি 'মা'। আচোঙ্গ ফা রাজা, আচোঙ্গ মা রানী। খিচোং ফা রাজা, খিচোং মা রানী। এখানে রাজাকে পিতা ও রানীকে মাতা বলা হয়েছে।

মাণিক্য উপাধি—রত্নমাণিক্যের সময় থেকে ফা উপাধির পরিবর্তে মাণিক্য উপাধি আরম্ভ হয়েছে। ত্রিপুরার শেষ মহারাজ বীরবিক্রম পর্যন্ত মাণিক্য উপাধি ধারণ ক'রে গেছেন। এ-উপাধিটি মুসলমান প্রদত্ত। ডাঙ্গর ফার পুত্র রত্ন ফা গৌড়ের নবাবের সাহায্যে পিতা ও ভ্রাতাদের পরাস্ত ক'রে ত্রিপুরার রাজা হন। সিংহাসন পাবার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আবার তিনি গৌড় দরবারে হাজির হলেন। তখন গৌড়েশ্বর তাঁকে এই মাণিক্য উপাধি দান করেন। রাজমালায় আছে—

সর্ব্বভ্রাতৃ জিনিয়া পাইল রাজ্যস্থান।
পুনর্ব্বার গেল গৌড়েশ্বর বিদ্যমান॥
বহুকরি হস্তী নিল অতি বৃহত্তর।
দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল গৌড়ের ঈশ্বর॥
রাজপুত্র জ্ঞানবান হেন হৈল জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর আপনেহ করিল ব্যাখ্যান॥
রত্নফা নাম তার পিতায়ে রাখি ছিল।
রত্নমাণিক্য খ্যাতি গৌড়েশ্বরে দিল॥
তদবধি মাণিক্য উপাধি ত্রিপুরেশে।
বিদায় হইয়া রাজা চলিলেক দেশে॥

রত্ন ফার সাহায্যকারী গৌড়েশ্বরের নাম নিয়ে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে রত্ন ফা লক্ষ্মণাবতীর মালিক তুগ্রল খাঁর সাহায্য পেয়েছিলেন। কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত এ-মত খণ্ডন করেছেন। ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায় ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুলতান সামসুদ্দিন বাঙলার মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি জাজনগর বা ত্রিপুরা আক্রমণ ক'রে ত্রিপুরার রাজার কাছ

থেকে বহু অর্থ ও অনেকগুলি হস্তী গ্রহণ করেন। কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্তের মতে এই সুলতান সামসুদ্দিনই রত্ন ফার পক্ষ অবলম্বন ক'রে ত্রিপুরা আক্রমণ করেন এবং তিনিই পরে রত্ন ফাকে মাণিক্য উপাধিতে ভূষিত করেন।

ত্রিপুরাব্দ—ত্রিপুরারাজ্যে একটি স্বতন্ত্র সন প্রচলিত। এর নাম ত্রিপুরা সন বা ত্রিপুরাব্দ। এটি বাঙলা সনের তিন বছর আগে চলে। বর্তমান ১৩৬৪ বাঙলায় ১৩৬৭ ত্রিপুরাব্দ। ৫৯০ খৃষ্টাব্দে এই সন প্রচলিত হয়।

ত্রিপুরাব্দের প্রবর্তক সম্পর্কে এক এক জন এক এক মত প্রকাশ করেছেন। পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহারাজ আদি ধর্মপালের তাম্রশাসন আলোচনা উপলক্ষে বলেছেন—

"এই সনন্দখানি হইতে ত্রিপুরা সন প্রবর্ত্তনের সময় কতকটা বুঝিতে পারা যায়। এ পর্য্যন্ত অনেক অনুসন্ধানেও নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই যে, ত্রিপুরা সনের প্রবর্ত্তক কে। বীররাজ ত্রিপুরা সনের প্রবর্ত্তক বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া গিয়াছেন। বীররাজ ত্রিলোচন হইতে গণনায় উনবিংশ রাজা। কিন্তু ত্রিপুর হইতে সপ্তম রাজা ধর্মপাল প্রদত্ত সনন্দে যখন ৫১ ত্রিপুরাব্দের উল্লেখ আছে তখন বীররাজের সময় সন প্রবর্ত্তনের কথা কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না। আমার অনুমান হয় মহারাজ ধর্ম্মপালের পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তম রাজা ত্রিপুরের সময়ে ত্রিপুরা সন আরম্ভ হয়, অথবা ত্রিপুরের পুত্র মহারাজ ত্রিলোচন পিতার নামে বা রাজ্যের নামে সন প্রবর্ত্তন করেন। ত্রিলোচন একজন অসীম প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার দ্বারা ত্রিপুরা সন প্রবর্ত্তনই সর্ব্বথা সম্ভবপর।"

'শ্রীশ্রীযুতের কৈলাসহর ভ্রমণ।'

এদিকে কৈলাসচন্দ্র সিংহ তাঁর 'রাজমালায়' লিখেছেন—"প্রবাদ অনুসারে জনৈক প্রাচীন ত্রিপুর নরপতি দিগ্বিজয় উপলক্ষে গঙ্গার পশ্চিম তীরে বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া সেই ঘটনা চিরস্মরণীয়

করিবার জন্য একটি অব্দ প্রবর্ত্তিত করেন। ইহাই অধুনা ত্রিপুরাব্দ নামে পরিচিত।"

আবার ঐতিহাসিক পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত' গ্রন্থে অন্য মত প্রচার করেছেন। তিনি বলেন—"৫৯০ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরাব্দ আরম্ভ হয়। সম্ভবতঃ কম্বোজগণ ত্রিপুরা আক্রমণ ও জয় করিয়া এই অব্দ প্রচলিত করেন।"

পরস্পর বিরোধী এ-সমস্ত মত আলোচনা ক'রে কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত সিদ্ধান্ত করেছেন মহারাজ হিমতি, নামান্তর যুঝারু ফা বা হামতার ফা সর্বপ্রথম বাঙলা দেশের খানিকটা অধিকার করেছিলেন। খুব সম্ভব তিনিই বঙ্গ বিজয়ের স্মৃতি রক্ষার্থে ত্রিপুরাব্দ প্রবর্ত্তন করেন।

ভাষা—পরিশেষে আর একটা কথা বলবার আছে। রাজমালা—প্রথম খণ্ড থেকে প্রসঙ্গত যে সব অংশ উদ্ধৃত হয়েছে তার ভাষা ঠিক পাঁচশ বছরের পুরনো নয়। এই থেকে অনেকের মনে রাজমালার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগতে পারে। কিন্তু এ-রকম হ'বার কারণ আছে। রাজমালার সবচাইতে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আগরতলা উজির বাড়িতে ছিল। সেটি গৃহদাহে ভস্মীভূত হয়। আমরা যে রাজমালা নিয়ে আলোচনা করেছি তা কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত সম্পাদিত। তিনি যে পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করেছেন তার ওপর পরবর্তী কালে হাত চালানো হ'য়েছে। এটি দুর্গামণি উজিরের গ্রন্থ। সেনগুপ্ত মহাশয় বলেছেন—"স্বর্গীয় দুর্গামণি ঠাকুর সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্যসেবী ছিলেন। রাজমালার শেষ দুইটি লহর তাঁহারই রচিত। কিন্তু তিনি একটি কার্য্যের দ্বারা গ্রন্থের গাম্ভীর্য্য কথঞ্চিৎ লঘু করিয়াছেন। রাজমালার সমগ্র অংশের উপর হস্ত চালনা করায় ভাষা কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার সমসাময়িক ভাবাপন্ন হইয়াছে। এই সংশোধন দ্বারা প্রাচীন ভাবের ব্যত্যয় না হইয়া থাকিলেও ভাষার কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এরূপ কার্য্যের দ্বারা যে

প্রাচীন গ্রন্থের মৌলিকতা নষ্ট হয় তাহা বোধহয় তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই।”

দুর্গামণি উজির উনিশ শতকে জীবিত ছিলেন, তাঁর হস্তচালনার ফলেই আলোচ্য রাজমালার ভাষায় আধুনিকতার ছাপ পড়েছে।

ধর্ম্মমাণিক্য—রাজমালা দ্বিতীয় খণ্ডে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের সময় থেকে বর্ণিত হয়েছে। ধর্ম্মমাণিক্য মহারাজ মহামাণিক্যের পুত্র। সংসারের প্রতি বীতরাগ হ'য়ে যৌবনে তিনি গৃহত্যাগ করেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর এক অলৌকিক ঘটনায় তাঁকে দেশে ফিরতে হয়। রাজ্যে আসার পর যথানিয়মে তাঁর অভিষেক হয়। তিনি অনেক সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। কুমিল্লার ধর্ম্মসাগর তাঁরই কীর্ত্তি। এই ধর্ম্মসাগর উৎসর্গ করবার সময় তিনি ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করেন আর তাম্রশাসনে এ-কথা লিখে দেন—"আমার বংশ যদি লোপ পায় এবং এ-রাজ্য অন্য রাজার হাতে চ'লে যায় তবে আমি সে রাজার দাসানুদাস হ'ব যদি তিনি এই ব্রহ্ম বৃত্তি লোপ না করেন।" রাজমালায় আছে—

তাম্রপত্রে লিখি দিল এ সব বচন।
আমা বংশ মারি যেবা হয়ত রাজন॥
তাহার দাসের দাস হইবেক আমি।
আমা কীর্ত্তি ব্রহ্মবৃত্তি না লঙ্ঘিও তুমি॥

ধর্ম্মমাণিক্য যেমন ধার্মিক তেমনি বীর ছিলেন। তিনি বাঙলাদেশ আক্রমণ ক'রে যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এ-সময় ব্রহ্মরাজ আরাকান রাজকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেন। মগরাজ ধর্ম্মমাণিক্যের আশ্রয়প্রার্থী হ'লেন। ধর্ম্মমাণিক্য তাঁকে আবার নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন।

কিন্তু, ধর্ম্মমাণিক্যের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি রাজমালা বিরচন। তাঁর আদেশে 'রাজরত্নাকর' ও 'রাজমালা' নামে দু'খানা সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হয়। বাঙলা রাজমালা ও তাঁর সময়েই লেখা আরম্ভ হয়।—

পূর্ব্বে রাজমালা ছিল ত্রিপুর ভাষাতে।
পয়ার গাঁথিল সব সকলে বুঝিতে॥

সুভাষাতে ধর্ম্মরাজে রাজমালা কৈল।
রাজমালা বলিয়া লোকেতে নাম হৈল॥

ধন্যমাণিক্য—ধর্মমাণিক্যের দুইপুত্র, ধন্য ও প্রতাপ। ধন্য জ্যেষ্ঠ, প্রতাপ কনিষ্ঠ। কিন্তু রাজপুরুষেরা চক্রান্ত ক'রে প্রতাপকেই রাজা করেন। রাজা হ'য়ে প্রতাপ অত্যন্ত অত্যাচারী হ'য়ে উঠলেন। তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হ'য়ে তাঁকে মেরে ফেলা হ'ল। তারপর ধন্যমাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করলেন। প্রধান সেনাপতির কন্যা কমলাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। রানী কমলার অনেক সুকীর্তি রয়েছে। আদর্শ মহারানী হিসেবে আজো ত্রিপুরার লোকে কমলার কথা স্মরণ করে।

ধন্যমাণিক্যের রাজত্বের সব চাইতে বড় ঘটনা হোসেন শাহের সঙ্গে যুদ্ধ। রায়কাচাগ ও রায়কছম নামে ধন্যমাণিক্যের দুই বীর সেনাপতি ছিলেন। তাঁদের সাহায্যে তিনি চট্টগ্রাম জয় করেন।—

তারপর শ্রীধন্যমাণিক্য নৃপবর।
চাটিগ্রাম জিনিলেক করিয়া সমর॥
চৌদ্দশ পাঁচত্রিশ শকে সমর জিনিল।
চাটীগ্রাম জয় করি মোহর মারিল॥
গৌড়ের যতেক সৈন্য চট্টলেতে ছিল।
শ্রীধন্যমাণিক্য তাকে দূর করি দিল॥

এ-সংবাদ শুনে হোসেন শাহ ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠলেন। সেনাপতি গৌর মল্লিকের অধীনে প্রচুর সৈন্য-সম্ভার দিয়ে তিনি ধন্যমাণিক্যকে দমন করতে পাঠালেন। নবাব সৈন্যে প্লাবিত হ'ল ত্রিপুরা রাজ্য।

হোসেন সা গৌড়েশ্বর এ বার্ত্তা শুনিয়া।
বহুল কটক পাঠায় গৌড় মল্লিক দিয়া॥
বার বাঙ্গালা সৈন্য গৌড় মল্লিক সঙ্গে।
আর বহু সৈন্য দিল যত আছে বঙ্গে॥

বহুতর নৌকা সঙ্গে গোমতী উজাইয়া।
হস্তী ঘোড়া সৈন্য সেনা সঙ্গে সাজাইয়া॥

মেহেরকুলের যুদ্ধে নবাব সৈন্যের জয় হ'ল। কিন্তু তারপর ত্রিপুর সেনাপতি এক অপূর্ব কৌশলে যুদ্ধ জয় করলেন। কুমিল্লার উজানে সোনামুড়ার পাদদেশে বাঁধ দিয়ে তিন দিন জল আটক রাখা হ'ল। তিন দিন পর হঠাৎ বাঁধ ভেঙে দেওয়ায় প্রবল জলস্রোত অতর্কিতে সমরক্ষেত্র প্লাবিত ক'রে ফেলল। গৌড়ের সেনাদল সে প্লাবনের মুখে তৃণের মত পর্য্যুদস্ত হ'য়ে গেল। ত্রিপুর সৈন্য এই সুযোগে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিস্তর পাঠান সৈন্য হতাহত হ'ল। সেনাপতি গৌর মল্লিক কোনরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন।

এ-সময়ে ত্রিপুরায় তান্ত্রিক অভিচারের প্রচলন ছিল। রাজমালা পাঠ করলে জানা যায় গৌর মল্লিকের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হ'বার জন্য ধন্যমাণিক্য গুরুর আদেশে অভিচারের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।—

শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা গুরুতে কহয়।
অভিচার কর্ম্ম কর শত্রু হউক ক্ষয়॥
অভিচার কর্ম্মারম্ভ করে দ্বিজবরে।
সুন্দর মণ্ডপ কৈল তথায় চত্বরে॥
প্রথম বয়স কৃষ্ণবর্ণের চণ্ডাল।
কুণ্ডের উপরে দিল চান্দোয়াদি ভাল॥
সপ্তদিন সপ্তরাত্র মণ্ডপে রহিল।
যজ্ঞ শেষে চণ্ডালের মস্তক কাটিল॥
রায়বার সঙ্গে দিল সে মুণ্ড লুকাইয়া।
গৌড়াই মল্লিকের সৈন্যে মুণ্ড গাড়ে নিয়া॥
আচম্বিত রাত্রকালে মহাশব্দ হৈল।
ত্রিপুর সৈন্য আইসে বলি গৌড় ভঙ্গ দিল॥
ভয় পাইয়া গৌড় সৈন্য দূরেতে রহিল।
কাপুরুষ বলিয়া সবে ডাকিয়া কহিল॥

হোসেন সাহা মল্লিককে ভৎ´সিল বিস্তর।
লজ্জা ভয় পাইয়া মল্লিক হইল কাতর॥

এই পরাজয়ের বার্তা শুনে হোসেন শাহ ক্রোধে অপমানে অধীর হ'য়ে উঠলেন। তিনি আসাম জয় ক'রে এসেছেন, আর ক্ষুদ্র ত্রিপুরার অধিপতি তাঁকে পরাস্ত করল, এতে তাঁর ক্ষোভের সীমা রইল না। গৌর মল্লিকের পরিবর্তে হৈতন খাঁকে সেনাপতি ক'রে এবার পাঠানো হ'ল ত্রিপুরায়।—

চৌদ্দশ সাত্রিশ শকে চাটিগ্রাম জিনে।
শুনিয়া হোসেন সাহা মহাক্রোধ মনে॥
যুদ্ধেতে আসাম কোচ মারিয়া লইল।
ত্রিপুরার সৈন্যে আমা অপমান দিল॥
মনেতে চিন্তিয়া সৈন্য পাঠায়ে বিস্তর।
হৈতন খাঁ করা খাঁ দুই পাঠায় সত্বর॥
রাঙ্গামাটি জিনিবারে হৈতন খাঁ চলিল।
হোসেন সাহা আশ্বাসিয়া বহু সৈন্য দিল॥
রাঙ্গামাটি দেশেতে ত্রিপুর সৈন্য রয়।
মারিয়া আনহ তাকে শীঘ্র করি জয়॥

এবার কৈলাগড় অঞ্চলে হৈতন খাঁর সঙ্গে ত্রিপুর সৈন্যের যুদ্ধ বাঁধল। যুদ্ধে হৈতন জয়ী হ'লেন, ত্রিপুর সৈন্য ক্রমেই পিছু হঠতে লাগল। ত্রিপুরার স্বাধীনতা সংকটাপন্ন হয়ে উঠল, মহারাজ ধন্যমাণিক্য বিচলিত হ'লেন। এ সময় এক ডাকিনীর অলৌকিক শক্তিবলে ত্রিপুরা রক্ষা পায় ব'লে রাজমালায় উল্লেখ আছে। তার নাম বলাগমা। বলাগমার প্রভাবে গোমতী উজানে আটকা পড়ল আর ভাটিতে চড়া পড়ে গেল। হৈতন খাঁ খুশি হ'য়ে নদীর চরে ছাউনি গাড়লেন। এদিকে নদী উজানে ফুলে উঠতে লাগল। তারপর গভীর নিশীথে বাঁধ খুলে দেওয়া হ'ল। নিরুদ্ধ জলরাশি হঠাৎ ছাড়া পেয়ে হৈতন খাঁর ছাউনি ভাসিয়ে নিয়ে চলল। নিদ্রিত

গৌড় সৈন্য আকস্মিক প্লাবনের মুখে প'ড়ে দিশাহারা হ'য়ে গেল। ত্রিপুর সৈন্য শত শত ভেলায় ভেসে আসছিল। সেখান থেকে তারা অস্ত্রবর্ষণ সুরু করল। তারপর যে-বনে গৌড় সৈন্যের আশ্রয় নেবার কথা সেখানে আগুন ধরিয়ে দিল। দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল বনভূমি। এই অতর্কিত আক্রমণে হৈতন খাঁ হতভম্ব হ'য়ে পড়লেন। তারপর গৌরমল্লিকের মত তিনিও প্রাণ নিয়ে পলায়ন করলেন।

ত্রিপুরাসুন্দরী—কিন্তু শুধু যুদ্ধজয়ই ধন্যমাণিক্যের একমাত্র কীর্তি নয়। তাঁর অক্ষয় কীর্তি উদয়পুরে ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর প্রতিষ্ঠা। এই ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির ত্রিপুরার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। এখানে উদয়পুরে 'মায়ের বাড়ি' দর্শনের জন্য বহু দূরাঞ্চল থেকে লোক সমাগত হয়। ত্রিপুরাসুন্দরী কালী মূর্তি। মূর্তিটি কষ্টিপাথরে গড়া। ধন্যমাণিক্য এই দেবীর মন্দির নির্মাণ করেন। কিন্তু মূর্তিটি কখনকার তৈরি জানা যায় নি। ত্রিপুরা রাজ্যে পীঠস্থান সম্পর্কে 'পীঠমালাতন্ত্রে' লেখা আছে ত্রিপুরায় সতীর দক্ষিণ পদ পড়ায় দেবীর নাম ত্রিপুরা-সুন্দরী আর ভৈরব ত্রিপুরেশ শিব।

অথ পীঠমালাতন্ত্র প্রমাণ শ্লোকঃ।

ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী।
ভৈরব স্ত্রিপুরেশশ্চ সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়কঃ॥

পদবন্ধ

সতীর দক্ষিণ পদ পড়ে ত্রিপুরাতে।
ত্রিপুরাসুন্দরী খ্যাতি ত্রিপুর ভূমিতে॥
ত্রিপুরেশ নাম শিব ত্রিপুরা রাজ্যেতে।
তান বরে ত্রিলোচন ত্রিপুর পত্নীতে॥

রাজমালায় আছে স্বপ্নাদেশ অনুসারে ত্রিপুরাসুন্দরীকে চন্দ্রনাথ তীর্থ থেকে উদয়পুরে আনা হয়। ধন্যমাণিক্য একটি মন্দির নির্মাণ করতে আরম্ভ করেন। তখন—

ভগবতী রাজাতে স্বপ্ন দেখায় রাত্রিতে।
এই মঠে আমা স্থাপ রাজা মহা সত্বে॥
চাটিগ্রামে চট্টেশ্বরী তাহার নিকট।
প্রস্তরেতে আমি আছি আমার প্রকট॥
তথা হৈতে আনি আমা এই মঠে পূজ।
পাইবা বহুল বর যেইমতে ভজ॥
স্বপ্ন দেখি নরপতি দ্বিজেতে কহিল।
ব্রাহ্মণ সকলে মিলি সাধুবাদ কৈল॥
রসাঙ্গমৰ্দ্দন নারায়ণ পাঠায় চট্টলে।
স্বপ্নে যেই স্থানে দেখে মিলিলেক ভালে॥
উৎসব মঙ্গল বাদ্যে রাজ্যেতে আনিল।
সত্বর গমনে রাজা নমস্কার কৈল॥
কতদিন পরে মঠ প্রস্তুত হইল।
পুণ্যাহ দিনেতে রাজা উৎসর্গিয়া দিল॥
জন্ম সফল রাজার কালিকা স্থাপিয়া।
নানা বলিদান করে নর আদি দিয়া॥

চট্টগ্রাম জয় দ্বারা ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থ চন্দ্রনাথের সঙ্গে ধন্যমাণিক্যের নাম যুক্ত হয়েছে। এ ছাড়াও তিনি আরো কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করেন।—

শ্রীধন্যমাণিক্য রাজা ধৰ্ম্মে চিত্ত দিল।
প্রতিমা ভুবনেশ্বরী স্বুবর্ণে নির্ম্মাইল॥
এক মণ স্বুবর্ণের প্রতিমা নির্ম্মাইয়া।
জীবন্যাস করাইল সাধক আনিয়া॥

তারপর তিনি একটি বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করেন—

পরে বিষ্ণু মঠ এক নৃপে নির্ম্মাইল।
সাত্বিক হইয়া রাজা উৎসর্গিয়া দিল॥

তাঁর আর একটি কীর্তি চৌদ্দ দেবতার মন্দির নির্মাণ—

শ্রীধন্যমাণিক্য রাজা আর মঠ দিল।
রত্নপুরে চতুর্দ্দশ দেবতা স্থাপিল ॥

আরেকটি কীর্তি দ্বারা ধন্যমাণিক্য অক্ষয় যশ অর্জ্জন করেন। তখনকার দিনে ত্রিপুরায় নরবলির প্রচলন ছিল। ধর্মান্ধ হ'য়ে ত্রিপুর রাজারা অসংখ্য নরবলি দিতেন। বহু বাঙালী তা'তে মারা পড়ত। ধন্যমাণিক্য এই ভয়াবহ প্রথা বন্ধ করে দেন। শুধু রীতি রক্ষার জন্য কয়েকটি দেবস্থানে অতি অল্প সংখ্যক বলির ব্যবস্থা করেন।—

পূর্ব্বেতে ত্রিপুর রাজা নরবলি দিত।
সহস্রে সহস্রে বঙ্গ বর্ষে কাটা যাইত ॥
শ্রীধন্যমাণিক্যে মানা তাহাকে করিল।
তদবধি নরবলি নিষেধ হইল ॥
তিন বৎসরে এক নর চতুর্দ্দশ দেবে।
কালিকাতে এক নর পাইবেক যবে ॥
দৌচা পাথরে দুই নর শক্র পাইলে হয়।
গোমতীতে দুই বলি ঘটে যে সময় ॥
ইহাতে অধিক বলি মানা করে রাজা।
তদবধি নিশ্চিন্তে রহিল রাজ্য প্রজা ॥

সাহিত্য—পিতা ধর্মমাণিক্যের মত ধন্যমাণিক্যেরও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল। আগে বাঙলা ভাষায় প্রেতচতুর্দশী গান প্রচলিত ছিল। ধন্যমাণিক্য এই গান বুঝতে না পারায় আবার 'সুভাষায়' রচনা করান। এই 'সুভাষা' অর্থ বোধহয় সংস্কৃত ভাষা অথবা সুমার্জিত বাঙলা ভাষা।

বঙ্গভাষা গীত রাজা তাতে না বুঝিল।
প্রেতচতুর্দ্দশী গান বর্ণিয়া শুনিল ॥
রামকবি সৃজিলেক সেই ত নৃপতি।
শ্রীধন্যমাণিক্য রাজার তাতে হৈল প্রীতি ॥

এ ছাড়াও আরো কয়েকটি গ্রন্থ তাঁর আদেশে রচিত হয়। রাজমালায় 'উৎকলখণ্ড পাঁচালী' ও জ্যোতিষের 'যাত্রারত্নাকর নিধি'র নাম উল্লেখ আছে।—

শ্রীধন্যমাণিক্য রাজা কমলার পতি।
উৎকলখণ্ড পাঁচালী রচাইল মহামতি॥
জ্যোতিষের যাত্রা রত্নাকর নিধি আর।
পাঁচালী রচাইল রাজা লোকে বুঝিবার॥

সাহিত্যের মত নৃত্য গীতেও তাঁর অনুরাগ কম ছিল না। ত্রিহুত দেশ থেকে লোক এনে তিনি রাজ্যে সংগীত ও নৃত্য শেখার ব্যবস্থা করেন।—

ত্রিহুত দেশ হইতে নৃত্যগীত আনি।
রাজ্যেতে শিখায় গীত নৃত্য নৃপমণি॥
ত্রিপুর সকলে গীত সেই ক্রমে গায়।
ছাগ অস্ত্রে তার যন্ত্রে ত্রিপুরে বাজায়॥
এই মতে অতি সুখে আছেন নৃপতি।
প্রজাসব মহাসুখে বঞ্চিলেক ক্ষিতি॥

এভাবে বিভিন্ন যুদ্ধে শত্রুদলন ক'রে ধর্ম, সাহিত্য ও সংগীতের পৃষ্ঠ পোষকতা ক'রে প্রজারঞ্জক মহারাজ ধন্যমাণিক্য ১৫১১ খৃষ্টাব্দে মারা যান। মহারাণী কমলাদেবী স্বামীর চিতায় অনুমৃতা হন।

মৈথিলী ব্রাহ্মণ—ধন্যমাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ধ্বজমাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল খুব অল্প দিন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা দেবমাণিক্য রাজা হন। তিনি এক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের প্রভাবে পড়েন। ব্রাহ্মণের বাড়ি ছিল মিথিলায়, তাঁর নাম ছিল [illegible]। তাঁর প্রভাবে প'ড়ে তান্ত্রিক সাধনার জন্য দেবমাণিক্য আটজন সেনাপতিকে বলিদান করেন। তারপর একদিন তিনি শ্মশানে গেছেন সাধনের জন্য, এমন সময় ব্রাহ্মণ তাঁকে হত্যা করলেন।

এরপর ধ্বজমাণিক্যের শিশুপুত্র ইন্দ্রকে রাজা করা হ'ল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে লক্ষ্মীনারায়ণই রাজত্ব করতে লাগলেন। তিনি তখন মিথিলা থেকে আড়াইশ যোদ্ধা ত্রিপুরায় আনয়ন করেন।

লক্ষ্মীনারায়ণের প্রতি প্রজাদের মনোভাব ভাল ছিল না। সেনাপতি দৈত্যনারায়ণের চক্রান্তে একদিন তাঁকে জানানো হ'ল মহারানী অসুস্থ, পায়ের ধুলো চান। ব্রাহ্মণ এ সংবাদে বিশ্বাস ক'রে রাজ অন্দরে চললেন। পথেই একদল সৈন্য তাঁকে বেঁধে ফেলল এবং তারপর তাঁকে শূলে চড়ানো হ'ল। এরপর সৈন্য সামন্ত ক্ষেপে উঠল। ইন্দ্র মাণিক্য ও তাঁর মাতাকেও তারা মেরে ফেলল।

বিজয়মাণিক্য—দেবমাণিক্যের পুত্র বিজয়কে লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দী ক'রে রেখেছিলেন। এবার তাঁকে মুক্ত ক'রে রাজপদে অভিষিক্ত করা হ'ল। এই বিজয়মাণিক্য একজন বীর্যবান পুরুষ ছিলেন। তিনি সেনাপতি দৈত্যনারায়ণের কন্যাকে বিবাহ করেন। একে প্রধান সেনাপতি, তার ওপর রাজার শ্বশুর, দৈত্যনারায়ণই রাজ্যের সর্বেসর্বা হ'য়ে উঠলেন। বিজয়মাণিক্য দেখলেন তিনি নামেমাত্র রাজা। প্রকৃত রাজা হ'তে হ'লে দৈত্যনারায়ণকে সরাতে হয়।

দৈত্যনারায়ণের বড় জামাতা মাধবের সঙ্গে বিজয় মাণিক্যের পরামর্শ হ'ল। মাধব ভীত হ'য়ে বললেন, তাঁর ঘরে সেনাপতির মৃত্যু হ'লে মহারানী তাঁকে আস্ত রাখবেন না। তারপর, অনেক আলাপের পর স্থির হ'ল মাধব ভুষণায় চ'লে যাবেন এবং সেখানে দৈত্যনারায়ণকে ডেকে নিয়ে হত্যা করা হ'বে। বিজয় মাণিক্য নিজের হীরার আংটি খুলে মাধবকে দিলেন, আর বললেন এই আংটি না-দেখিয়ে কেউ যদি বলে মহারাজ তাঁকে ডেকেছেন তা হ'লে-ও যেন তিনি রাজধানীতে না আসেন।

মাধবের গৃহে যথাকালে দৈত্যনারায়ণকে হত্যা করা হ'ল। তারপর ঘরে আগুন দিয়ে রটনা করা হ'ল সেনাপতি আগুনে পুড়ে মরেছেন। এদিকে মহারাজের সঙ্গে মাধবের চক্রান্তের কথা রানী

লক্ষ্মীদেবী জানতে পারলেন। তিনি দৈত্যনারায়ণের কন্যা। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি মনে মনে ভীষণ সংকল্প আঁটলেন। একদিন শিকারে যাবার সময় রাজা ভুলে হীরার আংটি বিছানায় ফেলে গেছেন, রানী সেটি তুলে নিলেন। তারপর আংটি সহ মাধবকে ডেকে পাঠালেন। আংটি দেখে মাধব নির্ভয়ে রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। তখন অতি সহজেই তাঁকে হত্যা করা হ'ল। তিন দিন পর মাধবের হত্যার সংবাদ শুনে বিজয়মাণিক্য ক্রোধে অধীর হ'য়ে উঠলেন।—

ক্রোধ হইল নৃপতি অগ্নির সমানে।
যে লোকে মাধব বধে তাকে ধরি আনে॥
জিজ্ঞাসিল রাজা তোকে কেবা নিয়োজিল।
ভয়ে কম্পমান হৈয়া সভাতে কহিল॥
মহাদেবী আজ্ঞা দিল মাধব বধিতে।
এই অপরাধ আমার বলিল রাজাতে॥
এ কথা শুনিয়া রাজা বড় উষ্মা হইল।
তখনে প্রান্তরে নিয়া তাহাকে বধিল॥
সেই ক্ষণে মহাদেবী দিল বনবাস।
হিরাপুরে রাখে রাণী জীবন নৈরাশ॥

*　　　*　　　*

হিরাপুরে লক্ষ্মীরাণী বনবাস সেবী।
পরে রাজা বিভা করে আর মহাদেবী॥
প্রধানস্থ পাত্র মিত্র রাজাতে কহিল।
কতদিন পরে রাজা লক্ষ্মীরাণী নিল॥

উপরে উদ্ধৃত এই তিনটি বৃত্তান্ত থেকে ষড়যন্ত্র, অবিশ্বাস ও হত্যা হলাহলে ভীষণ তখনকার ত্রিপুর রাজদরবার ও রাজঅন্তঃপুরের খানিকটা পরিচয় মেলে।

বিজয়মাণিক্যের রাজত্বকালে পাঠানদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়। তাঁর সৈন্যের মধ্যে একটি পাঠান ফৌজ গঠিত হয়েছিল। চট্টগ্রামের মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিজয়মাণিক্য দুই হাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করেন। কথা ছিল তাঁর সাহায্যার্থে এক হাজার পাঠান সৈন্য যাবে। কিন্তু বিজয়মাণিক্য চ'লে যাবার পর বেতন বাকি নিয়ে উজিরের সঙ্গে পাঠান সৈন্যের ঝগড়া বাঁধে। তারা উজিরকে হত্যা করে এবং বিদ্রোহের চেষ্টা করতে থাকে। তারা চক্রান্ত করল রাজধানী লুট করবে আর চট্টগ্রাম থেকে ফেরার পথে বিজয়মাণিক্যকে হত্যা করবে। বিজয়মাণিক্য এ-কথা জানতে পেরে কঠোর হস্তে পাঠানদের দমন করলেন। অনেক পাঠান মারা গেল। যারা প্রাণে বাঁচল তারা গৌড়ে পালিয়ে গেল।

মমারক খাঁ—বিজয়মাণিক্যের হাতে পাঠান সৈন্যের লাঞ্ছনার কথা শুনে গৌড়ের নবাব সুলতান সুলেমান তাঁর শ্যালক মমারক খাঁর অধীনে বিস্তর সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন ত্রিপুরায়।—

মমারক খাঁ নামে ত গৌড়েশ্বর শালা।
মহাবীর পরাক্রম যুদ্ধে অতি ভালা॥

* * *

দুরন্ত পাঠান জাতি ক্রোধে অহঙ্কারী।
চলিয়াছে চাটিগ্রাম পাঠান সঙ্গে করি॥
মমারক খাঁ সৈন্য সনে চাটিগ্রাম গেল।
ভঙ্গ দিল ত্রিপুর সৈন্য মগলে জিনিল॥

ক্রমাগত আটমাস যুদ্ধ চলল। তবু ত্রিপুরার সেনাপতিরা মমারক খাঁকে হঠাতে পারলেন না। বিরক্ত হ'য়ে বিজয়মাণিক্য তাঁদের সঙ্গে এক নির্মম রসিকতা করলেন। তিনি তাঁদের এক একটি চরকা পাঠিয়ে দিলেন। তার মানে 'তোমাদের আর যুদ্ধ সাজে না, এবার ঘরে গিয়ে চরকা কাটায় মন দাও।'—

আটমাস যুদ্ধ করে পাঠানের সনে।
লইতে না পারে গড় চাটিগ্রাম স্থানে॥
হেন শুনি বিজয় মাণিক্য ক্রোধ হইল।
সেনাপতি সকলেরে চরখা পাঠাইল॥

তারপর শ্রীহট্ট থেকে সেনাপতি কালনাজিরকে চট্টগ্রাম পাঠানো হ'ল। কালনাজির ছিলেন বীরপুরুষ। তাঁর আগমনে ত্রিপুর সৈন্যের মনে উৎসাহের সঞ্চার হ'ল। দুই পক্ষে প্রবল যুদ্ধ চলল। এমন সময় সেনাপতি কালনাজির নিহত হলেন। সেনাপতির মৃত্যুতে ত্রিপুর সৈন্যের মনোভঙ্গ হ'ল। পাঠান সৈন্যেরা জয়োল্লাসে মত্ত হ'ল। এদিকে গভীর রাত্রির অন্ধকারে ত্রিপুর সৈন্য আবার পাঠানদের আক্রমণ করল। পাঠানেরা যুদ্ধ জয় ক'রে সুখনিদ্রায় ঢ'লে পড়েছিল। জেগে উঠে ভাল ক'রে ব্যাপার বোঝবার আগেই তাদের ছিন্নশির ধুলোয় লুটিয়ে পড়তে লাগল।—

ভঙ্গ দিল পাঠান অনেক মারা গেল।
মাতৃসনে মমারক খাঁ গড়ে লুকাইল॥
লুকাইয়া রহে গড়ে প্রাচীর উপর।
চারি পার্শ্বে ত্রিপুর সৈন্য বলে ধর ধর॥

তারপর মমারক খাঁ নিজেই ধরা দিলেন।—

প্রাচীর বেড়িল সবে ত্রিপুর সেনাগণ।
মমারক বলিয়া সৈন্যে করয়ে তর্জ্জন॥
মমারক খাঁর মাতা কহিল তখন।
অগ্নিতে পুড়িলে মাটি না পাইব কখন॥
মাতার কথন শুনি কহিল ডাকিয়া।
সত্য কর তোমা সব মিলিব আসিয়া॥
ত্রিপুর সেনায়ে বলে না মারিব তোকে।
রাজার সাক্ষাতে নিব বলিল তাহাকে॥

এ কথা শুনিয়া খাঁয়ে আপনে মিলিল।
লোহার পিঞ্জর মধ্যে তাহাকে ভরিল॥
কাফির বলিয়া খাঁয়ে বহু গালি দিল।
ত্রিপুরের সেনা তাকে লইয়া চলিল॥"

কিন্তু মমারক খাঁর পরিণাম বড় ভয়ংকর। তাঁকে বন্দী ক'রে রাজসমীপে নেওয়া হ'ল। রাজা তাঁর বন্ধন মোচন ক'রে বিবিধ ভূষণ দিয়ে তাঁকে সমাদর করলেন।

পরে মমারক খাঁকে পিঞ্জরে রাখিয়া।
সুবর্ণ দ্বারের বাহিরে রাখিলেক নিয়া॥
নৃপতির স্থানে সব বৃত্তান্ত কহিল।
মমারক খাঁকে সুবর্ণ দ্বারেতে আনিল॥
পিঞ্জর হইতে খসাইতে নৃপে আজ্ঞা দিল।
বিচিত্র ভূষণ কত খাঁকে রাজা দিল॥
রাজা দেখি মমারক খাঁ সেলাম না করে।
কিছু না বলিল রাজা ক্রোধ নাহি তারে॥

মমারক খাঁকে হত্যা করবার কোন অভিপ্রায় বিজয়মাণিক্যের ছিলনা। কিন্তু চন্তাই প্রস্তাব করলেন তাঁকে চৌদ্দ দেবতার কাছে বলি দেওয়া হোক। বিজয়মাণিক্য আপত্তি করলেন। তখন চন্তাই বললেন এ দেবতার আদেশ। বিজয়মাণিক্যের আর আপত্তি করবার সাহস হ'ল না।—

নৃপতির ইচ্ছা আছে না বধিতে তাকে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ যার যে মত যে থাকে॥
দুর্ল্লভ চন্তাই নাম রাজাতে যে কহে।
চতুর্দ্দশ দেব বলি খাঁকে দিব তাহে॥
নৃপতিয়ে বলে চন্তাই উচিত না হয়।
মমারক খাঁ বড়লোক সর্ব্বলোকে কয়॥
চন্তাই বলে খাঁকে বলি দিবার তরে।
দেবতার আজ্ঞা হৈছে বলিল রাজারে॥

তখনো বিজয়মাণিক্য প্রকাশ্যে সম্মতি দেন নি। রাজমালায় আছে।—

নিঃশব্দে রহিল রাজা অনুমতি জ্ঞানে।
চন্তাই যে খাঁকে নিল রত্নপুর স্থানে॥

মমারক খাঁর হত্যার বিবরণ রাজমালায় বিশদভাবে দেওয়া আছে। এই ঘটনার সাতদিন পর গৌড়ের নবাবের কাছ থেকে মহারাজের কাছে চিঠি এল সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে। বলা বাহুল্য সন্ধির প্রধান সর্ত মমারক খাঁর মুক্তি। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। মমারক খাঁর আত্মা তখন পরলোকে।

সপ্তদিন পরে আইসে গৌড়েশ্বর লিখা।
মমারক খাঁ ছাড়ি দেও তুমি আমার সখা॥
পদ্মা অবধি করি যাত্রাপুর দেশ।
সীমানা করি দিব রাজ্য তোমাকে বিশেষ॥
পত্র শুনিয়া রাজা হইয়া বিস্মিত।
চন্তাই গঞ্জিল রাজা সভার বিদিত॥
মমারক খাঁকে দিত যদি হৈত গৌড় বশ।
তুমি চন্তাই করিলা যে আমা অপযশ॥

তখন আর উপায় কি। সোনার পাতে মুড়ে নবাবের পত্রের উত্তর পাঠালেন মহারাজ। তা'তে দুঃখের সঙ্গে জানালেন, মমারক খাঁ আর জীবিত নেই।—

নৃপে বলে চিন্তিয়া যে নহে কিছু কাজ।
খাঁয়ের মরণ বার্ত্তা লিখে মহারাজ॥
কনকরচিত পত্র বিশ্বাসে লিখিল।
নৃপপত্র শুনি গৌড় উত্থিত হইল॥

তারপর বিজয় মাণিক্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বাঙলার অংশ বিজয়। দিল্লীর সিংহাসনে আকবর সমাসীন। মোগল গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত, পাঠান শক্তি হীনপ্রভ। এই সুযোগে বিজয়মাণিক্য বাঙলাদেশে অভিযান করলেন। রাজমালায় এ-অভিযানের বর্ণনা আছে।—

এই অবকাশেতে বিজয় মাণিক্য রাজা।
বঙ্গদেশে চলিলেক লৈয়া সৈন্য প্রজা॥
পঞ্চ সহস্র নৌকার করিল সাজন।
এক সহস্র অশ্ব রাখে নৌকাতে আপন॥
নৌকা প্রতি পঞ্চ বন্দুক পঞ্চ তীরন্দাজ।
আর নৌকায় রাখিলেক পদাতি সমাজ॥
ডিঙ্গি আদি নৌকায়ে রাখে যত সৈন্যগণ।
বিজয় মাণিক্য চলে অনেক সাজন॥

প্রথমে তিনি ঢাকা জেলার সোনার গাঁ জয় করলেন। সেখান থেকে গেলেন বিক্রমপুর। তারপর শ্রীহট্ট ঘুরে স্বদেশে ফিরলেন। সার্থক হ'ল তাঁর বিজয় নাম।

বিজয় মাণিক্যের খ্যাতি দিল্লীর দরবার পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ঐতিহাসিক আবুলফজল তাঁর আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে লিখেছেন—"ভাটী প্রদেশের সহিত সংলগ্ন একটি স্বাধীন রাজ্য আছে। সেই রাজ্যের নাম তিপ্রা আর তাহার অধিপতির নাম বিজয়মাণিক্য। যিনি রাজা হন তিনিই তাঁহার নামের অন্তে "মাণিক্য" উপাধি সংযুক্ত করেন। সেই রাজ্যের আমির ওমরাহগণ "নারায়ণ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই রাজার তুই লক্ষ পদাতি ও এক সহস্র হস্তী আছে, কিন্তু অশ্ব অতি বিরল।"—কৈলাস সিংহের রাজমালা।

বিজয় মাণিক্য খণ্ডের পর অনন্ত মাণিক্য, উদয় মাণিক্য ও জয় মাণিক্য এই তিন জন রাজার বিবরণ দিয়ে রাজমালা দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত হয়েছে।

ত্রিপুরায় প্রবাদ আছে মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের আদেশে রাজমালা তৃতীয় খণ্ড রচিত হয়। কিন্তু রাজমালার প্রস্তাবনায় আছে গোবিন্দ মাণিক্যের পুত্র মহারাজ রামমাণিক্যের সময়ে এই খণ্ড লিখিত হয়।

শ্রীল শ্রীগোবিন্দ মাণিক্য পুণ্যবান অতি।
তাহার তনয় রামমাণিক্য নৃপতি॥
সিদ্ধান্ত বাগীশ দ্বার পণ্ডিত পুরাতন।
তাহানে সম্বোধি রাজা বলিল তখন॥
জয়মাণিক্যাবধি পূর্ব্ব রাজা যত।
বংশ শ্রেণী রাজমালা আছয়ে লিখিত॥
তারপরে যত রাজা হৈছে ত্রিপুরাতে।
তা সবার কিবা কীর্ত্তি কহত আমাতে॥
সিদ্ধান্ত বাগীশ কহে কর অবধান।
যাহা দেখি শুনিয়াছি বলিব আখ্যান॥

তৃতীয় খণ্ডের উপসংহারে আছে—

ত্রিপুরের বংশে যত পূর্ব্ব রাজাগণ।
কল্যাণ মাণিক্যাবধি হৈল সমাপণ॥
রাম মাণিক্য রাজা শুনিল তখন।
সিদ্ধান্ত বাগীশ কহে করি সমাপন॥

তারপর সমাপ্তিশ্লোক—"ইতি রাজমালায়াং তৃতীয় খণ্ডে রামমাণিক্য জিজ্ঞাসা কথনং সিদ্ধান্ত বাগীশ প্রত্যুত্তরং সমাপ্তং।"

এতে স্পষ্টই দেখা যায় গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র রামমাণিক্যের আদেশে প্রাচীন দ্বারপণ্ডিত সিদ্ধান্ত বাগীশ দ্বারা এই খণ্ড রচিত হয়। অথচ লোক প্রচলিত প্রবাদ অন্যরকম। তা ছাড়া আরেকটা

ব্যাপারে মনে খটকা লাগে। রাজমালা প্রথম খণ্ড ধর্মমাণিক্যের আদেশে রচিত। তা'তে তাঁর পূর্ববর্তী রাজা মহামাণিক্যের বিবরণ পর্যন্ত লেখা আছে। দ্বিতীয় খণ্ড অমরমাণিক্যের আদেশে রচিত। তা'তে আছে তাঁর পূর্ববর্তী রাজা জয়মাণিক্যের বিবরণ পর্যন্ত। তৃতীয় খণ্ডে গোবিন্দমাণিক্যের পূর্ববর্তী রাজা কল্যাণমাণিক্য পর্যন্ত বিবরণ দেওয়া আছে। যদি রামমাণিক্যের আদেশে আলোচ্য খণ্ড রচিত হ'ত তা হ'লে নিশ্চয়ই তাঁর পিতা গোবিন্দমাণিক্যের বিবরণ থাকত।

এ সমস্ত আলোচনা ক'রে কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত সিদ্ধান্ত করেছেন, মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের সময় তৃতীয় খণ্ড রচনা আরম্ভ হয় আর শেষ হয় রামমাণিক্যের সময়। প্রস্তাবনার অংশ বোধহয় গ্রন্থ সমাপ্তির সময়ে লেখা। তাই তার মধ্যে রাম মাণিক্যের নাম আছে, গোবিন্দ মাণিক্যের নাম নেই।

রচয়িতার পরিচয়—রাজমালায় শুধু আছে প্রাচীন দ্বার পণ্ডিত সিদ্ধান্ত বাগীশ এই খণ্ড রচনা করেন। কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত তাঁর পরিচয় সংগ্রহ করেছেন। তাঁর নাম ছিল গঙ্গাধর সিদ্ধান্ত বাগীশ। তাঁর পূর্বপুরুষ রাঢ় দেশ নিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা রঘুনাথ বাচস্পতি কল্যাণমাণিক্যের সময়ে বা তার ও আগে ত্রিপুরায় আগমন করেন। গঙ্গাধর কল্যাণমাণিক্যের দ্বারপণ্ডিত ও রাজপুরোহিত ছিলেন। গোবিন্দমাণিক্যকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করবার সময় সিদ্ধান্ত বাগীশ রাজদরবারে উপস্থিত ছিলেন।—

পাত্রমিত্র সম্বোধিয়া আদেশে রাজন।
যুবরাজ করিতে গোবিন্দ নারায়ণ॥
লগ্নাচার্য্য সহিতে যে সিদ্ধান্ত বাগীশ।
শুভদিন করিলেন চাহিয়া জ্যোতিষ॥

তুলাপুরুষ দানের সময় কল্যাণমাণিক্য তিনটি হাতি ও পাঁচটি ঘোড়া দান করেন। এ সময় গঙ্গাধরও একটি হাতি গ্রহণ করেন। রাজমালায় আছে—

তুলা হতে নামিয়া উৎসর্গে সেইক্ষণ।
তিন হস্তী পঞ্চ ঘোড়া দান বিতরণ॥
সিদ্ধান্ত বাগীশ ভট্টাচার্য শিরোমণি।
বস্ত্র অলঙ্কার তাকে দিলেন তখনি॥
হস্তী এক দিল তাকে সসজ্জ করিয়া।
মেহেরকুলে গ্রাম এক দিল উৎসর্গিয়া॥

এই হাতি গ্রহণ ক'রে সিদ্ধান্ত বাগীশ সমাজে পতিত হ'ন। এই সামাজিক নিন্দার হাত থেকে তাঁর বংশধরেরাও নিস্তার পান নি।

এই সিদ্ধান্ত বাগীশই তৃতীয় খণ্ড রাজমালার রচয়িতা। মহারাজ রামদেবমাণিক্যের সময়ে এ গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। রামদেবমাণিক্য খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করেন। কাজেই এ-গ্রন্থ আড়াইশ বছর আগের লেখা।

অমরমাণিক্য—এই খণ্ডে অমরমাণিক্য থেকে কল্যাণমাণিক পর্যন্ত চারজন রাজার বিবরণ দেওয়া আছে। অমর মাণিক্য একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। উদয়পুরের অমর সাগর তাঁরই কীর্তি। এই অমর সাগর খননের সময় তাঁর অধীনস্থ জমিদারদের কেউ পাঁচশ, কেউ সাতশ, কেউবা এক হাজার করে লোক পাঠান। কিন্তু তরপের শাসনকর্তা কোন লোক পাঠান নি। এতে রুষ্ট হয়ে অমরমাণিক্য কুমার রাজধরকে তাঁর বিরুদ্ধে পাঠান। তরপর জমিদার শ্রীহট্টের শাসনকর্তা ফতে খাঁর শরণাপন্ন হ'লেন। তখন অমরমাণিক্য নিজেই যুদ্ধযাত্রা করেন এবং ফতে খাঁকে বন্দী ক'রে ত্রিপুরায় আনা হয়। অমরমাণিক্য ফতে খাঁকে রাজোচিত সমাদর করে তাঁর মুক্তিদান করেন।

ইশা খাঁ—অমরমাণিক্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন ইশা খাঁ। তিনি একজন বীরপুরুষ ছিলেন। এ সময় বাঙলার শাসনকর্তা ইসলাম খাঁ ত্রিপুরায় অভিযান করেন। ইশাখাঁর ওপর এ-যুদ্ধের ভার পড়ল। সরাইলের কাছে ইশা খাঁর সঙ্গে নবাব সৈন্যের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে

ত্রিপুরার জয় হ'ল। মহারাজ খুশি হয়ে ইশা খাঁকে রাজসম্মানে ভূষিত করলেন।

অমরমাণিক্যের জীবনের শেষার্ধ অশান্তিময়। তিনি একবার পীড়িত হয়ে পড়েন আর কুমারদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে দ্বন্দ্ব বেঁধে গেল। রাজধর দূরাঞ্চলে ছিলেন, তিনি পিতার অসুখের খবর শুনেই সিংহাসন দখল করবার জন্য ছুটে এলেন। কনিষ্ঠ কুমার যুঝার সিংহ রাজধানীতেই ছিলেন, তিনিও তলোয়ার খুলে রুখে দাঁড়ালেন। বাধ্য হয়ে পীড়িত রাজা শয্যায় উঠে বসলেন এবং সেনাপতি ইশাখাঁর সাহায্যে ভ্রাতৃবিরোধ নিবারণ করলেন। অসুস্থ শরীর নিয়েই তিনি সিংহাসনে ব'সে রাজ্যচালনা করতে লাগলেন। এতে ভ্রাতৃবিরোধ সাময়িকভাবে প্রশমিত হ'ল বটে, কিন্তু যে বিষের অঙ্কুর তাঁদের মনে জেগে উঠল তা-ই একদিন আরাকান যুদ্ধে ত্রিপুরার সর্বনাশ সাধন করল। অমরমাণিক্যের অসুখের বিবরণ রাজমালায় আছে—

মহাকষ্ট পায় রাজা জীবন সংশয়।
বৈদ্যের চিকিৎসায় রাজা ভাল নাহি হয়॥
রোগের আঘাত রাজার কষ্ট বড় হৈল।
সিংহাসনে বসিবার রাজধর আসিল॥
হস্তী ঘোড়া সাজাইয়া সর্ব্ব সৈন্য লৈয়া।
যুঝার সিংহ বলে তাতে নৃপ সম্বোধিয়া॥
খড়্গ হস্তে করি যুঝার বলিলেক রোষে।
পিতা মৃত্যু নহে ভাই রাজা হইতে আসে॥
রাজার নিকটে এক গৃহের স্তম্ভ বড়।
ক্রোধে খড়্গাঘাতে যুঝার তাহাতেই দড়॥
সেই আঘাতে স্তম্ভ কাটা গেল চতুর্থাংশ।
শব্দ গেল নৃপকর্ণে যেন বাজে কাংশ॥
তাহা দেখি নরপতি বিস্ময় হইল।

দুই ভাই হবে বিরোধ তখনে জানিল ॥
এ বলিয়া নরপতি বিবেক জন্মিয়া ।
উঠিয়া বসিল রাজা সিংহাসনে গিয়া ॥
তার পরে রাজধর ফিরি যায় ঘরে ।
বিবেক জন্মিল রাজার মৃত্যু ইচ্ছা করে ॥

এমন সময় আরাকান পতি চট্টগ্রাম আক্রমণ করলেন। পর্তুগীজেরা ওই অঞ্চলে বাণিজ্য করত। তারাও মগরাজের সঙ্গে যোগ দিল। সমুদ্র থেকে কর্ণফুলি পর্যন্ত পর্তুগীজ নৌবহর সজ্জিত হ'ল। এদের সঙ্গে ছিল উৎকৃষ্ট আগ্নেয়াস্ত্র। অমরমাণিক্য সংবাদ পেয়ে রাজধরকে প্রধান সেনাপতি করলেন আর কুমার অমরদুর্লভ ও যুঝারকেও তাঁর অধীনে পাঠালেন। ভাইদের মধ্যে মনের মিল ছিল না। তাঁরা প্রত্যেকে নিজের বাহাদুরি দেখাতে লাগলেন। তার ফলে সহজেই ত্রিপুর সৈন্যের পরাজয় ঘটল।

ত্রিপুর সৈন্য কর্ণফুলি নদীর ওপর সেতু নির্মাণ ক'রে নদী পার হ'ল। তারপর প্রবল বিক্রমে মগদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। মগরা পিছু হঠতে লাগল। রাম্বু, দেয়াঙ্গ প্রভৃতি স্থান জয় হ'য়ে গেল। এদিকে কৌশলে পশ্চাদপসরণ ক'রে মগ ও পর্তুগীজ সৈন্য ত্রিপুর সৈন্যদের ঘিরে ফেলল। জয়োল্লাসে মত্ত ত্রিপুর বাহিনী হঠাৎ দেখল যে তারা বেড়াজালে আটকা পড়েছে। তাদের রসদ আসবার পথ বন্ধ হ'য়ে গেল। অনশনে অর্ধাশনে তাদের প্রাণ বেরিয়ে যাবার যোগাড়। এমন সময় মগ সৈন্য তাদের তাড়া করল। অনেকেই যুদ্ধে প্রাণ দিল, বাকি যারা ছিল তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে সাঁতরে নদী পার হ'ল।—

চাটিগ্রামে গিয়া সৈন্য শীঘ্র উত্তরিল।
কর্ণফুলি বান্ধ দিয়া সৈন্য পার হৈল ॥
রাম্বু আদি করি রাজ্য ছয় থানা লয়।
দেয়াঙ্গ উড়িয়া রাজ্য লইতে আশয় ॥

* * * *

ত্রিপুরার সৈন্য দেখি মঘে বাসে ভয়।
ফেরাঙ্গির সৈন্য সঙ্গে মঘেতে মিলয়॥
ফেরাঙ্গিয়ে রাজধানা ছাড়ে সেই ক্ষণ।
মঘে আসি সর্ব্ব থানা লইল তখন॥
চারিদিগে রসদ বন্ধ করে মঘগণ।
ত্রিপুরার সৈন্যে রসদ না পায় তখন॥
ত্রিপুরার সৈন্য সব রহিতে না পারে।
ভঙ্গ দিল ত্রিপুর সৈন্য সমর মাঝারে॥

পরদিন সকালে আবার যুদ্ধ বাঁধল। ত্রিপুর সৈন্য গিরিপথের ঝোঁপে ঝাঁপে লুকিয়ে ছিল, মগেরা পাহাড় থেকে নামতেই তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই অতর্কিত আক্রমণে দিশাহারা হ'য়ে মগেরা প্রাণভয়ে পালাতে লাগল। কুমার অমর দুর্লভ তাঁর সেনাদল নিয়ে তাদের পেছনে ছুটলেন। দুজন মাত্র সওয়ার সাথে নিয়ে অমর দুর্লভ রাইপুর পর্যন্ত মগদের পিছু ধাওয়া করলেন।—

ভঙ্গ দিল মঘ সৈন্য দেশ উদ্দেশিয়া।
অমর দুর্ল্লভ পাছে ধাবমানে গিয়া॥
প্রতাপ নারায়ণ অমর দুর্ল্লভ সঙ্গে।
সুর রাষ্ট্র নারায়ণ তিন যায় রঙ্গে॥
অমর দুর্ল্লভ মিত্র প্রতাপ নারায়ণ।
ঘোটকেতে চড়ি মঘের পশ্চাতে গমন॥

এদিকে দুপুর গড়িয়ে যেতে লাগল, সূর্য অস্ত যায় যায়। তবু অমর দুর্লভের কোন খবর নেই। রাজধর ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন। সৈন্যেরা এগিয়ে গিয়ে খোঁজ করতে লাগল। অমর দুর্লভ মারা পড়েছেন মনে করে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে অমরের ছিন্নশির খুঁজে বেড়াতে লাগল। সন্ধ্যা হ'য়ে এল। এমন সময় আধো অন্ধকারে দেখা গেল তিনজন অশ্বারোহী শিবিরের দিকে আসছে। কাছে আসতেই তাদের

চেনা গেল। রক্তরঞ্জিত তলোয়ার হাতে অমর দুর্লভ ঘোড়া থেকে নামলেন আর রাজধর এগিয়ে এসে তাঁকে গ্রহণ করলেন।—

মঘ সৈন্য পাছে পাছে রাইপুর গিছে।
দিবাকর অস্ত যায় অল্প বেলা আছে॥
তুই শোয়ার গেল অমর দুর্ল্লভ সনে।
দিবাকর অস্ত যায় না আসিল কেনে॥
চিন্তাযুক্ত হইল রাজধর নারায়ণ।
আগু বাড়ি চাহে গিয়া সর্ব্ব সৈন্যগণ॥
মুণ্ড সব বিচারিয়া চাহে রণ মাঝে।
ত্রিপুর মুণ্ড নাহি দেখে যুদ্ধের সমাজে॥

*   *   *   *

সন্ধ্যাকালে দেখে শোয়ার আসে তিনজন।
রক্তেতে ভূষিত অঙ্গ না চিনে তখন॥
দূর থাকে সৈন্য সবে ডাকিয়া জিজ্ঞাসে।
কুশলে আসিল তারা বলিল বিশেষে॥
রাজধর নারায়ণ আগুবারি নিল।
তুষ্ট হইয়া সর্ব্ব সৈন্যে শিবিরেতে গেল॥

এই পরাজয়ের পর মহারাজ এক বছরের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখবার আবেদন জানালেন। সাময়িক সন্ধির প্রার্থনা করে উড়িয়া রাজা নামে দূতকে পাঠালেন রাজধরের কাছে।—

মঘ পরাজয় শুনি মগধ রাজায়।
উড়িয়া রাজা নামে দূত তখনে পাঠায়॥
দূতে আসি কহিলেক রাজধর স্থানে।
সম্মুখ বৎসরে যুদ্ধ হবে তোমা সনে॥
এই তত্ত্ব রাজস্থানে লিখে রাজধর।
সম্মুখ বৎসরে যুদ্ধ হবে পরস্পর॥

অমর মাণিক্য রাজা এই পত্র পাইয়া।
তাহার উত্তর পত্র পাঠায় লিখিয়া॥
যে সব লিখিছ তুমি এই তত্ত্ব সার।
দুর্গোৎসব নিকট হইল আইস পুনর্ব্বার॥

* * * *

নৃপতির এই পত্র শীঘ্রগতি পায়।
রাজধর নারায়ণ আসিল ত্বরায়॥

কুমারেরা রাজধানীতে ফিরে এলেন, দুর্গোৎসব শেষ হ'য়ে গেল। এ সময় রাজ্যে নানারকম অমঙ্গল চিহ্ন দেখা যেতে লাগল ব'লে রাজমালায় উল্লেখ আছে। কি এক অজানা আশঙ্কায় সকলের বুক কেঁপে উঠল। এমন সময় খবর এল মগরাজ সন্ধি ভঙ্গ ক'রে চট্টগ্রাম অধিকার করেছেন। খবর পেয়েই ত্রিপুর সৈন্য যুদ্ধ যাত্রা করল। রাজধর, অমর দুর্লভ ও যুঝার সিংহ তাদের অধিনায়ক হলেন। প্রধান সেনাপতি হলেন রাজধর, আর দু'ভাই তাঁর অধীনে রইলেন।

তখন মগরাজ আরেক কৌশল করলেন। কুমারদের মনোমালিন্যের খবর তাঁর অজানা ছিল না। এবার তিনি তাঁদের মধ্যে ভাল করে ঝগড়া বাঁধাবার জন্য একটি হাতির দাঁতের মুকুট আর সন্ধিপত্র পাঠিয়ে দিলেন কুমারদের কাছে। দূতকে বলে দিলেন সে যেন ত্রিপুর সৈন্যের পরিমাণ জেনে আসে। দূতের হাতে রাজমুকুট দেখে কুমারদের মধ্যে কাড়াকাড়ি প'ড়ে গেল। এই সুযোগে মগদূত সারা শিবির ঘুরে সৈন্য সংখ্যা জেনে নিয়ে বিদায় হ'ল।—

যুদ্ধস্থানে রাজসৈন্য গড় বান্ধি আছে।
সৈন্য সনে রাজধর সাবহিতে পাছে॥
শুনিয়া সেকেন্দার সা বলিল দূতেরে।
অতিশীঘ্র দূত যাও রাজ সৈন্য তরে॥
রাজপুত্র যুদ্ধে আইল দেখিব বিশেষ।
হস্তীদন্ত টোপ নেহ আমার সন্দেশ॥

সৈন্য চর্চ্চিবা তুমি কতেক আসিল।
এ বলিয়া পত্র সমে দূত পাঠাইল॥
দন্ত টোপ পত্র সমে আসিলেক দূত।
রাজ সৈন্যে দূতে আসি দেখে অদ্ভুত॥
তিন ভাই বসিয়াছে রাজপুত্র গণ।
অসংখ্য রাজার সৈন্য না যায় গণন॥
অশ্ব গজ বহুতর সৈন্য স্থানে স্থান।
সেই কালে দূত গেল সভা বিদ্যমান॥
পত্র টোপ দিয়া দূত কহিল সম্বাদ।
টোপ নিতে তিন ভাইয়ের ইচ্ছানুবাদ॥
রাজধরে লইল টোপনা পত্র আর ভাই।
যুঝার সিংহ উন্ম হইল টোপ নাহি পাই॥
যুঝার সিংহ বলিলেক মনের যে রোষে।
শৃগালের মতে মঘ মারিব বিশেষে॥
সহস্রেক দন্ত টোপ পাইব আহার।
দূতকে বলিয়া দিল এমত প্রকার।

মগরাজের মুকুট নিয়ে ত্রিপুরার কুমারদের মধ্যে বিবাদ ও তার পরিণাম নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার 'মুকুট' বইটি লিখেছেন।

দূতের মুখে ত্রিপুর সৈন্যের পরিমাণ জেনে নিয়ে মগরাজ অতর্কিতে তাদের আক্রমণ করলেন। ত্রিপুর সেনাপতিদের যখন চেতনা হল তখন মগ সৈন্য একেবারে কাছে। যুঝার সিংহ খবর শুনে বীর দর্পে যুদ্ধযাত্রা করলেন। মন্ত্রী সেনাপতি সবাই তাঁকে নিষেধ করলেন কিন্তু যুঝার সিংহ শোনবার পাত্র নন। তাঁর মাতুল ছত্র নাজির যখন তাঁকে বোঝাতে গেলেন তখন যুঝার উত্তর দিলেন ছত্রনাজির যেন শাঁখা ও শাড়ি প'রে ঘরে চলে যায়।—

ছত্র নাজির যুঝার সিংহের মাতুল।
মন্ত্রী সবে যুঝারকে বুঝায় অতুল॥

যুঝার কহে মাতুল তুমি যুদ্ধে ভয় পাও।
মাতুলানীর বস্ত্র পরি ঘরে তুমি যাও॥
ক্ষত্রি বংশে জন্মিয়াছ মরিতে বাস ভয়।
শঙ্খ বস্ত্র পরি ঘরে যাও এ সময়।

মগরাজের মুকুট দেখে যে-লোভ জেগে উঠেছিল যুঝারের মনে তাই তাকে উন্মাদের মত নিয়ে চলল সমরক্ষেত্রে। তিনি মগতুর্গ জয় করবার জন্য ছুটে চললেন। মগেরা তখন ত্রিশ হাজার বন্দুক থেকে গুলিবর্ষণ করতে লাগল।

যুঝার রাজধরের জয়মঙ্গল হাতিতে চ'ড়ে যাচ্ছিলেন। যখন হাতিতে চড়তে যাবেন এমন সময় গুলি খেয়ে হাতি নড়ে উঠল আর যুঝার হাওদা থেকে নিচে প'ড়ে গেলেন। তখনই হাতির পায়ের চাপে তাঁর দেহ পিষ্ট হয়ে গেল। রাজধর পেছনে ছিলেন। হঠাৎ একটা বর্শা এসে তাঁর শরীরে বিদ্ধ হ'ল। প্রচুর রক্তপাতে তিনি অবসন্ন হ'য়ে পড়লেন। তবু কপালে রাজযোগ থাকার দরুণই বোধ হয় বেঁচে রইলেন।

গোল্লাঘাতে হস্তীর ক্রোধ বাড়িয়াছে।
যুঝারে চড়িতে হস্তী উঠিলেক রোষে॥
হস্তীর দড়িতে ধরি রহিল যুঝার।
লটকিয়া রৈল হস্তী পদের মাঝার॥
মারিল হস্তীয়ে লাথি বুকের উপর।
সেই ঘাতে পড়ে বীর পথের অন্তর॥
সেই পথে সেই গজ ভয়ে ভঙ্গ দিল।
হস্তীপদ বুকে ঠেকি যুঝার মরিল॥
ভাই বলে রাজধরে ডাকে বারে বারে।
অঙ্কুশ না মানে হস্তী কি করিতে পারে॥
পথের উপর উচ্চে মঘসৈন্য ছিল।
হস্তী' পরে রাজধরকে সেলেতে হানিল॥

উরুতে লাগিয়া হানা পিছলিয়া যায়।
পেটেতে লাগিয়া হানা রক্ত বহে তায়॥
রাজা হইবার তরে আছিল কপাল।
এই মর্ম্মাঘাতে সেই বাঁচিল যে কাল॥

এবার তিনজন সেনাপতিদের মধ্যে একজন নিহত আরেকজন আহত হলেন। একা অমর দুর্লভ মগদের রুখতে পারলেন না। ত্রিপুরার শোচনীয় পরাজয় ঘটল।

এরপর অমরমাণিক্য নিজে একবার শেষ চেষ্টা করলেন। কিন্তু ত্রিপুরার অধিকাংশ সৈন্যই ইতিমধ্যে মারা পড়েছে। মুষ্টিমেয় যারা বাকি ছিল তারা মগদের অগণিত সৈন্য সমুদ্রে হারিয়ে গেল। রণে ভঙ্গ দিয়ে মহারাজ ভগ্ন হৃদয়ে উদয়পুরে ফিরে এলেন।

এদিকে মগরাজ উদয়পুর অধিকার করতে আসছেন। খবর শুনে অমরমাণিক্য ডোমঘাটের পথে অরণ্যে প্রবেশ করলেন। অনেক অনুগত প্রজা তাঁর অনুসরণ করল।

মগরাজ উদয়পুরে এসে লুটপাট করলেন। তারপর, কুড়ামঘী নামে এক সর্দারকে উদয়পুরে স্থাপন করলেন। অনেক মগসৈন্যও এখানে রয়ে গেল। রাজমালায় আছে, পনর শ দশ শকের চৈত্র মাসে মগসৈন্য প্রথম উদয়পুরে আসে।—

পনরশ দশ শকে চৈত্র মাস তাতে।
প্রথমে আসিলা মঘ উদয় পুরেতে॥

এ সময় অমরমাণিক্যের উদারতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ পাওয়া যায়। আদম সাহা নামে আরাকানের এক সামন্ত রাজা ছিলেন। মগরাজ সেকেন্দার সাহার সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি অমরমাণিক্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এবার মগরাজ জানালেন আদম সাহাকে যদি ফিরিয়ে দেওয়া হয় তবে অমর মাণিক্যের সঙ্গে তাঁর সন্ধি হ'বে। দারুণ দুর্ভাগ্যের দিনেও অমর

মাণিক্য রাজধর্ম বিস্মৃত হন নি। তিনি সোজা উত্তর দিলেন তাঁর যা সর্বনাশ হ'বার তা-ই হয়েছে, তবু তিনি আশ্রিতকে ত্যাগ করবেন না।

মঘরাজা সেকান্দর রসাঙ্গেতে গেল।
অমর মাণিক্য স্থানে পত্রি যে লিখিল॥
আদম সাহাকে রাজা পাঠাও ত্বরিত।
তবে তোমা সঙ্গে আমা হবে বহু প্রীত॥
সেকান্দর সাহা স্থানে নৃপে লিখে পুনি।
শরণাগত আদম সাহা না দিব কখনি॥
ক্ষত্রিয় বংশেতে জন্ম হইছে আমার।
তুমি মঘ কি জানিবা আমা ব্যবহার॥
দৈবযোগে এক পুত্র যুদ্ধেতে মরিছে।
আর দুই পুত্র আমা প্রধান যে আছে॥
তাহা দুই তোমা যুদ্ধে মরে কদাচিত।
তথাপি আদম আমি না দিব নিশ্চিত॥
রাজার নিষ্ঠুর বাণী শুনি মঘ দূতে।
সেইক্ষণে গেল দূত রসাঙ্গ ত্বরিতে॥

অমরমাণিক্যের শেষ জীবন বেদনাময়। উদয়পুরের হৃতগৌরবের কাহিনী স্মরণ ক'রে অরণ্যচারী রাজা ব্যাকুল হ'য়ে উঠতেন। তাঁর আর জীবনের ইচ্ছা ছিল না। একদিন আষাঢ় মাসে মহারানীর সঙ্গে আলাপ ক'রে তিনি রাজধরের অভিষেকের আয়োজন করলেন। তারপর নৌকাবিহারের ছল করে বিচিত্র নৌবাহিনী সাজিয়ে তিনি মনুনদীতে যাত্রা করলেন। এ সময় আফিং খেয়ে তিনি দেহত্যাগ করেন।—

আষাঢ় মাসের বৃষ্টি নদী পূর্ণ অতি।
নৌকা খেলিতে ফাকী বলিল নৃপতি॥
সাজাইয়া অনেক নৌকা রাজার সাক্ষাত।
নানা বাদ্য সুললিত বাজিলেক তাত।

চতুর্দোলে চড়ি রাজা নৌকাতে গমন।
বাদ্য তালে নৌকা চলে হরষিত মন।

* * * *

গোপনে নিয়াছে রাজা আফিঙ্গ তখন।
সেই স্থানে নৃপ করে আফিঙ্গ ভক্ষণ॥

রাজধরমাণিক্য—অমরমাণিক্যের মৃত্যুর পর রাজধরমাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। উদয়পুর আরাকান অধিকারভুক্ত হ'লেও রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে মগরাজের অধিকার বিস্তৃত হয়নি। সেখানে মনুনদীর তীরে রাজপাট স্থাপন করেছিলেন অমরমাণিক্য। রাজধর-ও এখানেই রাজা হ'লেন। কিন্তু, উদয়পুরের স্মৃতি ভোলবার নয়। রাজধর উদয়পুর পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতে লাগলেন। এমন সময় মগেরা উদয়পুর ছেড়ে চ'লে গেল। এই সুযোগে রাজধর আবার রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত হ'লেন।

রাজধর বীরপুরুষ ছিলেন। কিন্তু সিংহাসনে ব'সেই তিনি পরম ধার্মিক হ'য়ে উঠলেন। খুব সম্ভব পিতার ভাগ্যবিপর্যয় তাঁকে সংসারের প্রতি বিমুখ ক'রে তুলেছিল। যুদ্ধবিগ্রহের পরিবর্তে দেবসেবা ও হরিনামকীর্তনেই তাঁর সময় কাটতে লাগল। অবশেষে একদিন জলে ডুবে তাঁর মৃত্যু হয়।

যশোধরমাণিক্য—রাজধরের পর তাঁর পুত্র যশোধরমাণিক্য রাজা হ'ন। তিনি জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক। বিজয়মাণিক্যের সময়েই দিল্লীর দরবারে ত্রিপুরার খ্যাতি ছিল। এখানকার হস্তিবলের লোভে জাহাঙ্গীর সুদূর ত্রিপুরায় অভিযান পাঠালেন। নবাব ফতে জঙ্গ দিল্লী থেকে বিপুল বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। যশোধর মাণিক্যও যথাশক্তি যুদ্ধের আয়োজন করলেন। কিন্তু মোগলের বিপুল বাহিনীর সঙ্গে ক্ষুদ্র ত্রিপুরার সৈন্যেরা আঁটতে পারল না, তাদের পরাজয় ঘটল। যশোধরমাণিক্যকে বন্দী ক'রে দিল্লীতে পাঠানো হ'ল। জাহাঙ্গীর তাঁকে সৌজন্য ও সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন আর

জানালেন ত্রিপুরার হস্তিবল বাদশাকে অর্পণ করলেই তিনি রাজ্য ফিরে পাবেন। যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে যশোধরের মনে এত ব্যথা লেগেছিল যে তিনি আর রাজ্যে ফিরে আসতে চাইলেন না। শেষ জীবনটা তীর্থে কাটা বার সংকল্প ব্যক্ত করলেন। বাদশা তাকে তখনি মুক্তি দিলেন—

বাদসাহা সিলিম নাম দিল্লীর ঈশ্বর।
নৃপতিকে সমাদর করে বহুতর॥
নৃপতিকে সম্বোধিয়া কহিলেন সাহা।
তোমার সমীপে হস্তী আছিলেক যাহা॥
তোমার যে ধন রত্ন সৈন্য বহুতর।
রাজ্যে যাইয়া আমা স্থানে পাঠাও সত্বর।
বাদসার অনুমতি শুনি যশোধর।
প্রণমিয়া বাদসাকে দিলেন উত্তর॥
আমা ধন জন রত্ন সকল তোমার।
তোমার সৈন্যেতে রাজ্য লুটিছে আমার॥
কিবা অপরাধ আমা হয় তোমা স্থান।
রাজ্যে না যাইব আমি পাইয়া অপমান॥
আমার শেষ কাল হইল এখন।
রাজ্যে যাইয়া কি করিব নাহি রত্ন ধন।
তীর্থাশ্রমে যাই আমি দেহ অনুমতি।
তীর্থবাস করি আমি পাই অব্যাহতি॥
রাজার বচন শুনি দিল্লীর ঈশ্বর।
নৃপতিকে বিদায় যে দিলেন সত্বর॥
বাদসার অনুমতি পাইয়া রাজন।
কাশীবাসে গেল রাজা লইয়া পরিজন॥

কল্যাণমাণিক্য—যশোধর মাণিক্য তীর্থবাস করতে লাগলেন। এদিকে উদয়পুরের ছুর্দিন আবার ঘনিয়ে এল। মোগল সৈন্যেরা রাজধানী অবরোধ করেছিল, তাদের অত্যাচার ক্রমে অসহ্য হয়ে

উঠল। দেবালয়ে দেবপূজা বন্ধ হয়ে গেল, মহামারীতে সোনার উদয়পুর ছারখার হয়ে গেল। লোকেরা যে যেদিকে পারে পালিয়ে গেল। মহামারীর করালমূর্তি দেখে মোগলেরাও ভয়ে পলায়ন করল।

মোগলের পরিত্যক্ত রাজধানীতে আবার ছত্রভঙ্গ সেনাবাহিনী একত্র হ'ল। মন্ত্রী ও সেনাপতিরা মিলে রাজ্যরক্ষার উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। যশোধরমাণিক্য তীর্থবাসী, তাঁর পুত্র বা ভ্রাতা নেই, কা'কে রাজা করা যায়। তখন রাজবংশের অন্যশাখাজাত কল্যাণকে রাজা করা হ'ল।

শুভক্ষণে কল্যাণমাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করলেন। আড়াই বছর ত্রিপুরা অরাজক ছিল। এই আড়াই বছরে উদয়পুর শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। কল্যাণমাণিক্য রাজা হয়েই রাজধানীর সংস্কারে মন দিলেন। তিনি প্রথমেই সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করলেন। তারপর চৌদ্দ দেবতার লুপ্ত গৌরব উদ্ধারে মন দিলেন।

পূর্ব্বাবধি দতুর্দ্দশ দেবতা সংস্থান।
অষ্টধাতুর দেবতা ছিলেন নির্ম্মাণ॥
চতুর্দ্দশ দেবতা মূর্ত্তি গঠায় নৃপতি।
সুবর্ণ রজত তাতে মনোহর অতি॥
দেবের প্রতিষ্ঠা রাজা করে সেইক্ষণ।
পূজে চতুর্দ্দশ দেব হরষিত মন।

একদিন মহারাজ স্বপ্নে দেখলেন কালিকাদেবী তাঁর দেবালয়ের নিচে সরোবর খননের আদেশ দিচ্ছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পরামর্শ নিয়ে শুভদিনে সরোবর খনিত হ'তে লাগল। এরই নাম কল্যাণ সরোবর।—

সেইকালে মহারাজার স্বপ্নেতে আদেশ।
কালিকা দেবীয়ে স্বপ্ন দেখায় বিশেষ॥

আমা সেবা কষ্ট হয় জলের কারণে।
জলাশয় দেও রাজা আমা সন্নিধানে॥

*   *   *   *

হরিষ হইয়া নৃপ কহে সেই ক্ষণ।
পুষ্করণী খনিতে আজ্ঞা কালীর সদন॥
বাস্তু পূজা পরে পুষ্করণীর আরম্ভন।
উদয়পুর কালিকার সমীপে তখন॥
জলাশয় উৎসর্গিল বিধান তৎপর।
পুষ্করণীর নাম রাখে কল্যাণ সাগর॥

ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরের চুড়ো মগেরা ভেঙে ফেলেছিল। মহারাজ তার সংস্কার সাধন করেন। উদয়পুরে যে সব জলাশয় ছিল মগেরা ধনরত্নের লোভে খাল কেটে সেগুলো শুকিয়ে ফেলেছিল। কল্যাণ মাণিক্য সেগুলিরও সংস্কার করেন।

অমর সাগর আদি যত সরোবর।
জান কাটিয়া মঘে শুকায় তদন্তর॥
সেই জান বন্ধ রাজা করিল তৎপর।
নিজালয় নির্ম্মাইল পরম সুন্দর॥

কিন্তু কল্যাণমাণিক্যের রাজ্যের সব চাইতে বড় ঘটনা মোগল বাদশার সঙ্গে যুদ্ধ। ত্রিপুরার হস্তিবলের লোভে যশোধর মাণিক্যের সময়ে ত্রিপুরা আক্রান্ত হয়। আবার দিল্লী থেকে মুর্শিদাবাদের নবাবের কাছে ত্রিপুরার হস্তিবল সংগ্রহের জন্য তাগিদ এল। নবাবের বিশাল সৈন্যবাহিনী ত্রিপুরা প্লাবিত ক'রে ফেলল। নবাবের দূত পত্র নিয়ে মহারাজের কাছে এল। তা'তে নবাব লিখলেন মহারাজ যেন বাদশার নজরানা স্বরূপ এক হাজার হাতি পাঠিয়ে দেন। বলাবাহুল্য মহারাজ এতে রাজি হলেন না। কাজেই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল। কল্যাণমাণিক্য নিজে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। তাঁর পুত্র

গোবিন্দ নারায়ণ ত্রিপুর সৈন্যের অধিনায়ক হলেন। রাজমালায় এর বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে।—

মুর্শিদাবাদের নবাব দুরন্ত প্রকট।
পরওয়ানা লিখিলেক রাজার নিকট॥
কল্যাণ মাণিক্য রাজা ত্রিপুর নৃপতি।
বাদসাহা নজরানা পাঠাইতে হাতী॥

* * *

চর্ম্মের কামান বহু সৈন্যের সহিত।
একাওয়াজে ফাটে কামান শত্রু হয় ভীত॥
কৈলাগড়ে নৃপতির পূর্ব্বাপর থানা।
কমলাসাগর পাড়ে বাদসাই সেনা॥
কল্যাণ মাণিক্য রাজা যুদ্ধ বার্ত্তা পায়।
গোবিন্দ দেব সঙ্গে লৈয়া যুদ্ধে রাজা যায়॥
দুই সৈন্যে ঘোর রণ হৈল সেই ক্ষণ।
কামানের গোলা পরে গড়েতে রাজন॥
সেই গোলা হাতে লৈয়া গোবিন্দ যুবরাজ।
নৃপতিকে দেখাইল সর্ব্ব সভা মাঝ॥
দারুণ কামান গোলা গড়ে আসি পড়ে।
কি মতে করিব যুদ্ধ রণের মাঝারে॥
যুবরাজ বাক্য শুনি নৃপতি কহিল।
বহু যুদ্ধ করিয়াছি ভীত নাহি ছিল॥
কখনে শত্রুর সঙ্গে না করিছি প্রীতি।
শত্রু সঙ্গে কর প্রীতি যেই তোমা মতি॥
তোমা মনে যাহা লয় তাহা কর তুমি।
আজি হতে অস্ত্র ত্যাগ করিলাম আমি।

এই ব'লে কল্যাণমাণিক্য গুরুর পায়ে অস্ত্র সমর্পণ করলেন। গোবিন্দ দেখলেন সম্মুখ যুদ্ধে এই কামানের সামনে যাওয়া অসম্ভব।

তখন তিনি মনে মনে এক কৌশল করলেন। শত্রুপক্ষকে বোঝান হ'ল যেন ত্রিপুর সৈন্য যুদ্ধ থেকে হঠে গেছে। তারপর গভীর রাত্রে তিনি মোগল শিবির আক্রমণ করলেন। এই অতর্কিত আক্রমণে মোগলেরা দিশাহারা হ'য়ে গেল। অনেক মারা পড়ল। যারা বাঁচল তারা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল। বিশাল মোগলবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষুদ্র ত্রিপুরার জয় হ'ল।

এর অল্পদিন পরেই গোবিন্দনারায়ণকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করা হ'ল। তারপর কল্যাণমাণিক্য ধর্মকর্মে মন দিলেন। প্রথমে তিনি তুলাপুরুষ দান করলেন।—

ধর্ম্মের যে অংশ রাজা ধর্ম্মপরায়ণ।
প্রথমে করিল তুলাপুরুষ আপন॥
যজ্ঞ হোম করিলেক ব্রাহ্মণের গণে।
তুলাতে বসিল রাজা ধর্ম্মের আসনে॥
অলঙ্কার বস্ত্র সমে তুলাতে বসিল।
আর দিগে ধন রত্ন পরিমিত দিল॥
তুলা হতে নামিয়া উৎসর্গে সেই ক্ষণ।
তিন হস্তী পঞ্চ ঘোড়া দান বিতরণ॥
সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য শিরোমণি।
বস্ত্র অলঙ্কার তাকে দিলেক তখনি॥
হস্তী এক দিল তাকে সসজ্জ করিয়া।
মেহেরকুলে গ্রাম এক দিল উৎসর্গিয়া॥
তুলাপুরুষ কীর্ত্তি হইল বিস্তর।
সেই কীর্ত্তি গেল রাজার দেশদেশান্তর॥

তারপর তিনি 'মহাদান' করেন,—

মহাদান পরে করে যথাবিধি মতে।
সবৎসা কপিলাধেনু উৎসর্গিলা তাতে॥

বানারসি মথুরা আর সেতুবন্ধ দেশ।
উড়িষ্যা আদি যত দ্বিজ আসিলেক শেষ॥
কেহ হস্তী কেহ ঘোড়া সুবর্ণাদি দান।
দ্বিজ সব সন্তর্পিল যেমত বিধান॥

উদয়মাণিক্যের প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রগোপীনাথের মূর্তি অমরমাণিক্যের সময়ে মগেরা নিয়ে গিয়েছিল। তিনি চট্টগ্রাম থেকে সেই মূর্তি উদ্ধার করে এক মঠে স্থাপন করেন। সেই মঠের বাঁ দিকে ধর্মমঠ নামে আরেকটি মঠ নির্মাণ করেন। তারপর বিষ্ণুমন্দির, দোলমঞ্চ ও দুর্গাগৃহ নির্মাণ করেন। তাঁর পুণ্যকীর্তির ধ্বংসাবশেষ এখনো উদয়পুরে দেখা যায়।

সিংহদ্বার সমীপেতে মনোরম স্থান।
ইষ্টক পাষাণে মঠ করিছে নির্ম্মাণ॥
চন্দ্রগোপীনাথ মূর্ত্তি চাটিগ্রামে ছিল।
অমরমাণিক্য কালে মঘে নিয়াছিল॥
সেই দেব চট্টল হৈতে আনিয়া তখন।
সেই মঠে স্থাপে বিষ্ণু করিয়া অর্চ্চন॥
সেই মঠ বাম পাশে আর মঠ দিয়া।
উৎসর্গ করিল রাজা ধর্ম্ম উদ্দেশিয়া॥
ধর্ম্মমঠ নাম নৃপ রাখিল তাহার।
পনরশ বাহাত্তর শকে মঠের প্রচার॥
শ্লোক এক মঠ দ্বারে লিখিল তখন।
তাহার নিকটে গৃহ জগত মোহন॥
কতেক ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ নিজ রাজ্যে ছিল।
তাহা সবে দিয়া ধন তীর্থ করাইল॥
নিজ পুর সম্মুখেতে ছিল এক স্থান।
বিষ্ণুর আলয় তাতে করয়ে নির্ম্মাণ॥

দোলমঞ্চ নির্ম্মাইল তার পূর্ব্বদিগে।
দুর্গাগৃহ নির্ম্মাইল সন্নিকট ভাগে॥

এভাবে বিবিধ সৎকর্মের অনুষ্ঠান ক'রে মহারাজ কল্যাণমাণিক্য আশি বৎসর বয়সে মারা যান। তিনি মোট সাঁইত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁর বিবরণ দিয়েই রাজমালা—তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত হয়েছে।

রাজমালা—চতুর্থ খণ্ড

গোবিন্দমাণিক্য—রাজমালা—চতুর্থ খণ্ড গোবিন্দমাণিক্যের বিবরণ থেকে আরম্ভ। রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' ও 'বিসর্জন'-এর নায়ক ত্রিপুরার মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের নাম বাঙলা সাহিত্যে বিখ্যাত।

কল্যাণমাণিক্যের পাঁচ পুত্র। প্রথমা মহিষীর গর্ভে গোবিন্দ ও জগন্নাথ, মধ্যমা মহিষীর গর্ভে নক্ষত্ররায় ও কনিষ্ঠা মহিষীর গর্ভে যাদব ও রাজবল্লভের জন্ম হয়। তৃতীয় খণ্ড রাজমালায় আছে—

নৃপের প্রধান পুত্র গোবিন্দনারায়ণ।
তাহার কনিষ্ঠ জগন্নাথ পরায়ণ।
মধ্যমা রাণীর গর্ভে জন্মে আর সুত।
নৌগতর নাম তার শুনিতে অদ্ভুত॥
কনিষ্ঠা রাণীতে জন্মে দুই সহোদর।
যাদব রাজবল্লভ নাম তাহার অন্তর॥

মধ্যমা রাণীর পুত্র নৌগতরই ইতিহাস বিখ্যাত নক্ষত্র রায়। জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দ বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁর বীরত্বে ও কৌশলেই বাদশাহী ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধে ত্রিপুরার জয় হ'ল। খুশি হয়ে কল্যাণমাণিক্য পুত্রকে যুবরাজ করতে মনস্থ করলেন।—

পাত্র-মিত্র সম্বোধিয়া আদেশে রাজন।
যুবরাজ করিতে গোবিন্দনারায়ণ॥
লগ্নাচার্য্য সহিতে যে সিদ্ধান্ত বাগীশ।
শুভদিন করিলেন চাহিয়া জ্যোতিষ॥
শুভক্ষণে উৎসব করিল অতি সাজ।
সেইকালে গোবিন্দদেব হৈল যুবরাজ॥

তারপর যথাকালে কল্যাণমাণিক্যের মৃত্যু হ'ল। যুবরাজ গোবিন্দনারায়ণ মাণিক্য উপাধি ধারণ ক'রে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ

করলেন। এটা ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের কথা। এখান থেকেই রাজমালা চতুর্থ খণ্ডের আরম্ভ। রাজমালায় আছে—

পনরশ বিরাশী শক জ্যৈষ্ঠ মাস তাতে।
ত্রয়োদশ দিন ছিল বুধবার যাতে॥
গোবিন্দমাণিক্য রাজা হইল রাজন।
গুণবতী মহারাণী বিখ্যাত ভুবন॥

গোবিন্দমাণিক্য রাজা হওয়ায় তাঁর বৈমাত্র ভ্রাতা নক্ষত্র রায় খুশি হ'তে পারলেন না। তাঁর মনে রাজ্য লোভ জেগে উঠল। অবশেষে তিনি সক্রিয় হ'য়ে উঠলেন। সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা তখন বাঙলার শাসনকর্তা। তাঁর সাহায্যে শক্তি সংগ্রহ ক'রে নক্ষত্র রায় গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলেন। গোবিন্দমাণিক্য বিষম সমস্যায় পড়লেন। ভ্রাতৃবিরোধ অপেক্ষা রাজ্যত্যাগই তাঁর কাছে শ্রেয় মনে হ'ল। ভ্রাতার ইচ্ছাপূরণের জন্য তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করলেন। পাত্র-মিত্র মন্ত্রী সভাসদ সবাই তাঁকে যুদ্ধ করবার জন্য পীড়াপীড়ি করলে তিনি তাদের নিরস্ত করেন।

গোবিন্দমাণিক্য রাজা বলিল তখন।
ভাই সনে করি যুদ্ধ কিসের কারণ॥
আত্ম কলহ হইলে প্রজা নষ্ট হয়।
পাপেতে হইব স্থিতি বলিল নিশ্চয়॥
রাজত্ব করিল আমি বর্ষ পরিমাণ।
এখনি রাজত্ব জান তাহার বিধান।

এভাবে বিনাযুদ্ধে সিংহাসন ত্যাগ করে গোবিন্দমাণিক্য রাজধানী ছেড়ে চলে গেলেন। তখন তাঁর সঙ্গে মহিষী গুণবতী, যুবরাজ রামদেব, ভ্রাতা জগন্নাথ ও তাঁর দুই পুত্র ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাজর্ষি গ্রন্থে এ-অধ্যায়ের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন।

রাজধানী ত্যাগ করে গোবিন্দমাণিক্য প্রথমে রিয়াং প্রজাদের অতিথি হন। কিন্তু দুর্দিনে সবাই বিরূপ হয়। কিছুদিন যাবার পর

রাণী গুণবতী লক্ষ্য করলেন যেন প্রজাদের আর আগের মত সমাদর নেই। তখন তাঁরা ত্রিপুরা ত্যাগ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা হ'লেন। আরাকান রাজধানীর নিকটবর্তী হ'তেই মগরাজ পরম সমাদরে গোবিন্দমাণিক্যকে গ্রহণ করলেন।

আরাকান রাজের আশ্রয়ে গোবিন্দমাণিক্যের দিন কাটতে লাগল। এমন সময় সাজাহানের পুত্রদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলছিল। আওরঙ্গজেবের কাছে পরাস্ত হ'য়ে সুজা বাঙলাদেশ ছেড়ে পলায়ন করলেন। পলাতক অবস্থায় তিনি একদিন আরাকানে এসে উপস্থিত হ'লেন। সুজা যখন আরাকান দরবারে এসে হাজির হলেন তখন মগরাজ ও গোবিন্দমাণিক্য ব'সে আলাপ করছিলেন। সুজাকে দেখে শিষ্টাচার-পরায়ণ গোবিন্দমাণিক্য আসন ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। তখন মগরাজ তাঁকে বললেন "ম্লেচ্ছ সুজাকে দেখে আপনার আসন ত্যাগের কোন দরকার নেই। আপনি যেমন আছেন তেমনি থাকুন।" মগরাজের এই অপমানসূচক উক্তি শুনে সুজা মরমে ম'রে গেলেন।

দরবার থেকে বেরিয়ে এসে সুজা একান্তে গোবিন্দমাণিক্যকে বললেন "মহারাজ, আপনি আমার মুখ রেখেছেন। আপনি এ সম্মান না দেখালে আজ আমার মর্যাদা কোথায় থাকত।" এই ব'লে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তিনি নিজের হীরার আংটি খুলে গোবিন্দমাণিক্যের হাতে পরিয়ে দিলেন। বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ সুজা তাঁর নিমচা তরবারি-ও গোবিন্দমাণিক্যকে দান করেন। এই তলোয়ারটি এখনো ত্রিপুরার রাজবাড়িতে রক্ষিত আছে।

আরাকান আশ্রয়ে উভয় ভূপতির কোন রকমে দিন কাটতে লাগল। ধর্মপরায়ণ গোবিন্দমাণিক্য নিঃশব্দে অদৃষ্টকে মেনে নিয়ে শান্ত মনে দিন যাপন করতে লাগলেন। কিন্তু সুজা এত সহজে দ'মে যাবার পাত্র নন। তিনি আরেকবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখতে চাইলেন। তিনি মগরাজের এক কন্যাকে বিবাহ করলেন। রাজধানীর

এক প্রান্তে তাঁর বাড়ি তৈরি হ'ল। কিছুদিন রাজকন্যা খুব ঘন ঘন বাপের বাড়ি যাতায়াত করলেন। এমনি আরেক দিন যেন তিনি প্রাসাদে যাত্রা করলেন, সঙ্গে চল্লিশটি পাল্কী। সিংহদ্বারে প্রহরী বাধা দিতে চাইলে জানানো হ'ল রাজকন্যা দাসীগণসহ যাচ্ছেন। তখন তারা পথ ছেড়ে দিল। এমনি ক'রে ছয়টি ফটক পার হ'য়ে যাবার পর শেষ ফটকে প্রহরীদের মনে সন্দেহ জাগল, এত পাল্কী কিসের। তারা পথ রোধ ক'রে দাঁড়াল। পাল্কী বাহকেরা ভয়ে পালিয়ে গেল আর বেরিয়ে এল চল্লিশজন সশস্ত্র মোগল যোদ্ধা। মগসৈন্যেরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের প্রবল চাপে মুষ্টিমেয় মোগল সৈন্যেরা পিষ্ট হ'য়ে গেল।

মগরাজ একথা শুনে ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠলেন। এরকম বিশ্বাসঘাতকের উচিত শাস্তি দেওয়া দরকার। তিনি সুজাকে বন্দী ক'রে আনতে ফৌজ পাঠালেন। কিন্তু কোথায় সুজা ? তিনি বেগম ও কন্যাগণসহ নিশীথ রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত সুজা কোথায় গেলেন ইতিহাস আজো সে-সম্পর্কে নীরব।

ছত্রমাণিক্য—গোবিন্দমাণিক্যের রাজ্য ত্যাগের পর নক্ষত্ররায় ছত্রমাণিক্য নাম ধারণ ক'রে ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সাত বৎসর রাজত্ব করে মারা যান।—

উদয়পুরে নক্ষত্র নৃপ হইল তারপর ॥
ছত্রমাণিক্য রাজা তাহান আখ্যান।
সপ্তবর্ষ রাজত্ব ছিল করি পরিমাণ ॥
উদয়পুরে ছত্রসাগর করিয়া খনন।
বসন্ত হইয়া রাজা হইল মরণ ॥

ছত্রমাণিক্যের মৃত্যু সংবাদ শুনে মগরাজ প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে গোবিন্দমাণিক্যকে স্বদেশে পাঠিয়ে দেন। এদিকে ত্রিপুরার দূতেরা ও তাঁকে আনবার জন্য যাচ্ছিল। সমতলে পৌঁছতেই তাদের সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল। প্রজারা তাঁকে ফিরে চাইছে, একথা শুনে গোবিন্দমাণিক্য

রাজধানীতে উপস্থিত হ'লেন। শুভদিনে তাঁর আবার অভিষেক হ'ল।

এমন সময় পলাতক সুজাকে খুঁজে বের করবার জন্য আওরঙ্গজেবের পক্ষ থেকে দিকে দিকে লোক পাঠানো হয়। আওরঙ্গজেব তখন দিল্লীর সম্রাট। ত্রিপুরার দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে সুজা লুকিয়ে থাকতে পারেন এই ভেবে তিনি গোবিন্দমাণিক্যের কাছে এক পত্র লেখেন। এটি এখনো রাজবাড়িতে রক্ষিত আছে। পত্রটি ফারসীতে লেখা। ভূপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর সংক্ষিপ্ত রাজমালা গ্রন্থে এর বাঙলা অনুবাদ দিয়েছেন। সেখান থেকে এটি তুলে দেওয়া হ'ল—

"অদ্বিতীয় উজ্জ্বলমণি-বংশজ বিষম সমর বিজয়ী পঞ্চ শ্রীযুত মহারাজ গোবিন্দ কিশোর মাণিক্য বাহাদুর—জগদীশ্বর আপনার রাজ্যশাসন অক্ষুন্ন রাখুন। আমরা স্পষ্টরূপে জানিতে পারিলাম যে আমাদের পৈত্রিক শত্রু সুজা গুপ্তভাবে আপনার রাজ্যে অবস্থান করিতেছে। আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ সভ্যতা ও স্বীয় ক্ষমতানুসারে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত বন্ধুতা ও একতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া স্বীয় রাজ্যের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করতেন, পুরাতনকালে আফগানবংশ আমাদের পূর্ব্বপুরুষের মুক্ত কৃপাণ সম্মুখে পলায়ন করতঃ আপনার রাজ্যে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহ পতাকা উড়াইলে, আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্বোক্ত একতা ও বন্ধুতা বলে ঐ হতভাগ্যগণকে পূর্ব্ব-বাঙ্গলা হইতে পুনরায় সম্পুর্ণরূপে বিপদাপন্ন করতঃ স্বদেশ অভিমুখে বিতাড়িত করিয়াছিলেন।

সুতরাং আশা করি বর্ত্তমানে আমাদের লেখা অনুযায়ী উল্লিখিত শত্রুকে বন্দী করিয়া আমাদের রাজ্যে প্রেরণ করিবেন। যদি মহারাজের অনুমতি হয় তবে আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষকে মুঙ্গের জেলাতে উপস্থিত থাকিয়া অপেক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করিব। অতঃপর তাহাকে ধৃত করিলে বিশেষ যত্ন ও সতর্কতা সহকারে আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষের

হাওয়ালা (অর্পন) করিয়া আমাদিগকে সন্তুষ্ট করতঃ পুরাতন ভাবেতা অনুযায়ী বন্ধুতার শৃঙ্খল দৃঢ় করিবেন। নতুবা সম্পূর্ণ বিশ্বাস, যদি সেই অপরিণামদর্শী আপনার রাজ্যে অবস্থান করে তবে নিশ্চয়ই রাজ্যের অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খলা ঘটিবে সন্দেহ নাই। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস এই যে পুরাতন বন্ধুতা অনুযায়ী উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

নিবেদক
আলমগীর সাহ
দিল্লীর সম্রাট।

গোবিন্দমাণিক্য মহামুস্কিলে পড়লেন। সুজা ত্রিপুরায় নেই একথা সম্রাট কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। মিছামিছি আওরঙ্গজেবের কোপদৃষ্টিতে প'ড়ে রাজ্যের অনর্থ ঘটবে। তখন তিনি এক কাজ করলেন। রাজমালার পাঠকমাত্রেই জানেন যশোধরমাণিক্যের সময় থেকে ত্রিপুরার হস্তিবল নিয়ে দিল্লীর বাদশার সঙ্গে বিবাদ চলছিল। গোবিন্দমাণিক্য এ-ব্যাপারে বাদশাকে সন্তুষ্ট করলেন। তিনি এই মর্মে সন্ধি করলেন যে বছরে ত্রিপুরায় যত হাতি ধরা পড়বে বাদশা তার অর্ধেক নজরানা স্বরূপ পাবেন। তবে কখনো পাঁচটি হাতির কম পাবেন না। এভাবে দিল্লীর সঙ্গে ত্রিপুরার প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

গোবিন্দমাণিক্য যথার্থই 'রাজর্ষি' ছিলেন। তিনি অনেক সৎকর্মের অনুষ্ঠান করেন। চট্টগ্রামের চন্দ্রশেখরের মন্দির তাঁর কীর্তি। মন্দিরটি ভূমিকম্পে নষ্ট হয়ে গেছে। রাজমালায় আছে—

চট্টলেতে চন্দ্রশেখর মঠ নিরমিয়া।
দেবার্থেতে মহারাজ জলাশয় দিয়া॥

দুর্দিনের সঙ্গী দুর্ভাগা সুজার স্মৃতি গোবিন্দমাণিক্য মন থেকে মুছতে পারেননি। সুজার দেওয়া হীরার আংটি বিক্রী ক'রে তিনি কুমিল্লায় সুজা মসজিদ নির্মাণ করেন, আর তার কাছে সুজাগঞ্জ নামে বাজার

বসান। বোধ হয় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বাজারের আয়ে মসজিদের খরচ চলবে।—

রসাঙ্গেতে হিরাঙ্গুরী বাদসা দিয়াছিল।
সে অঙ্গুরী মহারাজা বিক্রয় করিল॥
গোমতী নদীর কূলে মজিদ স্থাপিয়া।
সুজা বাদসার নামে মজিদ করিয়া॥
সুজা নামে একগঞ্জ রাজা বসাইল।
সুজাগঞ্জ নাম বলি তাহার রাখিল॥

বাতিশা গ্রামে তিনি এক দীঘি খনন করান।—

গোবিন্দমাণিক্য রাজা পুণ্যবান অতি।
গোবিন্দ সাগর দিল বাতিশাতে ইতি॥—'শ্রেণীমালা।'

কসবা থানার জাজীয়াড়া গ্রামে মহারাণী গুণবতী যে-দীঘি খনন করান তা এখনো গুণসাগর নামে পরিচিত।—

পরগণে নুরনগর গ্রামে গুণসাগর।
রাণী গুণবতী দীঘি হইল তৎপর।—'শ্রেণীমালা'।

উদয়পুরে জগন্নাথের দোল নামে যে মন্দির আছে তার শিলালিপি পাঠে জানা যায়—"এই মন্দির মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁহার অনুজ জগন্নাথদেব নির্ম্মাণ করেন।" —'শিলালিপি সংগ্রহ'।

"গোবিন্দমাণিক্যের যত্নে মেহেরকুল বিশেষরূপে আবাদ হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে গোমতীর জলপ্লাবনে তত্তীরস্থ শস্যক্ষেত্র সর্ব্বদা বিনষ্ট হইত। তিনি গাং আইল নামক বাঁধ প্রস্তুত করিয়া শস্যক্ষেত্র রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। গোবিন্দপুর নামে ত্রিপুরা জেলার মধ্যে অনেকগুলি গ্রাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে ইহাদের অধিকাংশই মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের সময় সংস্থাপিত হয়। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য তাম্রশাসন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে বিস্তর নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। আমরা তাহার অনেকগুলি তাম্রশাসন

দর্শন করিয়াছি। তাম্রশাসনগুলি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত ”।—কৈলাস সিংহের রাজমালা।

গোবিন্দমাণিক্য যে শুধু উদারহৃদয়, ধার্মিক ও স্বদেশবৎসল রাজা ছিলেন তা-ই নয়, সাহিত্য প্রচারে-ও তাঁর উৎসাহ কম ছিল না। তাঁর আদেশেই বৃহন্নারদীয় পুরাণের বাঙলা অনুবাদ হয়। তাঁর মুদ্রায় মহারাজ ও মহারানীর নাম বাঙলায় লেখা ছিল। এ-কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

এভাবে বীর্যে, চরিত্রে ও কর্মে অক্ষয় যশ অর্জন করে মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে মারা যান। তাঁর পুত্র যুবরাজ রামদেব মাণিক্য উপাধি গ্রহণ করে ত্রিপুরার রাজা হন। তারপর মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য পর্যন্ত বিবরণ দিয়ে রাজমালা চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত হয়েছে।

কৃষ্ণমালা

রাজমালার পরবর্তী ইতিহাস গ্রন্থ কৃষ্ণমালা। এতে কৃষ্ণমাণিক্যের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মহারাজ রাজধর মাণিক্যের আদেশে জয়ন্ত চন্তাইর কথিত বিবরণ অবলম্বন ক'রে পণ্ডিত রামগঙ্গা শর্মা এই গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থের সূচনায় আছে—

একদিন মহারাজা বৈসাছে সভায়।
জয়ন্ত চন্তাই আসি মিলিল তথায়॥
শিবভক্তি নারায়ণ চন্তাই নন্দন।
জয়ন্ত নামেতে সেই জয়ন্ত তুলন॥

* * * * *

তাহাকে সম্বোধি মহারাজা জিজ্ঞাসয়॥
কহ কহ প্রকাশিয়া চন্তাই জয়ন্ত।
রাজা কৃষ্ণমাণিক্যের যতেক বৃত্তান্ত॥

* * * * *

শুনিতে সেসব কথা মোর মনে লয়।
আশ্বাসিয়া সর্ব্বকথা কহ মহাশয়॥

তারপর,—

জয়ন্ত চন্তাই মুখে বৃত্তান্ত শুনিয়া।
রামগঙ্গা নামে দ্বিজ আনে আদেশিয়া॥
আনি রামগঙ্গা স্থানে কহিল রাজন।
কর দ্বিজবর এক পুস্তক রচন॥
রাজা কৃষ্ণমাণিক্যের যতেক বৃত্তান্ত।
আমা ঠাঁই কহিয়াছে চন্তাই জয়ন্ত॥
সে সব সংবাদ তুমি করিয়া শ্রবণ।
প্রাকৃত ভাষায় কর পুস্তক রচন॥

দৈববাণী বুঝিবারে নারে সর্ব্বলোকে।
পয়ার প্রবন্ধে সব বুঝিবেক সুখে॥

রাজমালার চতুর্থ খণ্ডে কৃষ্ণমালার উল্লেখ আছে।—

উজীর বলে বিজয় মাণিক্য অভ্যন্তরে।
কৃষ্ণমাণিক্য মহারাজা হৈল তার পরে॥
তান কীর্ত্তি রাজধর মাণিক্য আদেশে।
জয়ন্ত চন্তাই পূর্ব্বে বলিছে বিশেষে॥
কৃষ্ণমালা নাম পুস্তক বিস্তার কাহিনী।
রামগঙ্গা বিশারদ রচিল তখনি॥

এই গ্রন্থে রচয়িতার পরিচয় নেই। ভাষা দেখে মনে হয় তিনি ত্রিপুরা বা নোয়াখালী জেলার লোক ছিলেন। রাজধরমাণিক্যের রাজত্বকাল সম্পর্কে কৃষ্ণমালায় আছে,—

আষাঢ় মাসেতে রাজা হৈল মহাশয়।
ঋষি শূন্য শৈল শশী শকের সময়॥

অর্থাৎ ১৭০৭ শকে রাজধরমাণিক্য রাজা হন। রাজমালার মতে তিনি ১৭৮৫ থেকে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কাজেই কৃষ্ণমালা রচনাকাল তুইশ বছরের মধ্যে।

তখন ত্রিপুরার সিংহাসনে ইন্দ্রমাণিক্য সমাসীন, যুবরাজ তার ভাই কৃষ্ণমণি। গৃহ বিবাদের আবর্তে প'ড়ে রাজশক্তি বিপর্যস্ত, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী রাজকুমারদের ষড়যন্ত্রে সিংহাসন টলটলায়মান। এমন সময় ত্রিপুরার ভাগ্যাকাশে এক ধূমকেতুর উদয় হ'ল। তার নাম সমসের গাজি। পরগণা দক্ষিণশিকে তার বাড়ি ছিল। কৃষ্ণমালায় তাকে তস্কর বলা হয়েছে। দস্যুবৃত্তি দ্বারা প্রচুর অর্থ সঞ্চয় ক'রে তার জমিদার হ'বার সখ হ'ল। কৃষ্ণমালায় আছে,

সমসের গাজি এক আছিল তস্কর।
পরগণে দক্ষিণ শিক ছিল তার ঘর॥

দস্যুবৃত্তি করি ধন করিয়া সঞ্চয়।
হইবারে জমিদার তার মনে লয়। ইত্যাদি

এ-সময় ত্রিপুরার সিংহাসনের প্রতি তার নজর পড়ল। ঢাকা নিবাসী হাজী হোসেন নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে তার হৃদ্যতা ছিল। তার সহায়তায় সমসের গাজি বাঙলার নবাবের সাহায্য নিয়ে ইন্দ্র মাণিক্যকে পরাস্ত করলেন। ইন্দ্রমাণিক্য বন্দী হ'য়ে মুর্শিদাবাদে নীত হ'লেন। মুক্তিলাভ ক'রে তিনি তীর্থে যান এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এই দুর্যোগের সময় যুবরাজ কৃষ্ণমণি পরিবারবর্গকে নিয়ে রাজধানী ত্যাগ করেন। তিনি হেড়ম্ব রাজ্য অর্থাৎ বর্তমান কাছাড়ে আশ্রয় প্রার্থী হ'ন। এ সময় কৃষ্ণমণির বড় দুর্দিন। যুদ্ধে পরাজয়, রাজ্য-ত্যাগ, অরণ্যবাস, পর্যটন ইত্যাদি অনেক কষ্ট ভোগ করে তিনি কাছাড়ে আশ্রয় পেলেন।

তারপর একদিন ভাগ্যের চাকা ঘুরল, দস্যুতার অপরাধে নবাবের বিচারে সমসের গাজির প্রাণদণ্ড হ'ল। কৃষ্ণমণি স্বরাজ্যে ফিরে এলেন আর মাণিক্য উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। এটা ১১৭০ ত্রিপুরাব্দের কথা।

যুবরাজ অবস্থায় কৃষ্ণমাণিক্য আগরতলায় বসতি স্থাপন করেন। পর্বত বেষ্টিত এ স্থানটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয় মনে ক'রে এখানে থেকেই তিনি সমসের গাজির হাত থেকে আত্মরক্ষা করেন। রাজা হ'য়ে এই আগরতলাতেই তিনি রাজধানী স্থাপন করলেন—

এগারশ সত্তর সন হইল যখন।
আগরতলা রাজধানী করিল রাজন।

কৃষ্ণমাণিক্যের রাজধানী আগরতলা বর্তমান আগরতলা সহর থেকে তিন মাইল দূরে। এখন তার নাম 'পুরান আগরতলা'। শুধু আগরতলা বলতে নতুন রাজধানীকে বোঝায়।

কৃষ্ণমাণিক্যের প্রসিদ্ধ কীর্তি কুমিল্লার সতর রত্ন মন্দির। কৃষ্ণমালায় আছে,—

এক মঠে সপ্তদশ মঠের গঠন।
সপ্তদশ রত্ন নাম হৈল সে কারণ।

রাজমালায় লেখা আছে এই মন্দিরেই কৃষ্ণমাণিক্য জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা এই ত্রিমূর্তি স্থাপন করেন।

বলভদ্র জগন্নাথ সুভদ্রা সহিত।
সপ্তদশ রত্নে রাজা করিল স্থাপিত॥

কৃষ্ণমাণিক্য উদারচেতা ছিলেন। সমসের গাজির দেওয়া ব্রহ্মোত্তর ও নিষ্কর ভূমিদানের মর্যাদা তিনি রক্ষা করেন।

তিনি তেইশ বৎসর রাজত্ব করেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণমালা ঈশ্বর গুপ্তের সময়কার লেখা। তখনকার ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে কৃষ্ণমালার রচনাশৈলীর প্রশংসা করতে হয়। এটি হাতে লেখা পুঁথি, ছাপা হয়নি।

কৃষ্ণমালা একাধারে ইতিহাস ও কাব্য। মূলত ইতিহাস বর্ণনাই রচয়িতার মুখ্য উদ্দেশ্য হ'লেও স্থানে স্থানে সুন্দর কবিত্বের পরিচয় মেলে। মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্যের মৃত্যুর পর রাজমহিষীর বিলাপ তার একটি উদাহরণ। এটি ত্রিপদী—

না দেখি তোমার মুখ জীবনে কতেক সুখ
নিশি যেন শশী বিনে কালা।
জল বিনে মীনচয়, যেমনি বিকল হয়,
পতি বিনা তেন মত বালা॥
যেন পাখাহীন পাখী, তারাহীন যেন আঁখি,
হরিকথা যেন হীন গীত।
শিশুহীন গৃহ যেন ধর্ম্মহীন যেন ধন,
পতিহীন তেমনি যোষিৎ॥

যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত কুকির বর্ণনাটিতে দিগম্বর কুকির বীর্যবান রূপটি সুন্দর ফুটে উঠেছে।—

কটিতে বসন নাই দিগম্বর বেশ।
সকল মস্তক জুড়ি আছে মুক্ত কেশ॥
গবয়ের চর্ম্ম নির্ম্মিত দীর্ঘ ঢাল।
পৃষ্ঠে দোলে, করেতে কুকিয়া করতাল॥
লোহার টোপড় মাথে রাঙ্গা বস্ত্র গায়।
তীক্ষ্ণধার শেল হাতে রণে আগুয়ায়॥
তীর কোষে ভরা আছে বিষে মাখা তীর।
হাতে দিব্য ধনু রণে নির্ভয় শরীর।

গাজিনামা

ত্রিপুরার মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্য ও যুবরাজ কৃষ্ণমণির সঙ্গে সমসের গাজির যুদ্ধ অবলম্বন ক'রে আরেকটি গ্রন্থ রচিত হয়। তার নাম গাজিনামা। এর মধ্যে সমসের গাজির উত্থান পতন ও তাঁর জীবনের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। এর কবি মনোহর আলীর বাড়ি ছিল দক্ষিণশিকে। এটি আগে ত্রিপুরা জেলায় ছিল, এখন নোয়াখালীতে। গ্রন্থের মধ্যে কবির ভণিতা আছে এবং শেষভাগে আত্মপরিচয় রয়েছে।

তখন দক্ষিণশিকের জমিদার ছিলেন নাছির মহম্মদ। তার ছেলেদের সঙ্গে একটি দরিদ্র বালক পড়াশুনা করত। তার নাম সমসের গাজি। এক ফকিরের ছেলে বলে তাকে 'পীরের নন্দন' বলা হয়েছে। বালক সমসের অত্যন্ত বুদ্ধিমান, পড়াশুনায় ও শক্তিচর্চ্চায় তিনি জমিদারের দুই পুত্র ছাদুল্লা ও বাদুল্লাকে ছাড়িয়ে যান। গাজিনামায় তার পড়াশুনার বিবরণ রয়েছে—

ছয় মাসে বাঙ্গালার লিখিল বর্থান্ত।
পাঠক সকলে কেহ নাই সমবন্ত ॥
যাহারে বাড়াইব প্রভু তার নাই উন।
দিনে দিনে তাহার বাড়য়ে যশ গুণ ॥
লেখাপড়া গুণবন্ত পিরের নন্দন।
দেখি গুরু হইলেক সানন্দিত মন ॥
জমিদার দুই পুত্র না হএ সমান।
তাহা দেখি আওলজীর দিল পেরাসান ॥

লেখাপড়া ও শক্তিচর্চ্চায় সমসেরের কৃতিত্ব দেখে নাছির মহম্মদ তাঁকে বাঁশপাড়া কাছারীর তহশীলদার নিযুক্ত করলেন।

এমন সময় গদা হোসেন খন্দকার নামে এক বিখ্যাত ফকিরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। ফকির তাকে বললেন "সমসের, এই সামান্য তহশীলদারি

তোমার জন্য নয়। তুমি একদিন এই চাকলে রোশনাবাদের মালিক হ'বে। আমি তোমাকে একটি দৈবশক্তিসম্পন্ন ঘোড়া ও তলোয়ার দিয়ে যাব। এর বলে তুমি সর্বত্র অজেয় হ'বে। জমিদার নাছিরের সঙ্গে যুদ্ধে তোমার জয় ও নাছিরের মৃত্যু হ'বে। তারপর ত্রিপুরার মহারাজের সঙ্গে তোমার যুদ্ধ বাঁধবে, কিন্তু তোমার জয় অনিবার্য। তোমার শক্তি সম্পর্কে এখনো তুমি সচেতন নও, কিন্তু যখন দিন আসবে তখন তুমি নিজেকে চিনতে পারবে।"—এই বলে দৈব শক্তিসম্পন্ন ঘোড়া ও তলোয়ার দিয়ে ফকির বিদায় হ'লেন—

পির বলে মন দিয়া শোন পিরসুত।
এ সুভর্ণ ঘোড়ার জান কির্ম্মত বহুৎ॥
রসাঙ্গে মগধরাজা ধার্ম্মিক আছিল।
চৌদ্দ ছোলতান প্রতি এহি দৈর্ব্য দিল॥
ছোলতানে বকসাইল আপন বেটারে।
তা ক্রমে আসিয়া ঠেকিল মোর করে।

* * *

নাছির যাইব মারা পাইবা জমিদারি।
রাজবংশ ভঙ্গ হৈব হৈবা অধিকারি॥
কিন্তু রাজার সঙ্গে তোমার হৈব মহারণ।
আল্লাএ করিলে হৈবা রার্জ্যের ভাজন॥
এহি সুভর্ণ অর্শ্ব দিলুম তে কারণ।
মুল্লুক বিজএ হৈব জানিয়া আপন॥

ফকিরের কথায় সমসেরের মনে উচ্চাভিলাষ জেগে উঠল। তিনি নাছির মহম্মদের কাছে তাঁর কন্যা দৈয়া বিবিকে বিবাহ করবার প্রস্তাব পাঠালেন। সামান্য তহশীলদারের স্পর্দ্ধা দেখে তিনি তো অবাক। বিস্ময় ক্রমে ক্রোধে পরিণত হ'ল, নাছির রেগে আগুন হয়ে উঠলেন। তিনি একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন সমসেরকে দমন করবার জন্য।

সমসের এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ভয়ে পালিয়ে গেলেন বেদরাবাদ পরগণায়। সেখানে থেকে একদল লোককে তিনি সামরিক শিক্ষা দিতে লাগলেন। এভাবে তাঁর নিজের একদল সৈন্য গঠিত হ'ল। তখন হঠাৎ একদিন তিনি নাছির মহম্মদকে আক্রমণ করলেন। নাছির ও তাঁর পুত্রগণ মারা পড়লেন। দৈয়া বিবির সঙ্গে সমসেরের বিবাহ হ'ল। ফকিরের ভবিষ্যদবাণীর প্রথম ভাগ ফলল, সমসের জমিদার হলেন।

সমসের অন্যায়ভাবে দক্ষিণশিক অধিকার করেছেন শুনে ত্রিপুরার মহারাজ একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন তাঁকে দমন করবার জন্য। বেগতিক দেখে সমসের বশ্যতা স্বীকার করলেন। তিনি কয়েক হাজার টাকা নজরানা দিলেন মহারাজকে। তার বদলে মহারাজ তাঁকে জমিদারির সনদ দান করলেন। এর তিন বছর পর সমসের মেহেরকুল ইজারা নিলেন।

এরপর চাকলে রোশনাবাদের ওপর সমসেরের লোলুপদৃষ্টি পড়ল। এ সময় হোসেন কুলি খাঁর কাছ থেকে হাতির জন্য ত্রিপুরার মহারাজের কাছে ক্রমাগত তাগিদ আসছিল। মহারাজ বিজয়মাণিক্য হাতী ধরতে না পেরে মুস্কিলে পড়েছিলেন। তখন সমসের তাঁকে জানালেন তিনি হাতি ধ'রে দিতে পারবেন, তবে বিনিময়ে চাকলে রোশনাবাদের জমিদারিটুকু চান। হোসেন কুলি খাঁ দেখলেন প্রস্তাব মন্দ নয়। তখন সব কথা আলাপ আলোচনার জন্য বিজয়মাণিক্যকে ঢাকা নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বিজয়মাণিক্যের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমসের রাজকর বন্ধ ক'রে দিলেন, আর নিজেকে চাকলে রোসনাবাদের অধিপতিরূপে ঘোষণা করলেন। ফকিরের ভবিষ্যদবাণীর আরেক অংশ ফলল।

বিজয়মাণিক্যের মৃত্যুতে ত্রিপুরার সিংহাসন শূন্য হ'য়ে পড়ল। মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্যের ভাই যুবরাজ কৃষ্ণমণি গৃহ বিবাদের ফলে হেড়ম্ব রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি এবার রাজধানীর দিকে অগ্রসর

হ'লেন। কিন্তু সমসের তাঁকে বাধা দিলেন। উভয়পক্ষে যুদ্ধ হ'ল। এ-যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ গাজিনামায় আছে। বলা বাহুল্য সমসেরের দৈব তরবারিরই জয় হ'ল।

সমসের উদয়পুর অধিকার করলেন, কিন্তু একেবারে সরাসরি নিজে রাজা হ'লেন না। ধর্ম্মমাণিক্যের পৌত্র বনমালীকে লক্ষ্মণমাণিক্য নামে সিংহাসনে বসিয়ে তার নামে নিজে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। ফকিরের বাণী সর্ব্বাংশে সত্যি হ'ল।

এভাবে কার্যত ত্রিপুরার অধিপতি হয়েও কিন্তু সমসেরের তৃষ্ণা মিটল না। টাকার লোভে তিনি ডাকাতি শুরু করলেন। ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের জমিদারদের বাড়িতে তিনি গভীর রাত্রে হানা দিতে লাগলেন। গাজিনামার লেখক বলেছেন সমসের একজন কৃপণ জমিদারের বাড়ি থেকে এক লক্ষ টাকা ডাকাতি করে এনেছিলেন। এখনো সমসেরের দস্যুবৃত্তির অনেক কাহিনী এসব অঞ্চলে শোনা যায়।

এদিকে যুবরাজ কৃষ্ণমণি সমসেরের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হ'য়ে পুরান আগরতলায় বাস করছিলেন। তিনি এই সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। নবাবকে সমসেরের দস্যুবৃত্তির কথা জানাবার জন্য তিনি নিজে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করেন। তখন বাঙলার মসনদে মীরকাশিম অধিষ্ঠিত। তিনি কাগজপত্র দেখে কৃষ্ণমণিকেই ত্রিপুরার রাজা ব'লে ঘোষণা করলেন। আর সমসেরকে বন্দী ক'রে আনবার জন্য সৈন্য পাঠালেন ত্রিপুরায়।

এত সব কাণ্ডের জন্য সমসের প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি সহজেই ধরা পড়লেন। তারপর তাঁকে বন্দী ক'রে মুর্শিদাবাদ নেওয়া হয়। সেখানে নবাবের বিচারে তাঁর প্রাণ দণ্ডের আদেশ হ'ল। তখন হাত পা বাঁধা অবস্থায় তাকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হ'ল। ত্রিপুরার ভাগ্যাকাশে যে আকস্মিক ধূমকেতুর উদয় হয়েছিল এভাবে তার বিলয় ঘটল।

গাজিনামা বোধ হয় কৃষ্ণমালার আগে লেখা। কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্তের মতে এটি আড়াই শ' বছরের পুরনো গ্রন্থ। কবিত্বের দিক দিয়ে এর বিশেষ কোন মূল্য নেই। তবে মাঝে মাঝে তারও পরিচয় আছে। মহারাজের পাইক তার কাছে সমসের গাজির বর্ণনা করছে—

বলে মহা বলবন্ত রূপে পঞ্চবাণ।
চলিতে গম্ভীর জ্ঞানে রাজা অনুমান॥
বচন অমিয়া ভাষ ক্রন্নে স্থুধা পান।
বসন ভূসণ গাএ দিব্ব দিপ্তিমাণ॥
মিত্র আগে মিত্রাধিক শক্রু আগে যম।
দানে দাতা অতিসএ কর্ম্মে ত বিক্রম॥

গাজিনামার ভাষা মুসলমানী বাঙলা। তবে সাময়িক কারণে বৈষ্ণব প্রভাবও রয়েছে। যেমন—গাজি বলে আজি মোর শুভদিন ভেল। ইত্যাদি।

বইটি হাতে লেখা পুঁথি, ছাপা হয় নি।

চম্পকবিজয়

মহারাজ দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য মুসলমানদের হাতে পরাজিত হন। তাঁর পরাজয়ের পর দেওয়ান চম্পক রায় চট্টগ্রামে ও সেখান থেকে ঢাকায় পলায়ন করেন। মীর খাঁ নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে কাজ করতেন। তিনি চম্পকরায়কে সাহায্য করেন। তাঁর সাহায্যে চম্পকরায় আবার রাজ্য উদ্ধার করেন। এই ঘটনা নিয়ে চম্পকবিজয় গ্রন্থটি লেখা হয়েছে। গ্রন্থে মীর খাঁরই প্রধান্য, প্রকৃতপক্ষে তিনিই নায়ক।

কবির নাম মহদ্দিন। তিনি গ্রাম্য কবি ছিলেন। মীর খাঁর আদেশেই গ্রন্থ লেখা হয়।

শ্রীমীর খাঁ গাজি ভুবন দুর্জয়।
তাহার আদেশ ধরি মহদ্দিয়ে কয়॥

গ্রন্থের প্রথমেই এক বিষয় সূচী রয়েছে।—

যেন মতে শিশু রত্নদেব রাজা হৈল।
যেন মতে রত্নদেব বনে প্রবেশিল॥
যেমতে চম্পকরায় গেল নিকলিয়া।
উজির সংহতি গেল মন্ত্রণা করিয়া॥
যেন মতে পালাইয়া রইল দুইজন।
যেন মতে মীর খাঁরে করিল স্মরণ॥
বার্ত্তা পাইয়া মীর খাঁয়ে সৈন্য যে পাঠাই।
দুইজনে নিয়া গেল আগলে উঠাই॥
যেন মতে পুন আসি লৈল রাজধানী।
মহাযুদ্ধ ছিল দুই বলে হানাহানি॥

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র রামমাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রত্ন মাণিক্য রাজা হন। তখন তাঁর বয়স ছিল পাঁচ বৎসর। শিশু

মহারাজের পক্ষে মাতুল বলিভীমনারায়ণ রাজ্যচালনা করেন। কিন্তু বলিভীমের দৌরাত্ম্য ক্রমেই বেড়ে উঠল। এ খবর ক্রমে ঢাকার নবাব শায়েস্তা খাঁর কানে উঠল্। তিনি বলিভীমকে ধ'রে আনবার জন্য সৈন্য পাঠালেন। ধরা পড়লেন বলিভীম। বন্দী অবস্থায় তাঁকে ঢাকায় নেওয়া হ'ল, তারপর পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল মুর্শিদাবাদে।

বলিভীমের জায়গায় কে যুবরাজ হ'বেন এ-নিয়ে চক্রান্ত চলল। রত্নমাণিক্যের পিতৃব্য দ্বারকা ঢাকায় চ'লে গেলেন। সেখানে নবাবকে প্রভাবিত ক'রে একদল সৈন্য নিয়ে তিনি রওনা হলেন ত্রিপুরায়। বালক রত্নমাণিক্য ভয়ে রাজধানী ছেড়ে বনে পলায়ন করলেন। তখন উজির ছিলেন সূর্যনারায়ণ আর চম্পকরায় ছিলেন দেওয়ান। দ্বারকার আক্রমণে উজিরের মৃত্যু হয়; আর চম্পকনারায়ণ পলায়ন করেন।

তখন দ্বারকা নরেন্দ্রমাণিক্য নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তিনি বনবাসী রত্নমাণিক্যকে ফিরে আসবার জন্য এক পত্র দিয়ে রাজদূত পাঠিয়ে দিলেন। রত্নমাণিক্য পিতৃব্যের পত্রে বিশ্বাস ক'রে ফিরে চললেন রাজধানীতে। পাত্রমিত্র সবাই তাঁকে নিষেধ করল, কিছুই শুনলেন না তিনি।

উদয়পুরে এসেই রত্নমাণিক্যের ভুল ভাঙল। তখন তিনি রাজবন্দী। নরেন্দ্রমাণিক্য রত্নমাণিক্যের সঙ্গীদের হত্যা করলেন। তারপর খোঁজ আরম্ভ হ'ল চম্পকরায়ের।

চম্পকরায় চট্টগ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ধরা পড়বার ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন ভুলুয়ায়। তারপর সেখানেও নিরাপদ নয় বুঝে তিনি ঢাকায় পালিয়ে যান। ঢাকায় গিয়ে তিনি নবাবের আশ্রয় ভিক্ষা করলেন। রত্নমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্যোধন তার সঙ্গে জুটলেন। তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন মীর খাঁ। তিনজনে মিলে নবাবকে প্রভাবিত করলেন, তারপর নবাব সৈন্য নিয়ে রওনা হলেন ত্রিপুরায়। নরেন্দ্রমাণিক্য বন্দী হ'য়ে ঢাকায় নীত হলেন।

রত্নমাণিক্য আবার ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করলেন, আর চম্পক-রায় হলেন যুবরাজ।

চম্পকবিজয় গ্রন্থে রত্নমাণিক্যের রাজ্যচ্যুতি থেকে চম্পকরায় কর্তৃক রাজ্যের উদ্ধার সাধন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। মীর খাঁ রত্ন মাণিক্যের সময়কার লোক। তাই এ পুঁথির প্রাচীনত্ব আড়াইশ বছর।

গাজিনামার মত চম্পকবিজয়-ও মুসলমান কবির রচনা। কিন্তু গাজিনামায় যেমন মুসলমানী ভাষা দেখা যায় চম্পকবিজয়ে তেমন নয়। কবি মুসলমান হলেও গ্রন্থে হিন্দুয়ানির ছাপ যথেষ্ট। শুধু ভাষার বেলাই নয়, বিষয় বর্ণনা সম্পর্কেও এ-কথা খাটে। গ্রন্থের আরম্ভে আছে,—

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
বর্ণাবর্ণ যেই প্রভু করিল সৃজন॥
নানা বর্ণ বিবর্ণ যে করিল বর্ণিত।
তান বর্ণ কহে হেন কে আছে পণ্ডিত॥
অনন্ত মহিমা রূপ বৈসে ঘটে ঘটে।
সংসার ব্যাপিয়া যেন নৃত্য করে নটে॥
প্রতি ঘটে বৈসে প্রভু হইয়া লুকিত।
পুরাণে প্রমাণ করে সর্ব্বত্রে ব্যাপিত॥

শুধু তা-ই নয়। মুসলমান কবি মুক্তকণ্ঠে ব্রহ্মা বিষ্ণুর মহিমা প্রচার করেছেন।—

অনলে জন্মিল দেব ব্রহ্মা মহাশয়।
জলেতে জন্মিল বিষ্ণু সর্ব্বভূতময়॥
সেই বিষ্ণু নাম লৈলে সর্ব্বপাপ নাশে।
বেদে পুরাণে শাস্ত্রে কহে ইতিহাসে॥

কবির বর্ণনা সহজ সরল সত্যভাষণ। বিষ্ণুর মহিমা প্রচার করতে গিয়ে আরেক স্থানে তিনি বলছেন—

মৃত্তিকাতে রৈছে প্রভু কঠিন রূপ ধরি।
পক্ষী বাহন করি বায়ু অবতরি॥
জল মধ্যে রহিছেন স্থূলরূপ হৈয়া।
জলচর রক্ষা করে তথাতে থাকিয়া॥
কাষ্ঠমূলে অগ্নিরূপে রহিছে ছাপিয়া।
জ্বালাইলে জ্বলে অগ্নি দেখহ ভাবিয়া॥
কাষ্ঠমূলে অগ্নি আছে জ্বালাইলে জ্বলে।
সাধিলে সে সিদ্ধি হয় মহাজনে বলে॥

* * * *

সর্ব্বস্থানে আছে প্রভু লুকিত হইয়া।
পুষ্পের ভিতর যেন গন্ধ ছাপাইয়া॥
পুরুষ হইয়া নারী সঙ্গে কেলি করে।
নারীরূপ হইয়া পুরুষ চিত্ত হরে॥
দাতারূপ ধরিয়া করিতেছে দান।
ধরিয়া ভিক্ষুকরূপ মাগে সর্ব্বস্থান॥
দিগম্বর রূপে বস্ত্র না করে পৈরণ।
সন্ন্যাসীর রূপ ধরি ভ্রমে বনে বন॥
মিত্ররূপ ধরি করে হাস্য পরিহাস।
শত্রুরূপ ধরিয়া করিতে আছে নাশ॥

এভাবে সবের মধ্যেই কবি ভগবানকে দেখতে পাচ্ছেন। মুসলমান কবি এ-প্রসঙ্গে রামায়ণ মহাভারতের উল্লেখ করেছেন—

ধরিয়া রাবণ রূপ জানকী হরিল।
রামরূপ ধরি পুন তাকে সংহারিল॥
কৃষ্ণরূপ ধরি প্রভু কংস বিনাশিল।
গোপীসঙ্গে ক্রিড়া তবে বৃন্দাবনে কৈল॥
চোর রূপ ধরি চুরি করিতে আছয়।
সাধুরূপ ধরি তারে লজ্যা যে দেয়॥

যতেক হয় জান সব তার কৃত।
যত কর্ম্ম হয় জান প্রভুর লিখিত॥

তাঁর উপমাগুলিও হিন্দুরুচি সম্মত। মীর খাঁর বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন—

দানে ত কর্ণের সম সমরে প্রখর।
বলে ভীম গাণ্ডীবে অর্জুন সমসর॥
বিক্রমে তমোহা তুল্য সাক্ষাতে সমন।
যার ভয়ে কম্পবান হয় রিপুগণ॥

চম্পকবিজয় হাতে লেখা পুঁথি, ছাপা হয় নি। কবি মহদ্দিন ত্রিপুরার লোক ছিলেন। তাই কাব্যের ভাষায় ত্রিপুরার উপভাষার ছাপ রয়েছে।

শ্রেণীমালা

শ্রেণীমালা দুর্গামণি উজিরের লেখা। দুর্গামণি উজির সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্যসেবী ছিলেন। রাজমালার শেষ দুটি খণ্ড তাঁরই রচিত। তাঁর হাতে লেখা পুথি দেখেই কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত রাজমালা সম্পাদন করেন।

শ্রেণীমালা কুলজিগ্রন্থ। রাজা ও রাজপরিবারের লোকেরা কে কোথায় বিবাহ করেছেন, রাজকুমারীদের কোথায় বিবাহ হয়েছে এ-সব বিবরণ ও তাদের বংশাবলী এতে দেওয়া আছে। এ প্রসঙ্গে রাজাদের কীর্ত্তিকাহিনীর বর্ণনাও রয়েছে। গোবিন্দ মাণিক্যের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

গোবিন্দ মাণিক্য রাজা পুণ্যবান অতি।
গোবিন্দ সাগর দিল বাত্তিশাতে ইতি॥

কসবা থানার জাজীয়াড়া গ্রামে মহারানী গুণবতী একটি দীঘি খনন করান, তার নাম গুণ সাগর। শ্রেণীমালায় আছে—

পরগণে নুরনগর গ্রামে গুণ সাগর।
রাণী গুণবতী দীঘি হইল তৎপর।

দুর্গামণি উজির উনিশ শতকে জীবিত ছিলেন। কাজেই শ্রেণীমালা সে-সময়কার লেখা।

অনুবাদ গ্রন্থ

ত্রিপুরার রাজাদের অনেকেরই বাঙলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল। বেশ কয়েকজন রাজার সময়েই সংস্কৃত গ্রন্থ বাঙলায় অনূদিত হয়। এ সম্পর্কে প্রথমেই ধর্ম মাণিক্যের নাম করতে হয়। মহারাজ ধর্মমাণিক্য শুধু যে রাজমালা রচনা করিয়েছিলেন তা-ই নয়, তাঁর আদেশে মহাভারত বাঙলায় অনুবাদ করা হয়। এটা পাঁচশ বছর আগের কথা। তার পুত্র ধন্য মাণিক্য 'উৎকলখণ্ড' ও 'যাত্রা রত্নাকর নিধি' নামে জ্যোতিষ গ্রন্থের অনুবাদ করান। রাজমালায় আছে—

শ্রীধন্যমাণিক্য রাজা কমলার পতি।
উৎকলখণ্ড পাঁচালী রচাইল মহামতি॥
জ্যোতিষের যাত্রা রত্নাকর নিধি আর।
পাঁচালী রচাইল রাজা লোকে বুঝিবার॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণ—রাজর্ষি গোবিন্দ মাণিক্যের আদেশে বৃহন্নারদীয় পুরাণের অনুবাদ হয়। গ্রন্থের মুখবন্ধে আছে—

চন্দ্রবংশ অবতংস ত্রিপুর ভূপতি।
বিষ্ণুপরায়ণ ধর্মশীল সাধুমতি॥
গোবিন্দ মাণিক্য দেব ধর্ম্ম অবতার।
ধর্ম্মেতে পালিলা রাজ্য বিদিত সংসার॥

* * * * * *

কহিলেন মহারাজ শুন বিপ্রগণ।
অকালে মরয়ে প্রজা পাপের কারণ॥
না করে বিষ্ণুর পূজা তুলসী পূজন।
না করে অতিথি সেবা ব্রাহ্মণ ভোজন॥

না করে গুরুর পূজা সাধু সমাগম।
তীর্থসেবা নাহি করে ধর্ম্মে বাসে শ্রম॥
পুরাণের অর্থগুরু বুঝিতে সংশয়।
এহাতে উপায় এক মোর মনে লয়॥
বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণ বিশেষ।
এহাতে এসব কথা কহিছে বিশেষ॥
শুন সব বিপ্রগণ শ্লোক অনুসারে।
ভাষা পদবন্ধ কর লোক বুঝিবারে॥
× × × ×
অল্পবুদ্ধি মেধাহীন প্রজা পাপাচারী।
অকালে মরয়ে সব ধর্ম্ম পরিহরি॥
শুনিয়া পুরাণ কথা দৈব সাধু অতি।
লোক উপকার হেতু করি যে প্রণতি॥
এমত আদেশ যদি করিল নৃপতি।
সাধু বাদে বিপ্র সবে দিল অনুমতি॥
সুসম বিষম যত পুরাণের সার।
আরম্ভিলা ভাষারূপে করিতে প্রচার॥

গ্রন্থের কোথাও কবির নাম নেই। কোন কোন ভণিতা দেখলে মনে হয় বুঝিবা মহারাজ নিজেই অনুবাদ করেছেন। যেমন—

কল্যাণ মাণিক্য দেব তনয় প্রধান।
শ্রীশ্রীগোবিন্দ মাণিক্য পুণ্যবান॥
বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণের সার।
সর্ব্বলোক বুঝিবারে করিল পয়ার॥

কিন্তু এ ধারণা সত্যি নয়। রাজাদেশে অনুবাদ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এ-অভিমতই সংগত। এ সম্পর্কে পরিষ্কার লেখা রয়েছে—

শ্রীশ্রীগোবিন্দ মাণিক্য নরেশ্বরে।
পুরাণের অর্থ সব লোকে বুঝিবারে॥

ভারত ভূমির হেন প্রশংসা করয়।
ব্রহ্মা আদি দেবে নিজ পদক্ষয় ভয়॥
সর্ব্ব কর্ম্মফল দাতা পুণ্যের কারণ।
দেবের দুর্লভ এহি ভারত ভুবন॥

মাঝে মাঝে কবিত্বেরও বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা সৌদাস রাক্ষসরূপ ধারণ করে ব্রাহ্মণকে হত্যা করলে ব্রাহ্মণীর বিলাপ তার একটি দৃষ্টান্ত—

রাক্ষসে মারিল পতি মোর হৌক কোন গতি
লক্ষ্য নাহি মোর ত্রিভুবনে।
মুই মহাপাতকীরে কি করিলা গদাধরে
পরিত্রাণ না দেখি নয়নে॥
কোথা গেলে গুণনিধি মোরে সে বঞ্চিলা বিধি
মোর প্রাণ অতি দৃঢ়তর।
তপস্যা করিয়া অতি তুমি হেন পাইলু পতি
তোমা লাগি বিদরে অন্তর॥
যাইতে তোমার সনে হেন ছিল মোর মনে
না পারিল শিশুর কারণ।
বিনি লক্ষ্যে শিশুবর ঘোর বনে একেশ্বর
মুই বিনে তেজিবে জীবন॥

ত্রিশ অধ্যায়ে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থার অতি সুন্দর স্বাভাবিক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। প্রথমে গাছপালার উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে—

সুতে বলে মুনিগণ কহি শুন বিবরণ
যেই রূপে পাপ পুণ্য ভোগ।
কর্ম্ম পাশে বন্দি হৈয়া পুণ্য ভোগ স্বর্গে গিয়া
তার শেষ হইব পতন॥

পাপ পুণ্য ফলভার   দুঃখে রহে আপনার
তার পাছে দুঃখ যোনি পায়।
ক্ষীণ কর্ম্ম অবশেষে   নরযোনি পায় পাছে
মৃত্যু আদি সর্ব্ব ভয় পায়॥
বৃক্ষ গুল্ম লতাবলী   গিরি তৃণ রূপ ধরি
তবেত স্থাবর নাম ধরে।
তবে বীজ চ্যুত হইয়া   তাতে জল সেক পাইয়া
পৃথিবীতে সে বীজ অঙ্কুরে॥
তার শেষে পত্র হৈয়া   যে কিছু প্রবৃদ্ধি পাইয়া
কাল পাইয়া ফলে পূর্ণ হয়।
ফুল হতে ফল যার   ফলে বীজ সঞ্চার
সেই শুনি বৃক্ষবর হয়॥

তারপর মানুষের উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে। ভ্রূণ অবস্থার বর্ণনা—

বিষ্ঠা মূত্রে লিপ্তমান   মনে করি অনুমান
বিলাপ করয়ে মনে মনে॥
পূর্ব্ব জন্মে পাপ করি   পুষিয়াছি ভৃত্য নারী
ধনধান্যে বহু মত্ত হৈয়া।
পুত্র মিত্র পত্নী আর   অতি স্নেহে পুষিবার
পরধন আনিছি হরিয়া॥
কামভাবে অন্ধ হৈয়া   পরনারী হরি লৈয়া
বহু পাপ করিয়াছি সুখে।
সেই পাপে তাপি হৈয়া   পাপ ভোগ করিয়া
স্থাবর হইল বহু দুখে॥

*   *   *   *   *   *

এইরূপে বারেবার   বিলাপিয়া সেই কাল
আপনাকে আশ্বাসে আপনে॥

গর্ভ হোতে মুক্ত হৈয়া সাধুগণ সঙ্গ লৈয়া
শুদ্ধমন করিমু নিশ্চয়।
সমস্ত জগতরূপ নিরঞ্জন স্বরূপ
ভক্তি করি রাখিমু হৃদয় ॥
লক্ষ্মীপতি নারায়ণ তিন লোক ভাবন
তাহ্নে পূজি যাইমু তরিয়া।
সংসার সাগর পার অতি দুঃখ মহাভার
বিষ্ণু ভজি যাইমু সুখী হৈয়া ॥

তারপর আছে জন্ম বৃত্তান্ত। এরপর শৈশবের বর্ণনা—

পরের অধীন হৈয়া নানাবিধ ভোগ পাইয়া
ডাঁশ মশা মারিতে না পারে।
মায়ে বাপে মারে যবে ওঝায়ে মারয়ে তবে
বাল্যভাবে ধূলা পঙ্কে ফিরে ॥
বিরোধেত সদা রত অশুচি ব্যাপার কত
নানাবিধ দুঃখ অনুভবে।
তরুণ হইয়া শেষে ধন লোভে দেশে দেশে
ভ্রমে পাপ করিবার তরে ॥

তারপর যৌবনের কথা—

মায়ায় মোহিত হৈয়া কাম ক্রোধ লোভ পাইয়া
পরহিংসা হিত হেন মানে।
পর ধন পর নারী হয়ে পাপী দুরাচারী
পত্নী পুত্র পালিতে করেণে ॥
নানাবিধ চিন্তা করে বৃথা অহঙ্কারে মরে
পুত্রাদির দুঃখে দুঃখী হয়।
সর্ব্বক্ষণ চিন্তে দুঃখ কোন ক্ষেণে নাই সুখ
কহি শুন যে চিন্তা করয় ॥

গৃহস্থের কর্ম্ম যত না করিনু অবিরত
কেমতে কুটুম্ব মোর জীব।
ঘরে মোর নাহি ধন দেবেনাদে বরিষণ
ঘোড়া গরু পলাইয়া যাইব॥
বালাপত্য ভার্য্যা মোর ধনহীন জন্ম মোর
অবিচারে কৃষি নষ্ট হৈল।
ভাঙ্গিল সকল ঘর বন্ধু হৈল দূরতর
রাজস্ব দিবারে না পারিল॥

তারপর বার্ধক্যের বর্ণনা—

তার পাছে বৃদ্ধ হয় শুক্ল কেশ দন্ত ক্ষয়
এবে পুনি নাহিক নিস্তার॥
চক্ষুয়ে না দেখে তবে জড়ায়ে পীড়িত যবে
কর্ণেহ যে কিছু নাহি শুনে।
করিয়াছে মহাপাপ স্ত্রী-পুত্র দেওয়ে চাপ
ধন হরি লয় অন্য জনে॥
তবে চিন্তা সর্ব্বক্ষণ মরি আমি কোনক্ষণ
ধন আমি কোথায় রাখিব।
আমি না থাকিলে ধন হরি নিব অন্যজন
পুত্রে মোর কোনমতে জীব॥

তারপর অন্তিমকাল—

এমত চিন্তয়ে যবে মৃত্যুয়ে গ্রসয়ে তবে
ব্যাধিয়ে পীড়িত কলেবর।
ক্ষণে শোতে ক্ষণে উঠে দিনে দিনে বল টুটে
ক্ষুধা তৃষ্ণা হয় বহু তর॥
তৃষ্ণায় পীড়িত যত তারে বা কহিব কত
এক বিন্দু জল দেও গেলে।

অধিক কাতর হৈয়া জল মাগে শুখাইয়া
অবিকলে পড়ে ভূমিতলে ॥
জল দেও কেহ বলে কেহ ধরি লয় কোলে
জল না দেয় কুপথ্য বলিয়া।
এহিরূপে থাকে পড়ি বন্ধু বর্গে যায় ছাড়ি
জ্ঞানহীন নিঃশব্দ হইয়া ॥
তবে দুঃখী হইয়া মন নিশ্বাসিয়া ঘনঘন
ঘোর ঘোর করি ছাড়ে প্রাণ।
তবে যমদূত গণে পাশে বান্ধি ততক্ষণে
লৈয়া যায় যমের সদন ॥

উপরের দৃষ্টান্ত থেকে ভাষার স্বচ্ছন্দ গতির পরিচয় পাওয়া যাবে। ভাষা এত সাবলীল যে অনুবাদ ব'লেই মনে হয় না। ছন্দ বেশির ভাগ পয়ার, মাঝে মাঝে ত্রিপদী। গ্রন্থের উপসংহার এরকম—

মহারাজা কল্যাণ মাণিক্য মহীপাল।
ত্রিপুর কুলেতে সে যে ধর্ম্ম অবতার ॥
সৎকীর্ত্তিয়ে রাজার ব্যাপিছে দিগন্তর।
দানে কল্পতরু রাজা বিষ্ণু সমোসর ॥
মহাধর্ম্মশীল তান তনয় প্রধান।
শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দ মাণিক্য পুণ্যবান ॥
পরম ধার্ম্মিক রাজা দানে কল্পতরু।
বিষ্ণুতে ভকতি তান অতিশয় গুরু ॥
পুরাণের অর্থ লোকে না বুঝে কারণ।
তাহার নিমিত্ত রাজা চিন্তিলেক মন ॥
বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণের সার।
ভাষা পদবন্ধে রাজা করিল প্রচার ॥

* * * * * * *

এতেক জানিয়া প্রজা প্রধান প্রধান।
জনে জনে লিখাইল পুথি একখান॥
শ্রীযুত দেবাই সে যে অতি বিচক্ষণ।
তাহান পাঁচালী এহি শুন সর্ব্বজন॥
বৃহন্নারদীয় নাম উত্তর পুরাণে।
আটত্রিংশ অধ্যায় হৈল সমাধানে॥

রাধাকিশোর মাণিক্যের আদেশে পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ হাতে-লেখা পুঁথি থেকে এ-গ্রন্থ সম্পাদন করেন। এর ভূমিকা লিখেছেন কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।

আধুনিক যুগ

বীরচন্দ্র মাণিক্য

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরায় নবযুগের সূচনা হয়। বীরচন্দ্র মাণিক্য শুধু যে সাহিত্য ও সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তা-ই নয়, তিনি নিজে একজন সুকবি ও সংগীত বিশারদ ছিলেন। তাঁর সভায় ভারতের শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ও যন্ত্রীর সমাবেশ ঘটেছিল। বিখ্যাত রবাবী কাশেম আলী খাঁ, সুরবীণ বাদক নিসার হোসেন, এস্রাজ বাদক হায়দর খাঁ, সেতার বাদক নবীনচাঁদ গোস্বামী, বেহালা বাদক হরিদাস, পাখোয়াজ বাদক কেশব মিত্র, পঞ্চানন মিত্র ও রাজকুমার বসাক, গায়ক ভোলানাথ চক্রবর্তী ও যদুনাথ ভট্ট তাঁর সভায় স্থায়িভাবে নিযুক্ত ছিলেন। যদুভট্ট যেমন সুগায়ক তেমনি সুকবিও ছিলেন। তিনি যখন কাশ্মীরে ছিলেন তখন কাশ্মীররাজ তাঁর গান শুনে বলেন—"আপনার দেশে একজন বাঙালী রাজা সংগীতে অসমান্য খ্যাতি লাভ করেছেন, আপনি কি তাঁকে স্বরচিত গান শোনান নি?" যদুভট্ট লজ্জিত হ'লেন। তারপরই কলকাতার রাজা দিগম্বর মিত্রের পরিচয়পত্র নিয়ে তিনি বীরচন্দ্রের দরবারে হাজির হন।

যদুভট্টের গানে মুগ্ধ হয়ে বীরচন্দ্র তাকে 'তানরাজ' উপাধি প্রদান করেন। এখনো কলকাতা কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে যদুভট্টের গানের সঙ্গে বীরচন্দ্র মাণিক্যের উল্লেখ দেখা যায়। ওপরে যাঁদের নাম করা হ'ল এঁরা ছাড়াও বিখ্যাত গায়ক ও বাদক দরবারে আসতেন। তাঁদের জন্যে বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল।

বীরচন্দ্র একাধারে কবি, গায়ক, বাদক ও চিত্রকর ছিলেন। তাঁর সময়ে প্রতি বছর রাজপ্রাসাদে চিত্রপ্রদর্শনী হ'ত।

শ্রীশ্রীঘনশ্যাম দাস বা নরহরি চক্রবর্তী সংকলিত 'গীতচন্দ্রোদয়' নামে পদাবলীগ্রন্থ রাজভাণ্ডারে রক্ষিত ছিল। বীরচন্দ্র নিজে তার সম্পাদনা আরম্ভ করেন। "অষ্টকাল—রাগানুরাগ" খণ্ড মাত্র ছাপা হয়। এরপর আর তিনি এ-কাজে অগ্রসর হ'তে পারেন নি। টীকা ও বাঙলা অনুবাদ সহ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচারের জন্য তিনি বহরমপুরের রামনারায়ণ বিদ্যারত্নকে একলক্ষ টাকা দেন। তাঁর অর্থে পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বারা অনেক মূল্যবান বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রচারিত হয়।

বীরচন্দ্র সুকবি ছিলেন। কিন্তু নিজের কবিতাপ্রচারে তাঁর একটা সংকোচ ছিল। কৈলাসচন্দ্র সিংহ লিখেছেন—"মহারাজ বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন। তিনি একজন সুকবি। তৎপ্রণীত দুইখানা কবিতাপুস্তক আমরা দর্শন করিয়াছি। উভয় গ্রন্থই গীতিকাব্য। * * * তাঁহার সমস্ত গীতিকবিতাই প্রেমের কাকলীপূর্ণ ও মধ্যে-মধ্যে দর্শনাত্মক ভাবের ছায়াপাতে সমুজ্জ্বল হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে এই সকল সুন্দর কবিতাকুসুমের সৌরভ আগরতলার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া কদাচিত কাহাকে-ও আকুলিত করিয়া থাকে। সেগুলি প্রকাশ করিতে মহারাজ নিতান্ত অনিচ্ছুক। কিন্তু প্রকাশিত হইলে তিনি বঙ্গীয় কবিসমাজে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইতেন সন্দেহ নাই।"

মহারাজের কবিতার মত তাঁর গানগুলি লোকসমাজে অপরিচিত ছিল না। এগুলি মজলিসে গাওয়া হত। তাই তাদের বহুল প্রচার হয়েছিল। তার একটি বিখ্যাত গান নিচে দেওয়া গেল। গানটি শ্রীরাধিকার রূপবর্ণনা।—

জয় জয়ন্তী—ঝাঁপ।

জয় জগত বন্দিনী
হরি হৃদয় রঙ্গিণী
ব্রজ রমণী মুকুটমণি রাধিকে শ্রীরাধিকে।

ঘন জঘন শোহিনী
গজহু বর গামিনী
চরুণরুচি তরুণাধিকে শ্রীরাধিকে ॥
মৃদু মধুর হাসিনী
রসময় সুভাষিনী
বদন কত ইন্দু শত-নিন্দিতে শ্রীরাধিকে ।
শ্যাম মনোমোহিনী
কান্তি জিনি দামিনী
রসিক ব্রজনাগর বিমোহিতে শ্রীরাধিকে ॥
সরস রস রঙ্গিনী
নিধুবন বিলাসিনী
শ্যাম সুখ সাধ সব সাধিকে শ্রীরাধিকে ।
চটুলতর চাহনি
মদন মুরছায়নী
ঘনবরণ হৃদয়মণি মালিকে শ্রীরাধিকে ॥
শ্যাম পট পিন্ধনে
শ্যাম চিত বন্ধনে
শ্যাম ঘন অঞ্জনহি লোচনে শ্রীরাধিকে ।
জয় কৃষ্ণ ভামিনী
জয় কৃষ্ণ সোহিনী
রটহুঁ বীরচন্দ্র নিতি আননে শ্রীরাধিকে ॥

আরেকটিতে আছে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা—

জয় জয়ন্তী—ঝাঁপ ।

নীল নব জলদ রুচি রুচি রুচির সুন্দর
পীত ধটি কটিতটে সুসাজে ।
মুকুট 'পরি খচিত শিখীপুচ্ছে নব মল্লিকা
বক্ষে বনমালা বিরাজে ॥

অধর 'পর বেণু তহিঁ মিলিত মুখ মোদনে
মধু মধু মধুর মোহ তানে।
শুনহি পশু পাখীকুল শাখীকুল পুলকিত,
তপন তনয়া বহ উজানে॥
শ্রবণযুগে মণিমকর গণ্ডে করু ঝলমল
মেহ'পর বিজরি যনু হাসে।
সহজে দৃক্ অঞ্চল জিনিয়া সরসীরুহ
তাহে কত কুসুমশর ভাসে॥
কেলি কদমকি তলে সুললিত ত্রিভঙ্গিয়া
নব-অরুণ চরণ-অরবিন্দ।
গোকুল কুল রমণীক মনসিজ সুমূর্তিময়
পেখব কি ললিত মতি মন্দ।

বীরচন্দ্রের আরেক নাম ছিল ললিতচন্দ্র।

এ রকম আরো অনেক বৈষ্ণব পদ মহারাজ রচনা করেন। তাঁর ছয়খানা কবিতার বই আছে। দু'খানা গানের বই, একখানা 'হোরি' আরেকখানা 'ঝুলন'। বাকি চারখানা বই কবির প্রেমের অভিব্যক্তি। বইগুলির পরিচয় নিচে দেওয়া গেল।—

হোরি—এটি দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে রচিত গীতিকাব্য। এতে চৌত্রিশটি হোলির গান আছে। তার একটির নমুনা—

রসে ডগমগ ধনী আধ আধ হেরি,
আচল সঞে ফাগ লেই কুঁয়রি।
হাসি হাসি রসবতী মদন তরঙ্গে
দেয়ল আবির রসময় অঙ্গে।
চতুর নাহ হৃদয়ে ধরু প্যারী
মুচকি মুচকি হাসি হেরত গোরী।
দেয়ত ফাগু নাহ লোচন-যোড়,
মুদল ধনী তুহুঁ নয়ন চকোর।

ইহ অবসরে কত চুম্বই কান,
বীরচন্দ্র রচ তুহুঁ রস গান ॥

আরেকটি গান—

ঐছে খেলত আজু সুরঙ্গ হোরি,
ইথ মোহন উথ কোঙরী গৌরী।
শ্যাম ছোড়ত যব রঙ্গ গোলারী
ভৈ গোলাল কি ঘটা আঁধেরী।
কেশব রঙ্গ ভরি লিয়ে পিচকারী,
মারত কি সখী সব ঔর গৌরী।
করলে দফ নাচতহুঁ কানাই
মধুমঙ্গল কাহুঁ দিতে হো ভাই।
সখী খেলত রসরঙ্গ অতি ভোরি,
লিয়ে সখীয়ান নাচত প্যারী।
সব সখীয়ানা দেই করতালি।
হরষ পরশ সব নিরখত দৌ,
বীরচন্দ্র দাস মগন মন রৌ।

ঝুলন—এতে পঞ্চাশটি ঝুলনের গান আছে। এ বইটি বীরচন্দ্রের প্রিয়তমা মহিষী ভানুমতী দেবীর মৃত্যুর অল্পদিন পরে লেখা। কবি লিখেছেন—

দেবি! তুমি ত স্বরগ পুরে
জানি নাকো কত দূরে
কোন অন্তরাল দেশে
করিতেছ বাস।
পশিতে কি পারে তথা
মানবের আশালতা
বিরহের অশ্রুজল
প্রাণভরা ভালবাসা।

হেথা আমি আছি পড়ে
হৃদয়ের ভাঙ্গা ঘরে
গুনিতেছি সারাদিন
জীবনের বেলা।
যেন রে উপল দেশে
সাথীহীন একা বসে
জানি না ফুরাবে কবে
এ মরতের খেলা।

ঝুলনের গানগুলি বড় সুন্দর। তার একটি গানের নমুনা—

বিনোদ হিল্লোলে বিনোদ নাগর
বিনোদিনীসহ ঝোলে
চারিদিকে মিলি বিনোদিনী দল
নাচয়ে বিনোদ তালে।
বিনোদ বিনোদ বাজিছে নূপুর
ঝুনু রুণু রুণু নাদে,
মুরজ মুরলী বীণা মুর চঙ্গ
বাইছে প্রমোদ মদে।
তা কৃতি তা কৃতি কৃতি থৈ থৈ
মধুর মুরজ বোলে।
মন্থর গতি পদকি চাল
সঘন মঞ্জীর বোলে।
গাইছে কিশোরী মুরলীর সহ
মিলায়ে মধুর স্বর,
মুরলী থুইয়া চিবুক ধরিয়া
চুম্বয়ে নাগরবর।

কমলে মধুপ যৈছন শোভত
তুহুঁ মুখ শোভা তায়,
পরাণ ভরিয়া দাস বীরচন্দ্র
ও রস মাধুরী গায়।

নিচের পদটি গৌরচন্দ্রিকা—

দেখ রে রঙ্গ, গৌরচন্দ্র ঝোলে অপরূপ ভাতিয়া,
অনুপমরূপ নাহিক স্বরূপ
প্রভাত অরুণ জিনিয়া।
সুরঙ্গ হিন্দোল অতি ঝলমল
ঝুলায় ভকত মিলিয়া,
সঘন আনন্দে করু জয়ধ্বনি
যতেক নদীয়া বাসিয়া।
করু নব রসে গৌর কিশোর
কুটিল কটাক্ষ রঙ্গিয়া,
নদিয়া নাগরী হেরি ও মাধুরী
বিবশ বদনে মাতিয়া।
ঝুলতহি পহুঁ আনন্দ হিল্লোলে
কত কোটী কাম জিনিয়া,
পহুঁ গুণ গান আনন্দে গাওত
দীন বীরচন্দ্র দাসিয়া।

আরো কয়েকটি সুন্দর পদ নিচে দেওয়া গেল—

বরষা সময়ে চাঁদনী রাতি,
ঘন আবরণে মলিনা ভাতি।
নবজলধর হরষে বরষে,
মত্ত দাদুর ডাকয়ে হরষে।
তমালের ডালে শিখিকুল নাচে,
রমণী হৃদয় রমণ যাচে।

গরজে বারিদ চমকে চপলা,
থর থর কম্পে নবীনা বালা।
নাগরী সঙ্গে নাগর ঝুলে
ঈষত ঈষত নূপুর বোলে।
এ হেন সময়ে বীরচন্দ্র দাস
যুগল মিলন নিরখিত আশ।

নিচের পদটি ঝুলনের পরের অবস্থা—

থামাইয়া দোলা রাধাশ্যাম দুহুঁ
শ্রমজলে ভাসি যায়,
শ্রীরতি মঞ্জরী শ্রান্তি দূর করে
মৃদুল চামর বায়।
ললিতাদি সখী নিছি নামাইল
কুসুম আসনে রাই,
রাই বামে করি বসিল নাগর
সুখের অবধি নাই।
শ্রীরূপ মঞ্জরী সেবায় মগন
যে যেমন ভাল জানে
কেহুঁ আনে জল বাসিত শীতল
উপহার কেহুঁ আনে।
কর্পূর বাসিত সুরস তাম্বুল
বিশাখা দিল যে মুখে
সখীর ইঙ্গিতে দাস বীরচন্দ্র
পদসেবা করে সুখে।

বীরচন্দ্রের ভণিতার মধ্যেও নৈপুণ্য রয়েছে। নিচের পদটিতে ভণিতার কৌশল প্রশংসনীয়।—

সুবাসে বাসিত সুখের নিকুঞ্জ
গুঞ্জরে মধুপ তায়,
শ্যাম রাই পানে তৃষিত নয়নে
রাই শ্যাম পানে চায়।
বুঝিল চতুরা বিশাখা ললিতা
বলিল মুচকি হাসি,
শ্যাম সিন্ধু মাঝে রেখে এ রতন
আসি বঁধু তবে আসি।
রেখো বুকে বুকে যক্ষের যতনে
মোদের এ ধন রাই।
কাল এসে বঁধু দেখো দেখো যেন
খুঁজে এ রতন পাই।
দারিদ মাণিক পাইল নাগর
বসিল ঘেসিয়া কাছে।
হাসি সখীগণ ত্বরা পলাইল
বীরচন্দ্র সব পাছে।

এখানে কবি অতি সন্তর্পণে সখীর দলে মিশে গেছেন।

মহারানী ভানুমতি দেবীর মৃত্যুর শোক বীরচন্দ্রের প্রাণে শেলের মত বিদ্ধ হয়েছিল। দুঃখের দিনে কবি রাধাকৃষ্ণের চরণাশ্রয় ভিক্ষা করেছেন, আর প্রার্থনা করেছেন তাঁর মোহজাল যেন ছিন্ন হয়। 'ঝুলন'-এর সমাপ্তি সংগীতে এই মনোভাবই ফুটে উঠেছে। গানটি কবির মনোবেদনার সকরুণ অভিব্যক্তি।—

অহে রাধ্যাশ্যাম,
আজি কি সুখের দিন ঝুলন মঙ্গল হে,
ভাবমাখা সরস চাহনি,
যুগল অধরে হাসি শ্রীঅঙ্গে পুলক নাথ
মন সহ ঝুলন দোলনি।

রাধাশ্যাম,

আগে এ সুখের দিনে　অভাগিয়া কত হে
পূজিয়াছি ঐ রাঙা পায়,
দুনয়নে সুখধারা　বহিত হিল্লোলে নাথ
প্রেম ঢেউ খেলিত হিয়ায়।

রাধাশ্যাম,

বিধাতা ব্যাধের মত　আসি চুপি চুপি হে
সাতনলা বাড়ায়ে বাড়ায়ে,
দারুণ সন্ধান তার　শূন্য সব দিক নাথ
এবে একা আঁধারে দাঁড়ায়ে।

রাধাশ্যাম,

বাসনাবাঁশরী তানে　বিধি নিরদয় হে
পরাণ কুরঙ্গে ভুলাইল।
আনি বিষয়ের দেশে　পুন বেড়াজালে নাথ
ঘেরি বাণ মরমে হানিল।

রাধাশ্যাম,

পাঁজরে বিষের জ্বালা　হিয়ায় অনল হে
ঝলকে ঝলকে উঠে জ্বলে,
উঠিতে পড়িয়া যাই　পায়ে মোর বাঁধা নাথ
বিষয়ের বিষম শিকলে।

রাধাশ্যাম,

কাটি এ করম ডোর　বজরের বাঁধ হে
বীরচন্দ্র দাসে রাখ পায়,
যে ক'দিন বাঁচি আর　শ্রীবৃন্দাবিপিনে নাথ
থাকি যেন যুগল সেবায়।

প্রেম মরীচিকা—মহারানী ভানুমতী দেবীর মৃত্যুর পর প্রেমিক কবির মর্মবেদনা এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে অনুরণিত হয়েছে। এর একটি কবিতার নমুনা—

সে মধু বাতাসে যেন উঠিছে বাজিয়া
জীবনের নিদ্রিত বাঁশীটী ;
আজি ভালবাসা যেন সাথীহারা পাখী
কাঁদিছে বাজিছে একেলাটী !
র'য়ে র'য়ে এখনো কি উঠিস্‌রে ডেকে—
সাড়া দিবে কেবা আর আছে ?
যা ছিল সকলি গেছে এবে একা আমি
কেনরে আসিস্‌ মোর কাছে ?

এরপর বীরচন্দ্রের জীবনে আরেক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এসময় তিনি মহারানী মনোমোহিনীকে বিবাহ করেন। নতুন মহিষীর মনোরঞ্জনের জন্য প্রেমিক বীরচন্দ্র তিনখানা গ্রন্থ রচনা করেন। এদের পরিচয় নিচে দেওয়া গেল—

উচ্ছ্বাস—নাম থেকেই বোঝা যায় এটি প্রেমের উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। প্রচ্ছদপটে বিদ্যাপতির 'আজি মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ' পদটি উদ্ধৃত হয়েছে। দীর্ঘদিনের মর্মদাহের পর কবির অন্তরে আবার দখিনা বাতাস বইতে শুরু করেছে—এভাবের কবিতায় বইটি ভরা। অতীতের স্মৃতি ও বর্তমানের সুখ, এক অপূর্ব আনন্দ-বেদনার বিচিত্র অনুভূতি কবিমনকে আচ্ছন্ন করেছে। তিনি লিখছেন,

সখিরে,—
উঠিছে পড়িছে আজি কত
দুঃখের সুখের কথা হৃদয় নিভৃতে মোর
আধ আধ আবছায়া মত।

আধ দুখে আধ সুখ ছিল আবরিয়া
কি যেন মেঘের কোলে জোছনা রাখিয়া
*　　*　　*
সুখে দুখ গিয়াছে ডুবিয়া
দুঃখের হৃদয়ে আজি　　নেশার আধেক ঘোরে,
রহিয়াছে কি সুখ ছাইয়া !
নয়নে ভাসিছে কত সুখের স্বপন,
পাইয়া তোমার সেই সুখ সম্মিলন !

অকালকুসুম—এ বইটিতে মহারাজের নববিকশিত প্রেম কুসুম নিয়ে মালা গাঁথা হয়েছে। বইটি উপহার দেওয়া হয়েছে মহারানী মনোমোহিনীকে। উপহার দিতে গিয়ে কবি লিখছেন—

প্রেয়সিরে—

গেঁথেছি তোমার লাগি　　বিরলে বসিয়া আমি
যে সাধের মালা
উজ্জল মাণিক নহে—　　নহে যুঁই—নহে বেলি
রূপে গন্ধে নাহি করে আলা।

নিজের কবিতার দীনতা জেনেও কবি সাধ ক'রে তাঁর প্রিয়তমাকে এই মালা উপহার দিয়েছেন। কারণ,—

ভালমন্দ নাহি জানি　　গাঁথিয়া পেয়েছি সুখ
রূপে গুণে তোমারি মতন
তাই এত করেছি যতন।

সোহাগ—এটি-ও মহারানী মনোমোহিনীকে উপহার দেওয়া হয়েছে। এর কবিতাগুলিও প্রেমের কাকলী। নতুন মহারানীকে পেয়ে কবি মনে শান্তি পেয়েছেন। কিন্তু প্রথম যৌবনের সেই মাদকতা আর নেই, থাকতে পারে না। সেই বিগত দিনগুলি কবির স্মৃতিপটে অম্লান হ'য়ে আছে, তিনি তাদের ভুলতে পারেন নি। তাই লিখেছেন—

মানবের নব প্রথম পিরীতি
তরুণ নূতন কুসুম মত,
চিরকাল মনে রহে জাগরিত
পরের পিরীতি রহে না তত।
সেই সুধাময় নবীন পিরীতি
জনম নবীন যৌবন সনে ;
তাই চিরদিন পিরীতি মুরতি
দেবতার মত জাগয়ে মনে।

এছাড়া বীরচন্দ্রের আরো কয়েকটি বই ও অনেকগুলি কবিতা ছিল। সেগুলি এখন পাওয়া যায় না। বীরচন্দ্র ত্রিপুরায় যে সাহিত্য সংগীতের ধারা প্রবাহিত করেছিলেন তার স্পর্শে রাজপরিবারের লোকেরা এবং জনগণের অনেকেই সঞ্জীবিত হয়েছিলেন। কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত লিখেছেন—"মহারাজ বীরচন্দ্রের কবিত্ব প্রতিভা সকলেরই অনুকরণীয় হইয়াছিল। রাজপরিবারের কুমার কুমারীগণ, ঠাকুর পরিবারস্থ ব্যক্তিবৃন্দ এবং রাজধানীবাসী অনেকেই সেকালে বঙ্গবাসীর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। এমন কি অসভ্য কুকি সমাজেও কবিতা রচনার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়াছিল ; কুকিরাজ বাণ খাম্পুইর রচিত কবিতাই এ কথার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।"

বীরচন্দ্রের সময়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ ঘটে। মহিষী ভানুমতী দেবীর মৃত্যুর পর শোকসন্তপ্ত কবি বীরচন্দ্র নিজের মর্মবেদনা কবিতায় গেঁথে রাখছিলেন। এমন সময় রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্নহৃদয়' প্রকাশিত হয়। প্রিয়াবিরহে কাতর বীরচন্দ্র 'ভগ্নহৃদয়ে'র কবিতাগুলির মধ্যে নিজের মনের সুর শুনতে পেলেন। তিনি তখনি তাঁর একান্ত সচিব রাধারমণ ঘোষকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন এই তরুণ কবিকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে। তখনকার অখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ এক অভাবনীয় অভিজ্ঞতা। জীবন স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"মনে আছে এই লেখা বাহির হইবার কিছুকাল পরে কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের মন্ত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। কাব্যটি মহারাজের ভাল লাগিয়াছে এবং কবির সাহিত্য সাধনার সফলতা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন, কেবল এইটি জানাইবার জন্যই তিনি তাঁহার অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।"

দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বীরচন্দ্রের উৎসাহে ও অর্থ সাহায্যে প্রকাশিত হয়। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ দীনেশচন্দ্র এই গ্রন্থ বীরচন্দ্র মাণিক্যের নামে উৎসর্গ করেছেন।

কৈলাস সিংহের রাজমালা

বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময়ে কৈলাসচন্দ্র সিংহ 'রাজমালা' নামে আরেকটি গ্রন্থ লেখেন। এটি ত্রিপুরার ইতিহাস। গ্রন্থটি গদ্যে লেখা। লেখকেরা তিন পুরুষ যাবৎ ত্রিপুরার রাজসরকারে কর্মচারী ছিলেন। এই সূত্রে ত্রিপুরার ইতিহাসের সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—

"এই সময়ে ত্রিপুর সিংহাসনের অধিকারিত্ব লইয়া মৃত মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাতুরের একমাত্র জীবিত পুত্র কুমার নবদ্বীপচন্দ্র বাহাতুরের সহিত বর্ত্তমান মহারাজের কলহ উপস্থিত হয়। আমি কুমার বাহাতুরের পক্ষ অবলম্বন করি; তাঁহার সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সম্পাদন ভার আমার হস্তে বিন্যস্ত হইয়াছিল। ত্রিপুরেশ্বরদিগের বিস্তৃত জমিদারি, চাকলে রোশনাবাদে স্বীয় স্বত্ব সংস্থাপন জন্য কুমার বাহাতুর ব্রিটীস্ বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই মোকদ্দমা আমার দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। তৎকালে ত্রিপুরার ইতিহাসের যে সামান্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তদ্দ্বারা ১২৮৩ বঙ্গাব্দে রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত নামক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করি। * * * বিস্তৃত ভাবে ত্রিপুরার ইতিহাস প্রচার করিব বলিয়া সেই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে বিরত ছিলাম, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র পুস্তক বক্ষ্যমান গ্রন্থের অংশ বিশেষের কঙ্কাল স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে।"

এ-রাজমালা শুধু রাজকাহিনী নয়, যথার্থ রাজ্যের ইতিহাস। গ্রন্থটি চারভাগে বিভক্ত।

প্রথম ভাগ—প্রথম ভাগে ত্রিপুরার প্রাকৃতিক দৃশ্য, অর্থনৈতিক অবস্থা, আরণ্যক জীবজন্তু, বিভিন্ন অধিবাসী, তাদের সামাজিক রীতি-নীতি ও ধর্মীয় আচার ব্যবহারের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া রয়েছে।

ত্রিপুরার প্রধান অধিবাসী ত্রিপুরীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন, এরা চার শাখায় বিভক্ত।—তিপ্রা, জমাতিয়া, নওয়াতিয়া ও রিয়াং।

তিপ্রা—এই শাখা থেকেই বর্তমান রাজবংশের উদ্ভব। এটাই পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মত। রেনল্‌ড সাহেব লিখেছেন: "আকৃতি-দ্বারা তিপ্রাগণ খাসিয়া দিগের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি বলিয়া বোধ হয়।" লেখকের মতে তিপ্রা ও কাছাড়ীগণ শ্যানবংশের দুই শাখা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি 'ফা' উপাধির উল্লেখ করেছেন। শ্যান, ব্রহ্মা প্রভৃতি জাতির ভাষায় 'ফ্রা' উপাধির অর্থ প্রভু। এই 'ফ্রা' শব্দেরই অপভ্রংশ 'ফা'।' ত্রিপুরার রাজারা অনেকেই আগে 'ফা' উপাধি ধারণ ক'রে গেছেন। পরে রত্ন মাণিক্যের সময় থেকে 'মাণিক্য' উপাধি আরম্ভ হয়। সিংহ মহাশয় বলেন, কল্যাণ মাণিক্যের পূর্ব পর্যন্ত রাজা ছাড়া রাজবংশীয় আর সবাই 'ফা' উপাধি ধারণ করতেন। কল্যাণ মাণিক্য তাদের 'ঠাকুর' উপাধি দান করেন।

তিপ্রাগণ কয়েকটি 'দফা' বা শাখায় বিভক্ত।—

(১) তিপ্রা, (২) বাছাল, (৩) দৈত্যসিং, (৪) কুওয়াতিয়া, (৫) সিউক, (৬) ছএতিয়া, (৭) গালিম, (৮) আপাইয়াছা, (৯) ছিলটিয়া, (১০) সেনা।

জমাতিয়া—এরা তিপ্রা বংশের একটি শাখা। প্রাচীনকালে এরা ত্রিপুরার প্রধান সৈন্য ছিল। ১২৭৩ ত্রিপুরাব্দে রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক'রে এরা পরাস্ত হয়। তারপর এরা নিরীহ কৃষকে পরিণত হয়েছে। এরা বাঙালীর মত হাল চাষ ক'রে কৃষিকার্য করে।

নওয়াতিয়া—মগজাতির সঙ্গে তিপ্রাদের মিশ্রণে নওয়াতিয়া বা নূতন তিপ্রা জাতির উদ্ভব হয়েছে। এরা নিরীহ প্রকৃতিসম্পন্ন।

রিয়াং—এরা কুকিদের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি ব'লে বোধ হয়। চার দফার মধ্যে এরা সব চাইতে উগ্র।

ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি—ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি নিয়েও লেখক আলোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে অনেক মত আছে। কারো কারো মতে ত্রিপুরাসুর থেকে কিংবা তার নির্মিত পুরী তিনটি থেকে ত্রি পুরা নামের উৎপত্তি। অথবা ত্রিপুরা সুন্দরীর নাম থেকে এর নামের উদ্ভব। কিংবা রাজবংশের স্থাপয়িতার নাম অনুসারে দেশের নাম হয়েছে ত্রিপুরা। কিন্তু কৈলাসচন্দ্র এসব মতের বিরুদ্ধে অভিমত প্রচার করেছেন। তিনি বলেন—"যে অনার্য্য কিরাতদিগকে আমরা 'তিপ্রা' (ত্রিপুরা) আখ্যায় পরিচিত করিয়া থাকি তাহাদের জাতীয় ভাষায় জলকে "তুই" বলে। এই তুই শব্দের সহিত 'প্রা' সংযুক্ত করিয়া 'তুইপ্রা' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেই তুইপ্রা হইতে তিপ্রা, এবং তিপ্রা হইতে ক্রমে তৃপুরা, ত্রীপুরা ও ত্রিপুরা শব্দের উৎপত্তি।"

বাসস্থান—তিপ্রাগণ সাধারণতঃ পাহাড় অঞ্চলে বাস করে। সেখানে বাঁশের মাচার ওপর এক ধরণের ঘর তারা তৈরি করে। ওই ঘরকে টং বলে। মাচার ওপর তারা নিজেরা থাকে আর নিচে থাকে তাদের গৃহপালিত পশুর দল। ওদের এক একটি বাড়ি এক একটি ছোট গ্রামের মত, তাকে পাড়া বলে। এক বাড়িতে অনেকগুলি পরিবার বাস করে। প্রত্যেক বাড়ির এক এক জন সর্দার থাকেন। তাঁরা রাজসরকার থেকে চৌধুরী, কবরা, পোয়াং, সেনাপতি প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত হন। ছোটখাটো অপরাধের বিচার সর্দাররাই ক'রে থাকেন। এরা বাড়ির কাছে কুয়ো খনন ক'রে তার জল পান করে।

জুম চাষ—ত্রিপুরার আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য জুম চাষ। এখানকার পাহাড়ী লোকেরা হালচাষ করতে জানে না। এক আদিম উপায়ে তারা শস্য ফলায়। পৌষ মাঘ মাসের মধ্যে একটি বাড়ির স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সবাই মিলে জঙ্গল কাটতে রওনা হয়। জঙ্গল কেটে বেশ একটি বড় জায়গা পরিষ্কার করা হয়। তারপর প্রায়

মাসখানেক এটা ফেলে রাখে। এক মাসের রোদে বন জঙ্গল সব শুকিয়ে যায়। তখন চৈত্র মাসে এতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই ছাই পড়ে মাটি বেশ উর্বর হয়। তারপর 'টাককাল' নামে এক রকম দা দিয়ে ছোট ছোট গর্ত খুঁড়ে সেখানে ধান, কার্পাস, ফুটি, কাঁকুড়, তরমুজ, মরিচ, ভুট্টা ও নানারকমের তরকারির বীজ একত্র রোপণ করে। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ক্ষেতটা বেছে পরিষ্কার করে। এ সময় ভুট্টা, ফুটি, কাঁকুড় পেকে যায়। শ্রাবণ মাসে ধান বের হয়। তারপর কার্তিক মাসে কার্পাস ও তিল সংগ্রহ করা হয়। বন্য জন্তুর হাত থেকে শস্য রক্ষার জন্য প্রত্যেক জুমেই একটি ক'রে 'টং' ঘর তৈরি করা হয়। এদের জুমচাষের সময় বীজবপন শস্যকর্তন প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন গান রয়েছে। সেই গান গেয়ে ওরা কাজ করে। পাহাড়ীয়া ভাষায় এই গানগুলি রচিত।

বিবাহ—এদের মধ্যে দুই রকমের বিবাহ প্রচলিত—হিক্‌নানানী ও কাইজগ্‌নানী।

হিক্‌নানানী বিবাহই আদিম প্রথা। এটা গান্ধর্ব বিবাহ। এতে কোন আচার অনুষ্ঠিত হয় না। বর কনে পরস্পরকে স্বামীস্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেই বিয়ে সম্পন্ন হ'ল। এতে শুধু একটা সামাজিক ভোজ দিতে হয়। দরিদ্র বা অক্ষম লোকদের তা-ও দিতে হয় না।

কাইজগ্‌নানী বিবাহ অভিভাবকদের প্রস্তাব অনুসারে সম্পন্ন হয়। এই বিবাহের নিয়ম হলো বিবাহের আগে অন্তত এক বছরের জন্য বর শ্বশুরবাড়িতে থেকে কাজকম করবে। তখন বরকনে স্বামাস্ত্রীর মতই থাকতে পারে। তারপর নির্দিষ্ট দিনে লামপ্রা দেবতার পুজো হয়। তাতে শুয়োর ও মুরগী প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। কনের মার দেওয়া একপাত্র মদ কনে অর্ধেক পান করে বরকে দেবে, বর সেটা পান করলেই বিবাহ সম্পন্ন হ'ল। তারপর আত্মীয় স্বজনের খাওয়া দাওয়া ধুমধাম চলতে থাকে। বিবাহের পরদিন সকালে বর অন্তস্থানে

চ'লে যায়। তারপর আবার কয়েকদিন পরে ফিরে আসে। আমাদের ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের প্রভাবে কাইজগ্নানী বিবাহ অনেকাংশে বাঙালীদের বিবাহের মত হ'য়ে গেছে।

বিধবা বিবাহ—তিপ্রাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, বিবাহ-বিচ্ছেদও রয়েছে। স্বামীস্ত্রীর মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হ'লে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের বিচার হয়। কোন পক্ষ এতে অসম্মত হ'লে রাজদরবারে হাজির হ'তে পারে। তারপর বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। বিচ্ছেদের পর পরিত্যক্তা স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করে।

দেবতা—এরপর লেখক তিপ্রাদের দেবতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি এক নতুন মত প্রচার করেছেন। ত্রিপুরার লোকের প্রধান উপাস্য চতুর্দশ দেবতা। এঁরা ত্রিপুর রাজবংশের কুলদেবতা। বর্তমান আগরতলা সহর থেকে তিন মাইল দূরে পুরান আগরতলায় এই চৌদ্দ দেবতার মন্দির। এঁদের সম্পূর্ণ কোন মূর্তি নেই, চৌদ্দটি দেবতার মাথা শুধু। "রাজমালিকা" গ্রন্থে ও সংস্কৃত রাজমালায় দেবতাদের নাম দেওয়া আছে। এঁরা হচ্ছেন—শিব, দুর্গা, হরি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, ব্রহ্মা, পৃথিবী, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, কামদেব ও হিমালয়।

কিন্তু কৈলাসচন্দ্র সিংহের মতে এই চৌদ্দ দেবতা মূলত পাহাড়ীদের দেবতা। পরে হিন্দুসভ্যতার সংস্পর্শে এসে পাহাড়ীদের দেবতারাও হিন্দুত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। ত্রিপুরার আদিবাসী তিপ্রাদেরও প্রধান উপাস্য চৌদ্দটি দেবতা। এদের ভাষায় দেবতাকে বলে মতই।

নিচে দেবতাদের পরিচয় দেওয়া হ'ল।—

মতইকতর—মতই মানে দেবতা, কতর মানে শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ মতই কতর মানে মহাদেব। তিপ্রাগণ কিরাত জাতি। মহাদেব যে এই কিরাত জাতির প্রধান উপাস্য ছিলেন সেটা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রেও স্বীকৃত। কিরাতদের এই মতই কতরই বোধ হয় আমাদের পুরাণে মহাদেব রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

লামপ্রা—খাব্বি (আকাশ ও সমুদ্র)—এরা দেবতা। সব রকম মাঙ্গলিক কাজে লামপ্রা পুজো হয়।

সাংগ্রমা—হিমাদ্রি। চৌদ্দটি দেবতার মধ্যে লামপ্রা ও সাংগ্রমার পুজোই সর্বদা হয়ে থাকে।

তুইমা—গঙ্গা। অঘ্রান মাসে বিশেষ ক'রে তুইমা পুজো হয়। কারো কোন অসুখ হ'লে নদীতে তুইমার পুজো দিয়ে ওঝাই (পুরোহিত) বলে যে অমুক দেবতা আক্রমণ করেছেন। তখন ওই দেবতার পুজো দেওয়া হয়।

মাইলুমা—ধানের দেবতা। এর কৃপায় ধান হয়।

খুলুমা—কার্পাসের দেবতা। এর কৃপায় কার্পাস জন্মে।

বুড়াছা—রোগশান্তির জন্য এই দেবতার পুজো দেওয়া হয়।

বনিরাও ও থনিরাও—এরা দুজন বুড়াছার পুত্র।

বুড়িরক—এরা সাত বোন। তাই এদের নাম 'সাত বইন পরি।' এদের ছ'জন বিবাহিতা। কনিষ্ঠা অবিবাহিতা। তিনি মানুষ নিয়ে খেলা করেন।

গরাইয়া ও কালাইয়া—এরা দুই ভাই। চৈত্র-সংক্রান্তিতে এদের পুজো হয়। গ্রামের সবাই এই পুজোয় যোগ দেয়। তখন তারা মদ খায় আর নাচগান করে। ত্রিপুরীরা সব পুজোতেই দুটি বাঁশের চোঙ ব্যবহার করে। এদের একটিতে থাকে জল, আরেকটিতে থাকে মদ। তা'দের জাতীয় ভাষায় মন্ত্র প'ড়ে জল ও মদ দেবতাকে প্রদান করে। এরা মোরগের ও হাঁসের ছানা, শুয়োর, পাঁঠা প্রভৃতি বলি দেয়।

কৈলাসচন্দ্র মনে করেন ত্রিপুরীদের এই জাতীয় দেবতারাই প্রকৃত চৌদ্দ দেবতা। পুরান আগরতলায় এঁদেরই মন্দিরে। কালক্রমে এরা হিন্দুসমাজে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে হিন্দু দেবদেবীর আখ্যা লাভ করেছেন।

পুরোহিত—ত্রিপুরীদের জাতীয় পুরোহিতদের নাম ওঝাই। চৌদ্দ দেবতার প্রধান পুরোহিতকে চন্তাই বলে। তার অধীন পূজকদের নাম গালিম। পুরোহিতদের মধ্যে বংশগত নিয়ম নেই। পুরোহিতের ছেলে পুরোহিত হ'বে এমন কোন কথা নেই। মন্ত্র প্রভৃতি শিখলে যে কোন সাধারণ তিপ্রা ওঝাই ও গালিম হ'তে পারে। প্রধান গালিম চন্তাই হয়ে থাকেন।

ভাষা—ত্রিপুরীদের একটি পৃথক ভাষা আছে। কিন্তু এটি লেখ্য ভাষা নয়। কাছাকাছি অন্যান্য পার্বত্য জাতির ভাষার সঙ্গে তার সাদৃশ্য রয়েছে। কালক্রমে অনেক বাঙলা শব্দ এদের ভাষায় প্রবেশ করেছে।

রাজবংশ—এরপর ত্রিপুরার রাজবংশের উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক। প্রাচীন রাজমালায় আছে—

শুন শুন মহারাজ হইয়া সাবধান।
তোমার বংশের কথা করিছি বাখান॥
চন্দ্রবংশে মহারাজ যযাতি নৃপতি।
নিজ বাহুবলে শাসে সপ্তদ্বীপ ক্ষিতি॥
তান পঞ্চপুত্র হৈল যেন কল্পতরু।
যদু তুর্ব্বসু আর দ্রুহ্যু অনু পুরু॥
শুক্র কন্যা দেবযানীর দুই হইল পুত।
রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠার হৈল তিন সুত॥

* * * *

বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা তনয়।
দ্রুহ্যু নামে রাজা হৈল ইন্দ্রের আলয়॥

প্রাচীন রাজমালার মতে যযাতির জরাভার গ্রহণ না করায় দ্রুহ্যু নির্বাসিত হয়ে ত্রিপুরায় এসে উপস্থিত হন। তাঁর থেকেই ত্রিপুর রাজবংশের উৎপত্তি।

কিন্তু কৈলাসচন্দ্র সিংহ এ-মত খণ্ডন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, যযাতির পঞ্চপুত্রের উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। অথচ এটা ঐতিহাসিক সত্য যে "ঋগ্বেদ রচনাকালে বঙ্গভূমি সমুদ্র গর্ভে শায়িত কিংবা শ্বাপদ জন্তুর বাসস্থল ছিল!" কাজেই দ্রুহ্যুর পক্ষে ত্রিপুরায় উপনিবিষ্ট হ'বার প্রশ্নই ওঠে না।

লেখকের স্পষ্ট অভিমত ত্রিপুরার রাজবংশ ত্রিপুরী বা তিপ্রা জাতি থেকে উদ্ভূত। তাই ব'লে ত্রিপুর রাজবংশের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে তাঁর মনে কোন সংশয় নেই। তিনি বলেছেন—"আমরা বারংবার বলিয়াছি, ত্রিপুর রাজবংশ অতি প্রাচীন, এরূপ প্রাচীন বংশ ভারতে দ্বিতীয় নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহারা হিন্দু সমাজে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশ ক্রিয়াকলাপ হিন্দু শাস্ত্রানুসারে হইতেছে; কিন্তু ত্রিপুরাদিগের জাতীয় ব্যবহার তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন নাই।"

বিবাহ—রাজবংশে তিন রকমের বিবাহ প্রথা রয়েছে। ব্রাহ্ম, শান্তিগৃহীতা ও কাছুয়া। ব্রাহ্ম বিবাহ বাঙালীদের মত। এতে পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ, অভিভাবকের কন্যা সম্প্রদান সবই আছে। শান্তিগৃহীতা বিবাহে সম্প্রদান নেই। বরকনে একত্র ব'সে মালা বদল করে আর পুরোহিত তাদের মন্ত্রপূত শান্তিজলে অভিষিক্ত করেন। কাছুয়া বিবাহ তিপ্রাদের হিক্‌নানানী বিবাহ। এতে কোন আচার অনুষ্ঠানের বালাই নেই। বরকনে পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করলেই বিবাহ সিদ্ধ হ'ল। ব্রাহ্ম ও শান্তিগৃহীতা বিবাহের রানীগণ বিবাহের পর থেকেই 'মহারানী', 'মহাদেবী' বা 'ঈশ্বরী' উপাধি প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। কিন্তু কাছুয়া বিবাহের পত্নীরা তা পান না। রাজা তাঁদের এ-উপাধি দান না করলে তাঁরা মহারানী উপাধি ধারণ করতে পারেন না। কাছুয়া বিবাহের পত্নীদের মর্যাদা খানিকটা কম হ'লেও তাঁদের পুত্রেরা রাজা হ'তে পারেন। ত্রিপুরার কোন কোন মহারাজের মাতা কাছুয়া ছিলেন।

ধর্ম—ত্রিপুরার প্রাচীন রাজগণ শৈব ও শাক্ত ছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে কাছাড় পর্যন্ত অনেক শিব ও কালীমন্দির তাঁদের প্রতিষ্ঠিত। দেবতামুড়ার পাহাড়ের গায়ে শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতির মূর্তি রয়েছে। চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ শিব ও ত্রিপুরাসুন্দরী কালীমূর্তি ত্রিপুর রাজগণের অক্ষয় কীর্তি। রাজধর মাণিক্যের সময়ে নিত্যানন্দের বংশধর গোস্বামী-গণ রাজবংশকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। কিন্তু তাঁদের শাক্তভাব দূর হয়নি। তা ছাড়া তিপ্রাদের আদিম দেবতাদের পুজোও হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় ভাগ—রাজমালা দ্বিতীয় ভাগে ত্রিপুরার প্রাচীন রাজাদের থেকে আরম্ভ ক'রে বীরচন্দ্র মাণিক্য পর্যন্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরার প্রাচীন মহারাজদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে আমরা প্রাচীন রাজমালা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। আলোচ্য গ্রন্থে বীরচন্দ্র মাণিক্যের বিবরণটি বিশেষ মূল্যবান।

ত্রিপুর সিংহাসনের অধিকার নিয়ে মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের পুত্র কুমার নবদ্বীপচন্দ্র বাহাদুরের সঙ্গে বীরচন্দ্র মাণিক্যের বিবাদ উপস্থিত হয়। ব্যাপার হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। এই গৃহ বিবাদের বিস্তৃত বিবরণ আলোচ্য রাজমালায় পাওয়া যায়।

বীরচন্দ্রের শাসন নীতির সমালোচনাও এই গ্রন্থে রয়েছে। তা ছাড়া মানুষ বীরচন্দ্রের স্পষ্ট রূপটি ও আমরা তার থেকে পেতে পারি। লেখক বলছেন—

"মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের আকৃতি নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর, তিনি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, মুখশ্রী অনেকটা বাঙ্গালির ন্যায়, চক্ষু সুন্দর, নাসিকা উন্নত।

মহারাজ বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন, তিনি একজন সুকবি, তৎপ্রণীত দুইখানা কবিতা পুস্তক আমরা দর্শন করিয়াছি।

* * * * * *

মহারাজ উর্দ্দু ও মণিপুরী ভাষায় মাতৃভাষার ন্যায় আলাপ করিতে পারেন। ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষা সামান্য রূপ অবগত

আছেন। তিনি একজন সুনিপুণ চিত্রকর ও ফটোগ্রাফার; সঙ্গীত শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। তিনি পানাদি দোষ বর্জিত, বুদ্ধিমান, কূটনীতি-পরায়ণ ও অত্যন্ত বাক্‌পটু। তাঁহার বাক্যন্যাস শক্তি এইরূপ প্রবল যে তৎপ্রতি ভীষণ বিদ্বেষ ভাবাপন্ন কোন ব্যক্তি ক্ষণকাল তাঁহার সহিত আলাপ করিলে সেই ভাব পরিত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি স্বীয় কার্যকলাপের প্রতিবাদ সহ্য করিতে অক্ষম হইলেও তাঁহার ক্রোধ সংবরণ শক্তি এত অসাধারণ যে তাহা সহজে কেহ উপলব্ধি করিতে পারেন না।"

প্রয়োজনবোধে মহারাজের বিরূপ সমালোচনা করতেও লেখক কুণ্ঠিত হন নি। এক জায়গায় তিনি বলেছেন—

"মহারাজ বীরচন্দ্রের সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ও কোন কোন বিষয় উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। যদি মহারাজের যত্নে এই সকল উন্নতি ও পরিবর্ত্তন সাধিত হইত তাহা হইলে অদ্য আমরা তাঁহাকে ইদানীন্তন ভারতীয় নরপতি মণ্ডলীর মুকুটমণি বলিয়া ইতিহাসে বর্ণনা করিতাম। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটীস-গবর্ণমেণ্টের যত্নে ও কোন কোন মন্ত্রী বা প্রধান কর্মচারীর চেষ্টায় এই সকল পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধিত হইয়াছে। অনেক স্থলেই মহারাজের কার্য্যকলাপ তাহার প্রতিরোধক হইয়াছে। প্রজার নিঃশঙ্কভাব ও রাজার প্রতি প্রজার ঐকান্তিক বিশ্বাসই রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও সমৃদ্ধির মুলীভূত কারণ। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে তাহার সম্পূর্ণ অভাব উপস্থিত হইয়াছে।"

কৈলাসচন্দ্র সিংহ সত্যিকার ঐতিহাসিক ছিলেন। তাঁর নিরপেক্ষতা, সত্যপ্রিয়তা ও স্পষ্টবাদিতা প্রশংসনীয়। দ্বিতীয় ভাগের উপসংহারে তিনি পণ্ডিত Jerome-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন—"If an offence come out of the Truth, better is it that offence come, than the Truth be concealed."

তৃতীয় ভাগ—রাজমালা শুধু ত্রিপুরার বা ত্রিপুর রাজবংশেরই ইতিহাস নয়। পাশাপাশি অন্যান্য অঞ্চলের ও তাদের রাজবংশের বিস্তৃত বিবরণও এতে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় ভাগে কাছাড়ের বিলুপ্ত রাজবংশ ও মণিপুরী রাজবংশের বিবরণ দেওয়া আছে। তাছাড়া শ্রীহট্টের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ, চট্টগ্রামের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিবরণ ও কুকিজাতির বিবরণও দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ ভাগ—চতুর্থ ভাগে প্রাচীন ভুলুয়া রাজ্য বা নোয়াখালি জেলার বিবরণ আছে। আর আছে ত্রিপুরা জেলার বিবরণ। পরে ব্রিটীশ ভারতের অন্তর্গত হ'লেও এক সময় সমগ্র ত্রিপুরা জেলা ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ত্রিপুরা জেলার সর্বত্র প্রাচীন ত্রিপুর রাজদের কীর্তি ছড়িয়ে আছে। পরবর্তী কালেও ত্রিপুরা জেলা ও সদর কুমিল্লার সঙ্গে ত্রিপুর রাজদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এ অঞ্চলের বিস্তৃত ইতিহাস তিনটি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। তারপর লিখিত হয়েছে চাকলে রোসনাবাদ ও পরগণে নুরনগরের বিবরণ। চাকলে রোসনাবাদে ছিল ত্রিপুরার রাজাদের জমিদারি। তাই এ-অঞ্চলের ইতিহাস ত্রিপুরার ইতিহাসের সঙ্গে একত্র গ্রথিত হ'বার যোগ্য।

প্রকৃতপক্ষে কৈলাস সিংহের রাজমালাই ত্রিপুরার একমাত্র জাতীয় ইতিহাস। ত্রিপুরাকে জানবার ও চেনবার পক্ষে এ গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম। শুধু তা-ই নয়। ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট ও নোয়াখালি এই বিস্তৃত অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস, তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিবরণ এর মধ্যে বিধৃত হয়েছে। বিপুল অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসা নিয়ে লেখক এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর দৃষ্টি সত্যিকারের ঐতিহাসিকের দৃষ্টি,—নিরপেক্ষ, ন্যায়পরায়ণ ও সত্যসন্ধী। বাঙলার ইতিহাস প্রণয়নে সিংহ মহাশয়ের গ্রন্থখানির মূল্য অসামান্য সন্দেহ নেই।

রাধাকিশোর মাণিক্য

বীরচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাধাকিশোর মাণিক্য ত্রিপুরার রাজা হন। তিনিও সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। বাঙলা ভাষার প্রতি তাঁর সত্যিকার মমত্ববোধ ছিল। বহুদিন থেকেই ত্রিপুরার রাজভাষা বাঙলা, একমাত্র পররাষ্ট্র বিভাগ ছাড়া আর সব বিভাগেই রাজকার্য বাঙলায় নির্বাহ হ'ত। বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময়েই ইংরেজী শিক্ষিত কর্মচারীরা রাজ সরকারে নিযুক্ত হন। তাঁদের কেউ কেউ রাজকার্যে ইংরেজী ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। রাধাকিশোর মাণিক্যের মন্ত্রী রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় একবার ইংরেজীতে আদেশ প্রচার করেন। তাই দেখে রাধাকিশোর তাঁকে লিখেছিলেন—"এখানে আবহমান কাল রাজকার্য্যে বাঙ্গলা ভাষার ব্যবহার এবং এই ভাষার উন্নতিকল্পে নানারূপ অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে, ইহা বঙ্গদেশীয় হিন্দুরাজ্যের পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক মনে করি। বিশেষতঃ আমি বঙ্গভাষাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসি এবং রাজকার্য্যে ব্যবহৃত ভাষা যাহাতে দিন দিন উন্নত হয় তৎপক্ষে চেষ্টিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য মনে করি। ইংরেজী শিক্ষিত কর্ম্মচারী-বর্গের দ্বারা রাজ্যের এই চিরপোষিত উদ্দেশ্য ও নিয়ম ব্যর্থ না হয় সে বিষয়ে আপনি তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন।" বলা বাহুল্য এই ইঙ্গিতপূর্ণ চিঠি পেয়ে রমণীবাবু লজ্জিত হন এবং ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে সংশোধন করেন।

সে-সময় প্রতি বছর রাজবাড়ি থেকে রাজপরিবারের লোকদের লেখায় সমৃদ্ধ হ'য়ে একটি বার্ষিকী প্রকাশিত হ'ত, তার নাম ছিল, 'বার্ষিক'। রাধাকিশোর কখনো কখনো তা'তে লিখতেন।

পরবর্ত্তীকালে আগরতলা থেকে 'ত্রিপুরা' নামে একটি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হ'ত। ১৩৪২ ত্রিপুরাব্দের ৬ই পৌষের ত্রিপুরায় বর্ণিত

মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটি নিচে দেওয়া গেল—

সাক্ষাদ্দর্শন

অরুণ পঙ্কজ, জিনি পদাম্বুজ, অগুরু চন্দন মাখা।
কনক নূপুর, অতি মনোহর, তাহে মণিময় রেখা॥
যুগল চরণ, অতি সুগঠন, ঈষত ইঙ্গিতে বাঁকা।
ত্রিভঙ্গিমা ছাঁদে, পীত ধরা বেঁধে, ধরেছে কদম্ব শাখা॥
শ্রীমুখমণ্ডল, অতি নিরমল, আধ পীতাম্বরে ঢাকা।
কটিতে কিঙ্কিণী, জিনি সৌদামিনী, জ্বলিছে অনল শিখা॥
গোপীজন মন, করিছে হরণ, ফিরাইয়ে বঙ্কিম আঁখ।
বনমালা গলে, তিলক কপালে, চূড়াতে ময়ুর পাখ॥
আরো তদুপরি, বিচিত্র যে হেরি, শ্রীরাধে জয়রাধে লেখা।
ভাবেরে অবোধ, বৃন্দাবনচন্দ্র, অন্তে পাবে ব'লে দেখা॥

ওপরের কবিতাটির সুনিপুণ শব্দচয়ন ও সুগঠিত ছন্দমাধুর্য থেকে কবির পাকা হাতের পরিচয় পাওয়া যাবে। রাধাকিশোরের রচনাগুলি একত্র গ্রন্থাকারে গ্রথিত হয় নি। তার ফলে বর্তমানে বেশির ভাগই লুপ্ত প্রায়।

বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। রাধাকিশোরের সময় সে-সম্পর্ক নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়। তাঁরই আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম আগরতলা আসেন। তখন বসন্তকাল। কুঞ্জবনের বিচিত্র প্রাকৃতিক সমারোহের মধ্যে কবিকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগেই বাঙলার বিশিষ্ট মনীষীদের সঙ্গে রাধাকিশোরের বন্ধুত্ব হয়। সে সময় মহারাজ কলকাতায় গেলে সংগীত সমাজের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এ-উপলক্ষে 'বিসর্জন' নাটক অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে রঘুপতির ভূমিকা

গ্রহণ করেন। সম্বর্ধনা সংগীতটি রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ, আর গান করেন নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্র নাথ। গানটি নিচে দেওয়া গেল—

রাজ অধিরাজ তব ভালে জয়মালা,
ত্রিপুর-পুরলক্ষ্মী বহে তব বরণ ডালা।
ক্ষীণ-জন-ভয়-তারণ অভয় তব বাণী
দীনজন দুঃখহরণ নিপুণ তব পাণি।
অরুণ তব মুখচন্দ্র করুণ রস ঢালা।
গুণীরসিক সেবিত উদার তব দ্বারে
মঙ্গল বিরাজিত বিচিত্র উপচারে
গুণ-অরুণ কিরণে তব সব ভুবন আলা।

বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্যের প্রতি রাধাকিশোরের অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। এ জন্যই বাঙালী সাহিত্যিকদের দুঃখের কথা শুনলে তাঁর হৃদয় বিগলিত হত। কবি হেমচন্দ্র যখন অন্ধ হয়ে অর্থাভাবে পড়েন তখন রাধাকিশোর তাঁকে মাসে ত্রিশ টাকা বৃত্তি দান করেন। তাঁর সাহায্যেই কবি কতকটা শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেনকেও তিনি মাসে পঁচিশ টাকা বৃত্তি দান করেন।

অনঙ্গমোহিনী দেবী

বনে ফুল ফোটে, তার গন্ধে আমোদিত হয় বিজন বনভূমি। বাইরের বিশ্ব তার খোঁজ রাখে না। সারা কাননে সুবাস ছড়িয়ে দিয়ে দিনশেষে সে ঝ'রে পড়ে ধুলোয়।

রাজকুমারী কবি অনঙ্গমোহিনীর নাম ত্রিপুরায় সুপরিচিত। ত্রিপুরার ঘন অরণ্য অতিক্রম ক'রে বাঙলার কবি সমাজে তাঁর যশ বিস্তৃত হয়নি। তবুও তাঁর স্বভাব কবিত্বের প্রশংসা না ক'রে পারা না। পিতা বীরচন্দ্রের কবি প্রতিভা অনঙ্গমোহিনীর মধ্যেও পরিস্ফুট হয়েছিল। অন্তঃপুরবাসিনী রাজকুমারী বাইরের নিন্দা খ্যাতির প্রতি দৃক্‌পাত না ক'রে নিরালায় ব'সে কবিতা-কুসুমের মালা গেঁথেছেন। তাঁর কবিতার ভাষায় ও শব্দ চয়নে পাণ্ডিত্যের পরিচয় রয়েছে। প্রতিভাবান বীরচন্দ্রের প্রভাবে রাজ-অন্তঃপুরেও যে শিক্ষার আলো প্রবেশ করেছিল অনঙ্গমোহিনীর কবিতাই তার প্রমাণ।

তাঁর প্রথম গ্রন্থের নাম কণিকা। এটি ১৩১১ ত্রিপুরাব্দে বা ১৩০৮ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি কবি তাঁর স্বর্গত পিতা বীরচন্দ্রকে উপহার দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন—

এ নহে কবির গাথা কবিতা কুসুম মালা\
সুবাসিত চির-মধুময়\
এ কেবল শুষ্ক ফুল,— বিহীন সুবাস মধু\
মলিন বিলীন দলচয়।\
তব পদ পূজাযোগ্য নহে এই শুষ্ক ফুল\
তবু পিতা জানি আমি মনে,\
নীরস কবিতা মম হইবে সরস অতি\
শুধু তব স্নেহের নয়নে।

তারপর শেষটায় লিখেছেন—

যদিও এ লোকে তব স্নেহের সে কণ্ঠস্বর
চিরতরে গিয়েছে থামিয়া,
নাহি সুধাইবে আর কি আমি এসেছি নিয়ে
দেখিবেনা বারেক চাহিয়া!
তবু পিত উৎসর্গিনু স্বর্গীয় চরণে তব,
অতি ক্ষুদ্র মম উপহার,
অশ্রুজল বিন্দুসহ ভকতি প্রণাম এই
লহ পিতা দীন তনয়ার।

কণিকার কবিতাগুলি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা। তার একটি কবিতার নাম 'মহাশ্বেতা'। কাদম্বরী কাহিনীর মহাশ্বেতাকে নিয়ে এই কবিতাটি লেখা। কবি লিখেছেন—

বিরলে বিজন বনে গন্ধর্ব্ব নন্দিনী
একেলা বসিয়া
বিষাদ বিরহ গান গাইছে মরম দুখে,
বীণার সহিত মিলাইয়া;
লয়ে সে কাতর স্বর হায়, যেন রে বাতাস
রহি রহি ফেলিতেছে দুখের শোয়াস।
মনোহর চন্দ্রপ্রভা গিরিবর মূলে,
মহেশ মন্দির,—
লতায় পাতায় ঘেরা দাঁড়াইয়ে অনিমিখ
সবিষাদ নীরব গম্ভীর;
অবিরাম নিরঝর ঝরে, বারি ঝর ঝর
যেন রে বালার দুখে কাঁদে গিরিবর।

শেষের দিকে তপস্যারতা মহাশ্বেতার বর্ণনাটি সুন্দর।—

পড়িয়াছে জটা-ভার সুনিবিড়তর
পৃষ্ঠে এলাইয়ে

গলায় রুদ্রাক্ষমালা যৌবনে যোগিনী বালা,
চারু অঙ্গে বিভূতি মাখিয়ে ;
আধ ফোটা কুসুমের দলে, মাখিয়ে চন্দন,
রাখিয়াছে যেন কেহ করিয়ে যতন।
পুণ্ডরীক মুখ শুধু ভাবিতেছে মনে,
কি বা নিশি দিন,
তরুণ তাপসী বালা বিষণ্ণ বিরহ দুখে
বিমলিন বদন-নলিন,
কেশজালে রহিয়াছে ঢাকা, আধ' মুখ-শশী
মেঘকোলে যেন চাঁদ আছে আধ' পশি।

অনঙ্গমোহিনীর প্রকৃতি বর্ণনা প্রশংসার যোগ্য।

"নিশীথ সঙ্গীত" কবিতায় নির্জন নিশীথের নিস্তব্ধ পরিবেশটুকু অত্যন্ত সহজ ভাষায় ফুটে উঠেছে।

গভীর হেমন্ত নিশি জোছনা প্লাবিত দিশি,
প্রকৃতি নিদ্রায় নিগমন,
চাঁদের অমিয় মাখা নীহারের জলে ঢাকা
তরুলতা বন উপবন।
মাঝে মাঝে হুহু করি কুসুম সুবাস হরি
বহিতেছে উত্তরে বাতাস,
স্নিগ্ধ শীত নিশীথিনী বসন্তের বিরহিণী
যেন ফেলিতেছে দীর্ঘশ্বাস।
মুকুলিত লতিকায় পাতায় ফুলের গায়
বিন্দু বিন্দু পড়িছে তুহিন,
ধূমল কুঝটি বাসে ঢাকিয়াছে চারিপাশে,
নিশি যেন স্তব্ধ জনহীন।

আবার বর্ষার বর্ণনাটিও এমনি সহজ ও সুন্দর।—

বরষা আইল নামি গুরু গরজনে,
শীতল হয়েছে ধরা ঘন বরিষণে ;

*   *   *   *

সারাদিন মেঘে মেঘে আঁধার গগন,
নীরদের ঘন স্তরে ঢেকেছে তপন ;
ঢালি মেঘ বারি রাশি রহিয়া রহিয়া,
স্নিগ্ধ করে চাতকীর পিপাসিত হিয়া ;
বায়স ভিজিছে বসি—পাতার আড়ালে,
বাদলের তীব্র বায়ু বহে উতরোলে
সবুজ শ্যামল ক্ষেতে ভিজিছে কৃষাণ,
নিড়াইছে ক্ষেত্রচয় গেয়ে গ্রাম্য গান ;
অদূরেতে কৃষকের কুঁড়ে ঘরগুলি,
রাখিয়াছে নিরন্তর স্নেহ পাখা খুলি ;

*   *   *

আর্দ্র প্রাঙ্গণের ধারে বাঁশের মাচায়,
ফুটিয়াছে ঝিঙ্গাফুল পাতায় পাতায় ;
অশ্রান্ত ঢালিছে মেঘ ঝর ঝর ঝরে ;
ঢেউ কোথা চ'লে যায় খর বেগ ভরে ;
সুদূরে তুলিয়ে পাখা ভেসে যায় তরী,
তালে তালে ফেলি দাঁড় মাঝি গায় সারি ;
আর্দ্র বসনেতে ঢাকি সুকোমল কায়,
এলো চুলে গ্রাম্য বধূ জল নিয়ে যায় ;
একবার হাসি মেঘ ক্ষণেকের তরে,
সবেগে ঢালিছে পুন খরতর ধারে ;

শেষের তিনটি কবিতা বৈষ্ণব ভাবের লেখা। 'কণিকা'র ভূমিকায় রাজকবি মদনমোহন মিত্র লিখেছেন—"ত্রিপুর রাজ পরিবার বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত। গোপীভাব অবলম্বনে আরো দুই চারিটি কবিতা লিখার জন্য অনুরোধ করি ; আমার উৎসাহেই শেষের কবিতা কয়টি লিখিত হইয়াছে।"

কবিতা তিনটির মধ্যে প্রথমটির নাম 'বিরহ'। এটি বিরহিণী রাধার মর্মবাণী।

সখি, কে বুঝিবে আর
দুখিনী রাধার
আকুল প্রাণের কথা,
ওগো কারে বা কহিব
কেই বা শুনিবে
এ মোর বিরহ গাথা।
আমি পারিনে পারিনে
আর যে পারিনে,
বহিতে এ হৃদি ভার;
আমার সুখ ঘুম ঘোর
গিয়েছে ভাঙিয়া
ছিঁড়েছে হৃদয় তার।

শেষের দিকে রাধিকা মৃত্যু কামনা করছেন।

আজি তিমিরা যামিনী
চাঁদ বিরহিণী
আঁধার নিকুঞ্জবন,
ফেলি দুখের শোয়াস
বেড়ায় বাতাস
বন অতি নিরজন।
দেখ নীরদে গগন
সাজিল সঘন
চারিদিকে ঘোরতম।
আজি নিকুঞ্জ কানন
বিষাদে মগন
মম হৃদয়ের সম।

শোন ডাকিছে যমুনা
কুলু কুলু করি,—
"আয় রাই, মম কোলে,
তব এ দারুণ জ্বালা
জুড়াবে গো সখি,
আমার শীতল জলে।"
তবে যাই গো সজনি,
আকুল হৃদয়—
জুড়াইতে চিরতরে
আজি সজনি লো মম
পিয়াসিত প্রাণ
মিলাব যমুনা নীরে।

অন্যের ফরমায়েসে বৈষ্ণবভাবে লেখা হ'লেও ওপরের কবিতাটি ঠিক বৈষ্ণব কবিতা হয়ে ওঠে নি। এর পরের কবিতাটি বরং তার চাইতে ভাল। রাধাকৃষ্ণের মিলন বর্ণনায় কবি লিখছেন—

মধুর যামিনী মধুর চাঁদনী
মধুর মধুর গান,
মধুর মুরলী রাধা রাধা বলি
বাজিছে মধুর তান।
রাধাময় বেণু বাজাইছে কানু
মৃদু সুললিত সুরে
পুলকিত হিয়া গাইছে পাপিয়া
সুমধুর সুমধুরে।
উল্লাস হৃদয়ে পথপানে চেয়ে
রয়েছে নরেশ বালা
মুখে মৃদু হাস নয়নে বিলাস
নিকুঞ্জে আইলা কালা।

হরষিত মন প্রফুল্ল বদন
দোহে দুহু মুখ দেখি
দুহু মুখ চাঁদ নেহারিয়ে দোহে,
তিরপিত নহে আঁখি।

শেষের কবিতাটির নাম 'যুগল রূপ।' রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপের বর্ণনা দিয়েছেন কবি। কৃষ্ণের বুকে রাধিকাকে দেখে কবির মনে হচ্ছে,—

যেন যমুনার
সুনীলিম নীরে
রাধা হেম সরোজিনী
নব নীরদের
বুকের মাঝারে
শোভে যেন সৌদামিনী।

তারপর রাধার রূপ বর্ণনা—

কুসুমের সম
সুকোমল দেহ
যেন রে মাধবী লতা;
চম্পকের দাম
জিনিয়ে বরণ,
অতুল রূপের ছটা।
দলিত অঞ্জনী
গঞ্জিত কবরী
তাহে মালতীর মালা;
মাধবের চির
হৃদয়-বাসিনী
বৃষভানু রাজবালা।

নব মেঘ জিনি
বরণ মাধুরী
শ্যাম অঙ্গ মনোহর,
অধর বাঁধুলি,
মৃদু মন্দ হাস
আঁখি তায় ইন্দীবর।

সবের শেষে কবি বৈষ্ণবোচিত প্রার্থনা জানিয়েছেন—

এ হৃদয় মম
যমুনা পুলিন,
এস তায় কালোশশি,
রসময়ী রাই
সহ বসি শ্যাম
বাজাও মোহন বাঁশী।

এরপর এক দারুণ দুর্ঘটনায় অনঙ্গমোহিনীর মনোজীবনের মোড় ঘুরে গেল। কৈশোরে উজির গোপীকৃষ্ণ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ১৩১২ সনের আশ্বিন মাসে তাঁর বৈধব্য ঘটে। এই ঘটনায় কবির ব্যথিতচিত্ত মথিত ক'রে বেদনার অশ্রুধারা কবিতার সহস্রধার উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছে। এ সময় তাঁর একটি বই প্রকাশিত হয়, তার নাম 'শোকগাথা'। হিন্দুনারীর অকাল বৈধব্যর মত দুর্ভাগ্য মানুষের জীবনে আর হ'তে পারে না। গোপীকৃষ্ণ ঠাকুরের মৃত্যুর সময় কর্নেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর তাঁর শয্যাপার্শ্বে সরকারী তাঁবেদার ছিলেন। তখন অনঙ্গমোহিনী তাঁকে বলেছিলেন—"যদি সহমরণ প্রথা রহিত না হইত তাহা হইলে আমি অগ্নিস্নান করিয়া স্বামীর অনুগমন করিতাম!" এই দারুণ দুর্ভাগ্যে তাঁর মনোজীবনে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয় 'শোকগাথা'র কবিতাগুলি তারই বেদনাময় অভিব্যক্তি। এ বিষয়ে 'প্রিয়প্রসঙ্গ' রচয়িত্রী মানকুমারী বসুর সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে। শুধু 'প্রিয়প্রসঙ্গ' গদ্যে লেখা, আর 'শোকগাথা' কবিতার বই।

'শোকগাথা' কাব্যের রচনাকাল ১৩১৩ সন। এর ভূমিকা লিখেছেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার। প্রসঙ্গত তিনি বলেছেন—

"ত্রিপুরার রাজ পরিবারে সরস্বতীর বিশেষ কৃপা। সঙ্গীতে, চিত্রে, কাব্যে রাজপরিবারের খ্যাতি বঙ্গদেশব্যাপী। রাজপরিবারের মহিলাগণ ও যে উহাতে অনুরাগিণী এবং কবিত্ব প্রতিভায় দীপ্তিমতী রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবীর কবিতায় তাহা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।"

'নিবেদন' প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন—"নিয়তির নিদারুণ নিয়মাধীনে যে মহাপ্রলয় আমার জীবনে ঘটিয়াছে তাহারই করুণ উচ্ছ্বাস সময়ে সময়ে কবিতার আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। * * 'শোকগাথা' আমার জীবনের ঘোর বিষাদময়ী ঘটনার ও দীর্ণ হৃদয়ের নিদর্শনমাত্র। সুতরাং ইহাতে কাহারও মনোরঞ্জন হইবে বলিয়া আশা করি না।"

বইটি কবি স্বর্গত প্রিয়কে উপহার দিয়েছেন। তিনি লিখছেন—

স্বামিন,
গিয়েছ স্বরগ পুরে!
কোথা সে গো কত দূরে,
অজানা সে কোন্ দেশে করিতেছ বাস?
পশিতে পারে কি তথা,
বিষাদ বিরহ গাথা
বেদনার অশ্রুজল দুখের নিশাস?
পরপারে জীবনের,
গেছ চলে! দু জনের
মাঝে আজি অন্তরাল সৃজিয়া অপার;
নিয়ে গেছ সুখ আশা,
প্রেম প্রীতি ভালবাসা,
রাখিয়া গিয়েছ শুধু চির অশ্রুধার।
হৃদয়ের ভাঙ্গা ঘরে,
বিষাদ বরষা ঝরে

শোকবায়ু হু হু ক'রে সদা করে খেলা ;
গণিতেছি গতদিন,
একাকিনী সাথিহীন,
জানিনা ফুরাবে কবে জীবনের বেলা।
মর্ম্মবিদ্ধ শোকবাণে,
সে ক্ষত আহত প্রাণে
উৎসরে রোদনরূপে এ গীতি আমার !
লহ নাথ একবার,
দীর্ণ হৃদি বেদনার,
অশ্রু জল বিন্দু মাখা প্রেম-উপহার !

উজির গোপীকৃষ্ণ ঠাকুর মৃত্যুর পূর্বে বাক্‌শক্তিহীন হ'য়ে যান। এ অবস্থায় তিনি কয়েকদিন ছিলেন। তাঁর কথা বলবার শক্তি ছিল না। চিরবিরহের ক্ষণ আসন্ন জেনে শুধু প্রিয়ার দিকে চেয়ে নীরবে অশ্রুমোচন করতেন। তখনকার সেই করুণ চিত্র কবি ছন্দে ফুটিয়ে তুলেছেন।

যাতনায় ক্লিষ্ট সেই বিবর্ণ বদন !
আকুল বিষাদভরে হাতে হাত রাখি
চেয়েছিল অশ্রুপূর্ণ প্রভাহীন আঁখি !
এ বিষাদ ছবি জাগে হৃদি-দরপণে
এ করুণ গীতি ভাসে মৃদু গুঞ্জরণে
সমস্ত জীবনে মম, প্রভাতে সন্ধ্যায়
শুধু সেই স্মৃতি রেখা হৃদয়েতে ভায় !
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে করিয়ে পোষণ
রাখিয়াছি সেই স্মৃতি করি সযতন।

তারপর বলেছেন—

একদা ফুরাবে যবে দীর্ঘ তপ্ত বেলা
সমস্ত জীবন শেষে, করি সাঙ্গ খেলা

বিরাম লভিবে প্রাণ, সে সময়ে স্মৃতি
আসি তুমি ঢাল কাণে অতীতের গীতি ।
জাগাও সে ছবি হৃদে অন্তিমেতে মোর
অবশেষে চোখে দিয়ো মোহ-ঘুম-ঘোর ।

কখনো বা জীবন সায়াহ্ন অনুমান করে কবি মিলনের আশায় বুক বেঁধেছেন—

ফুরায়ে এসেছে ক্রমে রৌদ্র তপ্ত মোর
জীবনের বেলা !
অল্প আর আছে বাকি,
তবে কেন মন তোর
ব্যাকুলতা ? কর তাহে হেলা ।
দিবস রজনী কত আর
ভাবিব রে মন ?
ক্ষণেক ভুলিতে দাও হৃদয় বেদন ।

প্রকৃতির সঙ্গে কবিমনের নিগূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে। কবিতা-গুলির মূল সুর এক হ'লেও বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ কবি মনকে বিভিন্ন ভাবে নাড়া দিয়েছে। "বর্ষা নিশায়" কবির মনের অবস্থার বর্ণনা—

আজিকে যামিনী মলিন চাঁদিনী
নীরব নিশুতি ধরণী
ভাঙ্গা মেঘ ভাসে চাঁদ আবরিয়া,
ঢালে রিমিঝিমি রহিয়া রহিয়া
আকুল সমীর বহিছে শ্বসিয়া,
প্রকৃতি সজল নয়নী ;
আজি নিশি যেন বিরহিণী হেন
বিষাদ মলিন বরণী ।

* * * *

বরিষা নিশায় বসি নিরালায়,
চির সহচরি স্মৃতি রে,
জেগে উঠে শুধু আজি নিরজনে,
অতীতের কথা আকুলিত মনে
গায় মেঘ যেন মৃদু গরজনে
তাহারি প্রণয় গীতি রে ;
উনমাদ প্রাণে বায়ু বহি আনে
তারি চির প্রেম প্রীতি রে।

এমনি দিনে কবির মনের বাসনা :—

আজি সাধ মনে বরষার সনে
মিশাব এ প্রাণ সজনী।
মেঘ সনে সদা পড়িব ঝরিয়া,
কাঁদিব গো শুধু গলিয়া গলিয়া,
দূর মেঘ সনে বেড়াব ভাসিয়া
অয়ি চির স্মৃতি সজনী।
জীবনে মরণে তাহারি স্মরণে
যাপিব দিবস রজনী।

তেমনি 'বর্ষায়' কবিতায় কবি বলছেন—

ভাসে অসীম গগনে
আকুলিত মনে,
যেন মেঘ পথ হারা—
আজি বিষাদিনী হেন,
দিগ্‌বধু যেন,
শুধু কেঁদে হয় সারা।
সখি আজি নিরজনে
শুধু পড়ে মনে
কবেকার কত স্মৃতি,

শুধু পশে যেন কানে
মৃদু মৃদু তানে
অতীতের প্রেম গীতি।
আজি ব্যাকুল বাতাসে
দামিনী বিকাশে
গরজে বারিদ ঘোর ;
ওগো বরষার গানে
আজিকে পরাণে
জাগে কি হুতাশ মোর।
সখি বসি এ নিবিড়ে
ভাসি আঁখি নীরে
আজি শুধু ভাবি মনে ;
মম জীবনের পারে
পাব কি তাহারে
মিলিব কি তার সনে।

বেশির ভাগ কবিতার গতিশীল ছন্দ, বর্ণনার মাধুর্য ও ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য করবার মত । 'নিশীথে ঝটিকা' কবিতায় কবি বলছেন—

নভের নীলে মেঘের নীলে
গিয়াছে যেন মিশিয়া,
নিশীথ যেন বিরহী হেন
আধারে পড়ে ঝাঁপিয়া।
দোলায় ঘন গহন বন
বাতাস বহে শ্বসিয়া'
কাঁপায় মন গরজে ঘন
বিজলি উঠে হাসিয়া।

* * * * *

আজিকে মম হৃদয় সম
যামিনী মসিবরণা;
আমারি যেন নয়ন হেন
ঝরিছে ঝর ঝরণা !

হারান-গীতি হারান-স্মৃতি
মরমে উঠে জাগিয়া
কেবলি ধীরে নয়ন নীরে
হৃদয় যায় ভাসিয়া।

দুঃখময় জীবনের অবসানের জন্য কবি উন্মুখ হ'য়ে উঠেছেন। কারণ, এ জীবনের অবসানেই তো প্রিয়-মিলনের শুভলগ্ন। নিচের কবিতাটিতে দুর্বহ জীবনের জন্য আক্ষেপ ফুটে উঠেছে।—

পরাণ না যায় !
ধীরে ধীরে দিনমণি অস্তাচল গায়—
ওই নিবে যায়,
সোনার কিরণ রেখা,
আর নাহি যায় দেখা
গভীর সাগর নীলিমায়।
তটিনী তরঙ্গ তুলি,
যেতেছে আপনা ভুলি,
মৃদু কুলুকুলু করি না জানি কোথায় ;
দিন যায় রাত যায়
রবিশশী ডুবে যায়,
কেবলি যাতনা-জীর্ণ পরাণ না যায়।

* * * * *

পরাণ না যায়।
স্নেহ প্রেম প্রীতি যায় ভালবাসা যায়—
ওই দ্রুত রথে,
আশা যায়, হাসি যায়
সুখ হর্ষ চ'লে যায়
জীবনের মহাযাত্রা পথে।
এমনি আপন মনে,
মিলি অনন্তের সনে,
কালের অসীম পথে সবে চ'লে যায়।
ওই যায় চ'লে যায়,
সকলি চলে যায়,
কেবল দুখের মম পরাণ না যায়।

কবি ও তাঁর প্রিয়ের মধ্যে অনন্ত বিরহ। কিন্তু তারই ফাঁকে কবি যেন ক্ষণে ক্ষণে প্রিয়ের রহস্যময় উপস্থিতি অনুভব করছেন। "বিরহে" কবিতায় তিনি বলছেন—

আছ সদা কাছে কাছে
ঘুরে ফিরে আসে পাশে,
ডাক শুধু বার বার
নাহি দেও ধরা ;
এই আছ এই নাই
বৃথা শুধু শূন্যে চাই,
কেবলি ব্যথিত প্রাণ
হয় দিশাহারা।

মাঝে মাঝে এ রকম স্বপ্নময় অনুভূতি এলেও পরক্ষণেই কবির তীক্ষ্ণ বাস্তব বোধ জেগে উঠেছে। এই ভ্রান্তি বিলাস শুধু ক্ষণিকের জন্য। পরমূহূর্তেই তিনি বলছেন—

জানিবে না তুমি কভু
প্রাণ নাহি মানে তবু,

আশার কুহকে ভুলি
ভাবি মনে মনে ;
দেখিতেছ শুনিতেছ
তুমি সব জানিতেছ
তাই রচি শোকগাথা
সজল নয়নে।

কিন্তু মরণেই জীবনের শেষ, মৃত্যুর পরপারে আর কোন সত্যই নেই এ-কথা কবি মানতে রাজি নন। তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে—

বৃথা কি জীবন মানবের ;
প্রেম প্রীতি স্নেহ মেলা,
ইহা কি স্বপন খেলা,
একি শুধু লীলা বালকের ?
বালুকার খেলাঘর ভেঙ্গে যায় ক্ষণে
তেমনি জীবন শেষ হ'বে কি মরণে ?

তারপর তিনি নিজেই কবিসুলভ যুক্তি দেখিয়েছেন। বলছেন, এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবী তার বিচিত্র প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে সত্য, অথচ জীবন মিথ্যে এ হ'তেই পারে না—

যদি শুধু ক্ষণিক জীবন,
তবে কেন নীলাকাশে,
রবীশশী তারা ভাসে,
শোভাদীপ্তি করে বিকীরণ ?
কেন নিশা সুখসুপ্তি দেয় আসি নিতি ?
পাখী কেন ঢালে কানে মধু কল গীতি ?

অবশেষে কবি সিদ্ধান্ত করেছেন—

তাই ভাবি মানব জীবন,
নহে বালকের খেলা
ক্ষণিক মায়ার মেলা,
এ নহে গো নিশার স্বপন ;

জীবনের পরপারে আছে নব দেশ।
চির বিভাময়, নাহি মলিনতা লেশ।

তাই কবির কামনা—

কবে আমি যাব সেই দেশে,—
মৃত্যু বিনা সে পথের
সাথী নাহি মানবের,
এস মৃত্যু চির সুপ্তি বেশে ;
যদিও করাল তুমি তবু মম প্রিয়,
পরশি মোহিয়ে মোরে সাথে করি নিয়ো।

এই কটি ছত্র হাফেজের কবিতা মনে করিয়ে দেয়—

যে অম্লান কুসুমের মধুপান তরে।
নিয়ত লোলুপ মম মন-মধুকরে ॥
যে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত।
হে মৃত্যু, তুমি তার সরণি নিশ্চিত ॥

মনে হয় সংস্কৃত সাহিত্যেও কবির ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর স্বর্গত স্বামীর স্মৃতিমন্দির স্থাপন উপলক্ষে 'স্মৃতিচিহ্ন' কবিতায় তিনি মিলন ও বিরহের তুলনা ক'রে বলেছেন—

মিলনে—নয়ন মাঝে, একই মুরতি রাজে,
এক ঠাঁই সমীপেতে রয় ;
বিরহে—অসীমরূপ হৃদয়েতে রহে গাঁথা
শুধুই জগত রূপময়।

এ যেন—"সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে ॥"

এরই স্পষ্ট প্রতিধ্বনি !

অবশেষে কবি বলেছেন—

পাষাণে রচিত স্মৃতি, ধূলিতে মিলায়ে যাবে
কালের কঠোরময় করে।

হৃদয়ের পাতে রেখা, গভীর উজল লেখা
রবে মোর আজীবন তরে।

কণিকার চাইতে শোকগাথার কবিতাগুলি অনেক বেশি পাকা হাতের রচনা। প্রিয় বিয়োগের মর্মান্তিক যাতনা এই কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত হয়েছে। তবে, শুধু একটিমাত্র বিষয় নিয়ে লিখিত হওয়ায় এর মধ্যে খানিকটা বৈচিত্র্যের হানি ঘটেছে এবং সমস্ত গ্রন্থখানা একটানা পড়তে গেলে কতকটা একঘেয়ে মনে হয়।

অনঙ্গমোহিনীর শেষ গ্রন্থ "প্রীতি" প্রকাশিত হয় ১৩১৭ সনে। এটি নিঃসন্দেহে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি। শোকগাথার কবিতাগুলি যেখানে একই খাতে ব'য়ে চলেছে সেখানে প্রীতির কবিতাগুলি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বন ক'রে বিচিত্র রসধারায় বাঙলা সাহিত্যকে অভিষিক্ত করেছে।

প্রীতি কবির পরিণত প্রতিভার পূর্ণতম প্রকাশ। কবির রসবোধ তার মধ্যে জমাট বেঁধেছে। তাই প্রীতির কবিতাগুলি সংক্ষিপ্ত, সংযত, সুসংবদ্ধ। মাত্র চারটি লাইনে কবি বইখানি উৎসর্গ করেছেন—

তোমার কণ্ঠের সুরে বাঁধিয়া লইয়া বীণা
প্রতি তারে দিয়াছি ঝঙ্কার;
গাহে না সে অন্য গান তব প্রিয় নাম বিনা,
গীতি, প্রীতি সকলি তোমার।

প্রীতির কবিতাগুলি অনুভূতির স্তর ছাড়িয়ে উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হয়েছে। তাই 'নিবেদন' কবিতায় বলছেন—

কি প্রীতি লভিতে আজি আমি
দাঁড়ায়েছি দুয়ারে তোমার?
তুমি জান, হে জগত-স্বামী
নাহি যাচি তৃপ্তি বাসনার।
প্রীতি নহে সুখ রস পান
আঁখি মুদে আলস্যেতে লুটে;

প্রীতি-রসে তাজা মৃত প্রাণ
প্রীতি-দীপ্ত বিশ্ব চলে ছুটে।
যে প্রীতির স্রোত নিরবধি
শুষ্ক চিত্ত রসে সিক্ত করে,—
সেই প্রীতি অমরার নদী—
প্রবাহিত কর এ অন্তরে।

প্রিয়-বিরহের বেদনার অভিব্যক্তি প্রীতির কোন কোন কবিতায় রয়েছে। কিন্তু শোকগাথার কবিতার সঙ্গে তার কত তফাৎ! এই কবিতা-গুলিকে শুধু বেদনার বললে ভুল বলা হ'বে। কবির রসঘন অন্তরের সান্নিধ্যে এসে গভীর দুঃখ আনন্দবেদনাময় রসস্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। শোকগাথার সঙ্গে প্রীতির যে কালগত ব্যবধান তার ফলেই দুই গ্রন্থের কবিতার মধ্যে এই প্রকৃতিগত পার্থক্য জন্মলাভ করেছে।

শোকগাথার কবিতায় আকস্মিক আঘাতের ফলে যে মনোভঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায় কবি এখানে তার থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করেছেন। নিয়তির নির্বন্ধে কবির প্রিয় চিরতরে তাঁর চোখের সামনে থেকে স'রে গেছেন সত্যি, কিন্তু তাঁর মন থেকে মিলিয়ে যান নি। কবির অন্তরের অন্তস্তলে তাঁর আসন পাতা রয়েছে। তাই বিশ্বের বিচিত্র প্রকৃতির মধ্যে তিনি প্রিয়ের স্পর্শ পাচ্ছেন। "অদৃষ্ট প্রেম" কবিতায় তিনি লিখেছেন—

আমি না পাই দেখিতে নয়নে তোমায়,—
পাব না দেখিতে কভু ও;
ওগো নয়ন দুটির কোণায় কোণায়—
ফুটিয়া উঠিছ তবুও।
একি? স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে আসিয়া—
তোমারি পরশ লাগিছে;
একি? অরুণ কিরণ নয়নে ভাসিয়া—
তোমারি দরশ জাগিছে।

কোন্ সুদূর হইতে শ্রবণ রমিয়া
আসে তব প্রেম গীতি গো ?
মম হৃদয় ছাপিয়া উছলে অমিয়া,—
এই কি তরল প্রীতি গো ?
একি মিশ্রিত সুখ ? অমৃতে গরল ?
কাঁদি কেন সুখে মাতিয়া ?
এ যে দাহন করিয়া করিছে শীতল
করিছে মুক্ত বাঁধিয়া !

কালের ব্যবধানে কবির মনে আর দুঃখের সে তীব্রতা নেই। দুঃসহ মর্মদাহ এখন নিবিড় ধৈর্যের মধ্যে প্রশান্তি লাভ করেছে। তাই কবি বলতে পেরেছেন—

চলে গেছে সুখ ? স্বার্থের বোধনে
ফিরাইতে তায় সাধিব না।
আসিয়াছে দুখ ? ব্যর্থ এ রোদনে
বুকে টেনে তায় বাঁধিব না।
নারীর ধর্ম নহেক শুদ্ধ মর্মবেদনে মরা ;
প্রীতির ধর্ম নহেক ক্ষুদ্র কারাগারে গড়া ধরা।
প্রীতি ও বিরহ করুক উজ্জল
হৃদয়ে লগ্ন মলিনতা
করুক জীবন সবল সচল
মুছিয়ে স্বপ্ন অলীকতা।
নারীর ধর্ম নহে ত কেবল আপনা লইয়া থাকা ;
এ নহে পুণ্য, প্রীতির ছলেতে ক্ষুদ্র স্বার্থ ঢাকা।

তাই কবি তাঁর নিজের কর্তব্য স্থির করেছেন।—

পুণ্যের নামে যেই অভাগিনী
পুষি' দুখ প্রাণ মাঝে তার,

গৃহ কোণে বসি কাঁদে অনাথিনী,
উড়ে যাব আমি কাছে তার।
বুঝাব প্রীতির লক্ষ্য বিকাশ, বক্ষে জগৎ ধরা ;
নারীর মোক্ষ নহেক কেবল ছুঃখে দহিয়া মরা।

এই কবিতাটির সঙ্গে কামিনী রায়ের "সুখ" নামে বিখ্যাত কবিতাটির আদর্শগত মিল রয়েছে।

কবির গভীর সাধনায় সুখ-ছুঃখ একাকার হ'য়ে গেছে। ছুঃখের নিধিকে তিনি অন্তরে অনুভব করেছেন। তাই 'পেয়েছি' কবিতায় বলেছেন—

তোমারে আমি রেখেছি বুকে
সুখের তরে নয় ;
তোমারে আমি পেয়েছি বুকে
ছুখেরে করি জয়।
আকাশ ছেয়ে তোমার প্রীতি
বাতাস সম আসে ;
শীতলি' মম চিত্ত নিতি
বিচরে প্রাণ বাসে।

* * * *

এ পারে কভু পাব না খুঁজে।
যবে জীবন-সাঁঝে—
ওপারে যাব চক্ষু বুঁজে,
উদিবে তুমি কাছে।
দোঁহার প্রীতি [illegible]
চিনিব দোঁহে ত্বরা
তৃপ্ত মোরা হইব পানে
অমৃত চিত্ত ভরা।

কবি মরমী সাধিকা, বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে তাঁর মর্মের যোগ রয়েছে। 'আমার সুখ' কবিতায় তিনি বলছেন—

কঠোর কথায় ব্যথা পাবে ভয়ে
কাঁদিয়া ভিজাই ভাষা।
অভিমানে আমি আঁখি মুদি নাই;
প্রাণ-জোড়া ধ্যানে ধরিবারে চাই;
উথলে আমার রোদনে বেদনে
কেবলি ত ভালবাসা।
জড় ব্যবধানে এত দূরতায়,—
বুঝি ম্লান মুখ দেখা নাহি যায়,—
সন্দেহে তবু রঞ্জিত করি
হাসি দিয়ে মোর মুখ।
এ হাসি আমার তুষিতে তোমায়
এ প্রেম রতন ভূষিতে তোমায়,
জীবন আমার নিজ তরে নয়
তোমারি সেবায় সুখ।

স্রষ্টার অতীন্দ্রিয় স্পর্শে কবির অন্তর জেগে উঠেছে। জেগে উঠেছে নিবিড় উপলব্ধির নিঃসঙ্গ বেদনায়। যাঁর সঞ্জীবনী স্পর্শে জীবন জেগে উঠল তাঁর সান্নিধ্য পাচ্ছেন না কবি। তাই "গিয়াছে" কবিতায় বলছেন—

আমি বিজনে ছিলাম আপনা লইয়া
কহি নি মনের কথা,—
তুমি পবনের মত গোপনে দোলায়ে
গেলে গো, বনের লতা।
শিহরি উঠিনু পাতায় পাতায়,
মর্ম্মরি ঘন মরম ব্যথায়
উপেখি আমায় উড়িলে গগনে
একেলা রহিনু তথা
ঝরিল কুসুম রহিল লতিকা
ভূতলেতে অবনতা।

আমি, খনির মাঝারে মণির মতন
রেখেছিনু প্রীতিটুক্ ;
সে, হেরিল মানিক একটু খানিক্
হাসিতে চিরিয়া বুক
গেল সে আমার পরাণ খুলিয়া,
হেরিল মাণিক্ নিল না তুলিয়া,
এলায়ে চিত্ত গিয়াছে চলিয়া
কুড়ায়ে খেলার সুখ।
চেতনা জাগায়ে দিয়াছে পরাণে
গভীর বেদনা দুখ।

এই মর-চেতনার অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই অতীন্দ্রিয় চেতনার আবির্ভাব। "অশরীরী জাগরণ" কবিতায় কবি যেন সেই অতীন্দ্রিয় চেতনার আভাস পাচ্ছেন। সাধক জীবনের এই পরমতম ক্ষণটিতে কবির আনন্দ চরমে উঠেছে। তিনি বলছেন—

চেতনা যতই যেতেছে ডুবিয়া
ততই জীবন জাগিছে।
বেদনাপূর্ণ প্রাণের উপর
সুখের পরশ লাগিছে।
নিঠুর দূরতা আজি নাহি আর,
কঠোর বিরহ মরেছে আমার ;
বিফল নহে রে আশার বাঁধন
অলীক নহে রে সাধনা।
সুখ তরঙ্গে ধুয়েছি অঙ্গ
মুছিয়া ফেলেছি যাতনা।

* * * *

সীমাহারা এক মাধুরী আসিয়া
যেতেছে পরাণে লাগিয়া।

চেতনা যেতেছে ডুবিয়া আমার
জীবন উঠিছে জাগিয়া ॥

প্রীতির কয়েকটি কবিতা বৈষ্ণবভাবে লেখা। একটির নাম "শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ"। এটি কীর্তন। কবিতাটি বাস্তবিক সুন্দর।

পরাণের কোনে্ কোণে গো আমার
পীরিতি লুকানো ছিল ?
কভু—বুঝি নাই কভু—খুঁজি নাই
(কোথা) পীরিতি ভরিয়া ছিল ?
(কার) পরশের অণু্ পবনেতে তনু
পরশিয়া উলসিল ?
(ওগো) দেখি নাই যারে, সে কি না আমারে
পাগল করিয়া দিল !
(ঐ) উছলিয়া যায় পীরিতি কোথায়
মোরে ভাসাইয়া স্রোতে গো ?
(সেকি) এই নদী দিয়া আসিবে গাহিয়া
ভেসে ভেসে সুখ-পোতে গো
এতখানি সুখ লিখিয়াছে বিধি রাধার কপালে কি গো ?

আরেকটি কবিতা একেবারে হুবহু বৈষ্ণব পদ। কবিতাটির নাম "বর্ষায়"।

সখিরে,
মেঘ বরখে ঘন,
গুরু গুরু গরজন,
তিতলহ তরুলতা কুঞ্জ ;
চমকে বিজুরি মরি
কানন গহন ভরি,
ছাওল হিয়া তম-পুঞ্জ।
আজি এ বাদর নিশা,
আধিয়ারা ভরা দিশা,

বরখে নিরদ ঘন বারি—
ঝরই যৈছন ঘন,
ঐছন বরখন,
ঝর ঝর নয়ন হমারি !

* * * * *

সাজল নবীন ঘন,
চঞ্চল সমীরণ,
সজনি এ শাঙন মাহ,
গরজি নিরদ রাশি
বিজুরি সঘন হাসি,
করইল তনু মন দাহ।
নীল গগন তল,
নীল যমুনা জল
বরখই নীল নব মেহ,
সখিলো, কঠিন অতি,
নিদয় মাধব মতি,
বিসরল এ মঝু লেহ।

ওপরের কবিতাটি থেকে বোঝা যায় ব্রজবুলি ভাষায়ও কবির মোটামুটি দখল ছিল।

আরেকটি সুন্দর কবিতার নাম "বাঁশী"।

মুরলি বাজায় বঁধু মধু করি বরিষণ
কহে রাধা "আসিবে গো শ্রীহরি।"
যমুনার শ্যাম তীরে ধীরে বহে সমীরণ,
পুলিন কানন উঠে শিহরি।

* * * *

গাঁথি বিরহিনী বালা মালা, ফুল কলিতে
অপেখিয়া পথ পানে চাহে গো।

কাঁদে রাধা ওগো বঁধু শুধু কেন ছলিতে
মধু-বনে তব বাঁশী গাহে গো ?

প্রীতির সর্বশেষ কবিতা "আমার কবিতা"-য় কবির তখনকার মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।—

আমার কবিতা নয় কল্পনার খেলা।
মধু সিক্ত নহে বাণী
দুঃখ-দিগ্ধ প্রাণ খানি ;
শুষ্ক চক্ষে পথ চেয়ে কেটে যায় বেলা।
আমার কবিতা নয় কল্পনার খেলা।
আশার ছলনা নাই,
পাবনা যা, প্রিয় তাই ;
উতরিতে সিন্ধু পথে, জানি, নাহি ভেলা।
আমার কবিতা নয় কল্পনার খেলা।

* * * *

নিরাশায় নহি ক্ষুণ্ণ,
হৃদয় কামনা শূন্য
প্রাণহীন দেহখানি মৃত্তিকার ডেলা।
আমার কবিতা নয় কল্পনার খেলা
মুক্ত সুখ-দুঃখ-ভার,
রুদ্ধ জীবনের দ্বার,
ফুরায়েছে প্রীতি আর বিরহের মেলা।
আমার কবিতা নয় কল্পনার খেলা।।

এভাবে "কণিকা"র আধফোটা ফুলটি "প্রীতি"র প্রফুল্ল কুসুমে পরিণত হয়েছে। তার রূপে বর্ণে সৌরভে সুষমায় আমোদিত করেছে দশদিক, তারপর ঝ'রে পড়েছে প্রিয়-পদমূলে, নিবেদিত হয়েছে দেবতার পুজোয়। এখানেই অনঙ্গমোহিনীর কবিতার চরম সার্থকতা।

কবি অনঙ্গমোহিনী নিঃসন্তান ছিলেন। ১৩২৮ ত্রিপুরাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

অনঙ্গমোহিনীর অনেকগুলি অপ্রকাশিত কবিতা আগরতলার ত্রৈমাসিক পত্র "রবি"-তে প্রকাশিত হয়। "রবি" পত্রিকা প্রসঙ্গে আমরা তার আলোচনা করব।

শিলালিপি সংগ্রহ

ত্রিপুরার রাজা ও রানীদের অনেক কীর্তি সমগ্র ত্রিপুরায় ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে কতকগুলি মন্দির ও কতকগুলি জলাশয়। মন্দিরগুলির গায়ে প্রতিষ্ঠাতার নাম ইত্যাদি খোদাই করা আছে। এই সব শিলালিপি থেকে ত্রিপুরার অতীত ইতিহাসের এক একটি অধ্যায় রচিত হতে পারে। পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ তাঁর "শিলালিপি সংগ্রহ"-তে এ-সমস্ত শিলালিপির পরিচয় দিয়েছেন। সবগুলি লিপির পাঠোদ্ধার করা বর্তমানে অসম্ভব। তবু লেখক অসামান্য শ্রম স্বীকার ক'রে যতদূর সম্ভব এগুলির পাঠ উদ্ধার করেছেন এবং ত্রিপুরার অতীত ইতিহাসের অজানা অধ্যায়কে উদ্‌ঘাটিত করেছেন আমাদের সামনে।

এই গ্রন্থটি রাধাকিশোর মাণিক্যের আদেশে ১৩১৪ ত্রিপুরাব্দে প্রকাশিত হয়। এতে ত্রিপুরার বিভিন্ন মঠ মন্দির সংলগ্ন প্রস্তর ফলকের মূল সংস্কৃত ও বাঙলা অনুবাদ দেওয়া রয়েছে।

এর থেকে মোটামুটি যে-সব তথ্য আমরা জানতে পারি নিচে তার কয়েকটির উল্লেখ করা গেল—

১। উদয়পুরে ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরের গায়ে পাঁচখানা প্রস্তর ফলক আছে। উত্তর দিকের শিলালিপি বাঙলায় লেখা। এতে ১৬৩ শক লেখা রয়েছে। কিন্তু ফলকে বলিভীম নারায়ণের নাম আছে। বলিভীম নারায়ণ মহারাজ রামমাণিক্যের শ্যালক ছিলেন। রামমাণিক্যর রাজত্বকালে তিনি যুবরাজ হন। ১৬০৩ শকে রাম-মাণিক্যের মৃত্যুর পর তার পাঁচ বৎসরের পুত্র রত্নমাণিক্যকে সিংহাসনে বসিয়ে মাতুল বলিভীম রাজ্যশাসন করেন। এর থেকে বোঝা যায় শিলালিপির উদ্ধৃত "১৬৩ শক" ভুল লেখা। মনে হয় ১৬০৩ হ'বে। দক্ষিণ দিকের দুইটি শিলালিপির একটি বাঙলায় লেখা। সময় লেখা ১৬০৩ শকাব্দ।

১৭৫১ শকে বা ১২৩৯ ত্রিপুরাব্দে মহারাজ কাশীচন্দ্র মাণিক্য ত্রিপুরাসুন্দরীর বাড়িতে একটি বড় ঘণ্টা স্থাপন করেন। ঘণ্টাতে বাঙলায় সন, তারিখ, নির্মাতা ও স্থাপয়িতার নাম লেখা।

২। উদয়পুরে মহাদেবের বাড়ির প্রাচীরের শিলালিপিতে "শ্রীশ্রীকল্যাণদেব" লেখা দেখে মনে হয় এই প্রাচীর কল্যাণ মাণিক্যের মির্মিত। প্রাচীরের মধ্যবর্তী তিনটি মন্দিরেই শিলালিপি আছে।

৩। উদয়পুরে ভৈরবের বাড়ির কাছে আরেকটি মন্দির আছে। এই মন্দিরটি গোবিন্দমাণিক্যের মহিষী গুণবতী দেবী নির্মাণ করেন। ১৫৯০ শকাব্দের বৈশাখ মাসের যুগাদ্যা দিনে মন্দিরটি বিষ্ণুর উদ্দেশে দান করা হয়।

৪। গোমতী নদীর উত্তর পারে একটি টিলার ওপরে পুরনো রাজবাড়ি। সেখানে একটি মন্দির আছে। তার শিলালিপিতে লেখা—মহারাজ রামমাণিক্য ১৫৯৯ শকাব্দে এই মন্দির তাঁর পিতার স্বর্গাভিলাষে বিষ্ণুর উদ্দেশে দান করেন। রামমাণিক্য 'রাজর্ষি' গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র।

৫। উদয়পুরে "জগন্নাথের দোল" নামে একটি মন্দির আছে। তার গায়ে সংলগ্ন প্রস্তর ফলকটি আগরতলায় আনা হয়। তা'তে লেখা আছে, মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য ও তাঁর ভ্রাতা জগন্নাথদেব এ মন্দির নির্মাণ করেন। এর সময় ১৫৮৩ শকাব্দ।

৬। পুরান আগরতলার চৌদ্দ দেবতার সিংহাসনে দুইটি শ্লোক দেখা যায়। তা'তে জানা যায়, গোবিন্দমাণিক্য ১৫৭১ শকে গিরিজার প্রীতির জন্য এ-সিংহাসন প্রদান করেন।

৭। রাধানগরের রাধামাধবের মন্দিরের শিলালিপি পাঠে জানা যায়, কৃষ্ণমাণিক্যের মহিষী জাহ্নবী দেবী ১৬৯৭ শকাব্দে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

৮। কুমিল্লা জগন্নাথ বাড়িতে "সতর রতন" নামে এক প্রসিদ্ধ মঠ আছে। এর স্থাপত্য শিল্প চমৎকার। এটি ভূমিকম্পে নষ্ট হয়ে গেছে। এটি কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের সময়ে নির্মিত। মঠে কোন শিলালিপি নেই। এতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা স্থাপিত হন। পরে কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের মহিষী সুলক্ষণা দেবী ১৭৬৬ শকে নতুন মন্দির নির্মাণ ক'রে ওঁদের স্থাপন করেন। নতুন মন্দিরে এই মর্মে শিলালিপি রয়েছে।

৯। বীরচন্দ্র মাণিক্যের তৃতীয়া মহিষী মনোমোহিনী দেবী তাঁর পিতার শ্মশানে এক মঠ নির্মাণ করেন। এতে এক শিলালিপি রয়েছে।

১০। আগরতলার বর্তমান উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ রাধাকিশোর মাণিক্যের নির্মিত। এর নামকরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ১৩০৯ ত্রিপুরাব্দে তার নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়। এতে একটি শিলালিপি আছে।

১১। আগরতলার নরনারীর পুণ্য পীঠস্থান "লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির"। এটি বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের র্মির্মিত। এতে এক শিলালিপি ররেছে।

ওপরে লিখিত বিবরণ থেকেই বোঝা যাবে শিলালিপি সংগ্রহের কোন সাহিত্যিক মূল্য নেই। তবু এর ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। এজন্যেই এই গ্রন্থটি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল।

দেশীয় রাজ্য

ত্রিপুরার আরেকটি প্রতিভাদীপ্ত সন্তান মহিমচন্দ্র ঠাকুর। তিনি বীরচন্দ্র মাণিক্যের এডিকং ছিলেন, পরে রাধাকিশোর মাণিক্যের পার্শ্বচর হন। দীর্ঘকাল ত্রিপুরা রাজ্যের কর্ণধার ছিলেন মহিমচন্দ্র। ত্রিপুরার সমস্ত অবস্থা তাঁর নখদর্পণে ছিল। ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। এসব দেশীয় রাজ্যের নানা দিক নিয়ে এবং ত্রিপুরার সাহিত্য সংস্কৃতি ও রাজ্যশাসন সম্পর্কে তিনি কতকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর কয়েকটি সংকলিত হ'য়ে "দেশীয় রাজ্য" নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পূর্বে মহিমচন্দ্র গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রটি-ও লিখে গিয়েছিলেন। বইখানি উৎসর্গ করা হয়েছে স্বর্গত মহারাজ রাধাকিশোরের আত্মার উদ্দেশে। উৎসর্গ-পত্রের তারিখ ১৩৩২ ত্রিপুরাব্দ বা ১৩২৯ সন। এর পর মহিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা ১৩৩৪ সনে গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন।

গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন দীনেশচন্দ্র সেন! প্রসঙ্গত তিনি বলেছেন—"পুস্তকখানি পাঠ করিলে মনে হইবে, মহিম যদি শুধু সাহিত্যেরই সাধনা করিতেন তবে তিনি সাহিত্য-জগতে স্থায়ী কীর্ত্তি করিয়া যাইতে পারিতেন। অনেক সময় মনুষ্যের সাংসারিক জীবনে উন্নত পদ তাহার ভিন্ন পন্থায় প্রতিষ্ঠালাভের প্রতিবন্ধক হয়।"

গ্রন্থের আরম্ভে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনকথা দেওয়া হয়েছে। তার থেকে আমরা জানিতে পারি, ছাত্র জীবনেই কলকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেদের সঙ্গে মহিমের সৌহার্দ্য হয় এবং তাঁর মাধ্যমেই ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ি, শোভাবাজারের রাজবাড়ি, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, নাটোরের মহারাজা প্রভৃতির বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়।

মহারাজ বীরচন্দ্রের সঙ্গে কোন কারণে যুবরাজ রাধাকিশোরের মনোমালিন্য ঘটলে মহিমচন্দ্রের বিচক্ষণ বুদ্ধি ও সৎপরামর্শই যুবরাজকে চালিত করে। বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পর রাধাকিশোর রাজা হলে মহিমচন্দ্র তাঁর দক্ষিণ হস্ত হয়ে ওঠেন।—

"ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বকার্য্যেই তখন মহিম ঠাকুর সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। লাট দরবারে এবং দেশীয় রাজদরবারে মহারাজার প্রতিনিধি হইয়া সর্বত্র গতিবিধি পূর্বক মহিমঠাকুর স্বীয় বুদ্ধির প্রখরতায় সকলস্থানেই ত্রিপুর রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া আসিয়াছিলেন।" তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পর্কে বলা হয়েছে "গভর্ণর জেনারেল কার্জ্জন সাহেব একদিন কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন 'তোমার কথাবার্ত্তায় তোমাকে বিশেষ আইনজ্ঞ বলিয়া মনে হইতেছে। তুমি কি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এল. ডিগ্রী পাইয়াছে?' তদুত্তরে তিনি বলেন, 'আমি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছায়াও জীবনে মাড়াই নাই। প্রবেশিকা পরীক্ষায় অঙ্কে ফেইল করিয়া স্কুল পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। তবে দেশীয় রাজ্যের প্রজা বলিয়া দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে সব Literature এবং দৈনিক ইংরেজী খবরের কাগজগুলি আমার দৈনিক আহার যোগায়'"।

* * * *

"বাঙ্গালাদেশের সাহিত্য বিজ্ঞান ললিতকলার ভক্ত ছিলেন মহারাজ রাধাকিশোর। তাঁহার পক্ষে বাঙ্গালা সাহিত্যিক এবং গণ্যমান্যদের সঙ্গলাভের সেতু ছিলেন স্বর্গীয় মহিম ঠাকুর। কবি হেমচন্দ্র, রবিবাবু, জগদীশবাবু, দীনেশবাবু প্রভৃতি মহোদয়গণ ত্রিপুরা হইতে যে বিবিধ সাহায্য পাইতেন তাহা তাঁহার যোগেই হইয়াছিল।"

* * * *

"বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উন্নতিকল্পে তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ৺নবীনচন্দ্র সেনের বিশেষ আগ্রহে এবং

মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের উৎসাহে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে এবং বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে প্রায়ই প্রবন্ধাদি লিখিতেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সব প্রবন্ধ সংশোধনাদি করিয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিতেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন', এবং 'মানসী', 'প্রবাসী', 'সাধনা', 'পরিচারিকা', 'রবি', 'হিতবাদী' প্রভৃতিতে নানা বিষয়ের প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন।"

কাশীতে মোটর দুর্ঘটনায় মহারাজ রাধাকিশোরের মৃত্যু হয়। তখন মহিম ঠাকুরও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি ও গুরুতর আহত হয়ে দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু, তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য আর ফিরে পান নি। জীবনের শেষ দিনগুলি তিনি সাহিত্য আলোচনায় এবং বাঙলা ভাষায় নানা প্রবন্ধ লেখায় কাটিয়ে গেছেন।

দেশীয় রাজ্য গ্রন্থটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে দেশীয় রাজ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম খণ্ড

'ভারতে দেশীয় রাজ্যের স্থান' প্রবন্ধের গোড়াতেই লেখক বলেছেন—"প্রলয় বন্যায় দেশ ডুবিয়া গেলে অকূল জলরাশির মধ্যে তরুরাজিশোভিত শান্তিনিকেতন গ্রামগুলি যেমন জাগিয়া থাকে, বর্ত্তমান ভারতের মানচিত্রে ব্রিটীশাধিকৃত রক্তিম প্লাবনের মধ্যে হরিতবর্ণ দেশীয় রাজ্যগুলি নিজ অস্তিত্ব এবং সজীবতা বজায় রাখিয়া অতি আরামে সুখ স্বচ্ছন্দে তেমনি জাগিয়া আছে।"

* * * *

"বহিঃশত্রু হইতে সুরক্ষিত একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষশূন্য ভাবে কেবল নিজ রাজ্যটীকে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রজার যথার্থ মা-বাপ রূপে আজ ভারতে এই দেশীয় নৃপতি বর্গ সুখ-সম্পদে, সম্মানে প্রজার পূজ্য হইয়া বিরাজ করিতেছেন।" * * *

"এমন অবাধ সুবিধা, এমন শান্তিময় সিংহাসন ক্ষুদ্র হউক আর বৃহৎ হউক, সমগ্র ভারতের দেশীয় নৃপতিবৃন্দের করায়ত্ত থাকিতে

তাঁহারা যদি নিজ অস্তিত্ব, নিজ দায়িত্ব, ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁহাদের মহত্ত্ব অনুভব করিতে সক্ষম না হন তাহা হইলে তাঁহারা নিতান্তই কৃপার পাত্র।"

দেশীয় রাজ্যে ভারতীয় সাহিত্য শিল্পের পৃষ্ঠ-পোষকতার প্রশংসা করেছেন লেখক। "ভারতীয় সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম্ম এই সকল দেশীয় রাজ্যে আশ্রয় লাভ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে নিজেদের সজীবতা বজায় রাখিতে সক্ষম হইতেছে। ভারত শিল্পের দেশীয় রাজন্যবর্গ যেরূপ পৃষ্ঠপোষকতা অদ্যাপিও করিতেছেন তাহা আজকালকার পলিটীক্যাল রঙ্গমঞ্চের স্বদেশী অভিনয়ের দিনে বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থল বলিয়া মনে করি।"

কিন্তু শুধু প্রশস্তি গান করাই লেখকের উদ্দেশ্য নয়। উপসংহারে দেশীয় রাজ্যের নানা রকম দুর্নীতি ও কুপ্রথার তীব্র সমলোচনা করেছেন লেখক। বলেছেন, এ-সব কুপ্রথা দূর না হ'লে দেশীয় রাজ্যের সর্বনাশ আসন্ন।—

"দেশীয় রাজ্যের দায়িত্ব বোধ পুরা মাত্রায় হওয়া একান্ত দরকার, যাহাতে নবীন ভারতের উন্মাদনার সকল সুর রাষ্ট্র মণ্ডপে বাজিয়া উঠে তাহার আয়োজনই স্পৃহনীয়।"

"দেশীয় রাজ্যের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ" প্রবন্ধে এক জায়গায় তিনি বলেছেন,—"ইহা বোধহয় সর্ববাদিসম্মত হইবে যে দেশীয় রাজ্যের হাতে সমস্ত ভারতবর্ষ কখনও যাওয়া উচিত হইবে না। কারণ ভারতবাসী জানে এবং শুনে দেশীয় রাজাগুলি সবই একাধিপতি রাজা বা নবাব, ইহাদের হাতে ভারতের শাসননীতি ফেলিয়া দেওয়া কখনও নিরাপদ হইতে পারে না।" তাই ব'লে দেশীয় রাজ্যের অধিপতিরা সর্বাংশে মন্দ একথা লেখক মানতে রাজি নন। তিনি বলেছেন,—"ভারতবাসী মনে করে দেশীয় রাজ্যের রাজারা এখনও মূর্খ স্বেচ্ছাচারী, বহু বিষয়ে ইহারা অপরাধী (With a few honourable exceptions) এবং ইহারা কোন পন্থাতেই চলে না। * * * ব্রিটিশ

ভারতে এরূপ আচরণে হয়ত সামান্য একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটও তাঁহাদিগকে সশ্রম জেলের ব্যবস্থা করিবেন।"—এ-ধারণা যে সর্ব্বৈব সত্যি নয় সে সম্পর্কে লেখক বলেন—"বহু পুরুষ যাবত (ছোট হউক —বড় হউক) স্মরণাতীত কাল হইতে একই বংশ শাসন সংরক্ষণ করিতেছেন এমন রাজ্য এবং বংশ এখনো আছে। অবশ্য সকলে যে সুশাসন করিতেছেন তাহা, বলিতে চাই না, কিন্তু শাসন করিয়াছেন ইহা ঐতিহাসিক সত্য। ইঁহাদের কি রাজ্যের উপর মায়া নাই? প্রজার উপর মমতা বা শাসনের উপর অবিচলিত শ্রদ্ধা নাই? * * * * * * এসব রাজারাও তোমার আমার মত ভারতবাসী, উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসেন নাই; এবং সাগরপারে ধনরত্ন লুটিয়া নেন নাই। * * * * আজও যদি ভারতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় তাঁহাদের ধন ভাণ্ডারের দরজা খুলিয়া যায়। সুদূর প্রান্তে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলেও অপর প্রান্তের Despotic রাজার অন্তর তড়িৎপ্রবাহে বেদনা বোধ করে।" এক দেশের শিল্পরথী উপস্থিত হইলেন ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া—কিন্তু দেশীয় নৃপতিদ্বারা তিনি পূজোপহারে অর্চ্চিত হইলেন, এমন দৃষ্টান্ত ও দেখা যায়। বিদ্যার্থী উপস্থিত হইলেন—সাগর পার হইতে বিদ্যার্জ্জন করিয়া ভারতে আসিলেন, তিনি পাইলেন শিক্ষানির্ব্বাহের পূর্ণপাত্র, এ দৃষ্টান্ত আমরা অহরহঃ দেখিতেছি এবং পাইতেছি।"—শেষের কথাগুলি মহারাজ রাধাকিশোর সম্পর্কে ইঙ্গিত ক'রে।

পরিশেষে লেখকের বক্তব্য হচ্ছে—"এই নবযুগে সর্ব্বদেশে যে একটা উন্নতভাব জন্মিয়াছে Indian Princes এহেন সময়ে তাস পাশা সর্ব্বনাশা জানিয়া রাজনৈতিক দাবা খেলায় হাত দুরস্ত করিলে রাজত্বের মূল সঙ্কেতগুলি তাহাদের করায়ত্ত হইতে বেগ লাগিবে না।"

"দেশীয় রাজ্য" প্রবন্ধটি আকারে বৃহৎ। লেখক একদিন এক ইংরেজ বন্ধুর গৃহে নিমন্ত্রিত হন। আহারের সময় কথা প্রসঙ্গে বন্ধুটি বলেন—"Native states, with few honourable exceptions,

are the cancer of India. They should be removed from the map of India." বন্ধুর এই অপ্রিয় ভাষণ দেশীয় রাজ্যবাসী মহিমচন্দ্র সহ্য করতে পারেন নি। তিনি এর জের টেনে এই প্রবন্ধে দেশীয় রাজ্যের পক্ষ সমর্থন করেছেন। এমন কি তিনি এক আমেরিকানের কথা উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন,—"সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়াছিলাম কোন ইংরেজ বন্ধুকে Republican মার্কিন রাজ্যবাসী বন্ধু বলিয়াছেন—"বর্ত্তমান ভারতবর্ষের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া তোমাদের উচিত হইবে ভারতবর্ষ দেশীয় রাজ্যের নিকট সমর্পণ করিয়া দিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে গিয়া বাস করা।"

এ-প্রসঙ্গে দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে তিনি বিশদ আলোচনা করেছেন এবং প্রসঙ্গত মহারানী সুনীতি দেবীর "The autobiography of an Indian Princess"এবং B. M. Malavari-র "Native States" গ্রন্থ থেকে নানারকম উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। সারা ভারতে সামন্ততন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্ভট স্বপ্ন দেখেছেন লেখক। তিনি বলেছেন,—"আজ কেন প্রায় চতুর্দ্দিক হইতে ভারতীয় রাজ্যসমূহের উপর দৃষ্টি পড়িল? আমার বোধ হয় আবহমানকাল প্রায় অনেক রাজ্য, পুরুষানুক্রমে যাহারা শাসন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা প্রজাশাসনে সিদ্ধহস্ত। তাঁহাদের উপর নির্ভর করা দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে বর্ত্তমান সময়ে অনুচিত হইবে না বলিয়া মনে করি। মহাত্মা গান্ধী-ও একজন দেশীয় রাজ্যবাসী এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ দেশীয় রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। কাজেই তিনি ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।"

অবশ্য এর ভালমন্দ সম্পর্কে তাঁর মন একেবারে সন্দেহমুক্ত নয়। এসব রাজ্যের শাসনপ্রণালী সম্পর্কে আগেই অনুসন্ধানের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেছেন তিনি। এ-বিষয়ে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে—"অশিক্ষিত বলিয়া ঘোষিত অথচ প্রাচীন বংশ বলিয়া বিখ্যাত যাহাদের পূর্ব্বপুরুষ অনেকে রামরাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, এই উপস্থিত ব্যারামের সময়

তাহাদের হাতে চিকিৎসার ভার দিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। তবে কথা এই যে, তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা বর্ত্তমান সময়ে যাহা হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে তাঁহারা শাসন করিতে কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন অথবা করিতে পারেন সে বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।"

দেশীয় রাজাদের অধিকাংশই প্রজাপীড়ক হ'য়ে থাকেন এ কথা পরোক্ষে প্রায় স্বীকার করে-ও লেখক তাঁদের পক্ষেই ওকালতি করেছেন।—

"প্রথম দর্শনে ভারতীয় নৃপতি গণকে সর্বপ্রকার উন্নতির অন্তরায় বলিয়া মনে হইলেও তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্টভাবে মিলিত হইবার সুযোগ ঘটিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় এ ধারণা নির্ভুল নহে। ভারতীয় নৃপতিগণের অধিকাংশই সাধারণতঃ বুদ্ধিমান ও প্রজার হিতসাধনে চেষ্টিত, কিন্তু তথাপি তাঁহারা প্রজাপীড়ক একথা উঠে কেন? ইহার কারণ আছে। রাজন্যবর্গও মানুষ, তাঁমাদের মতিগতি তাঁহাদের বাল্যশিক্ষা সংস্কার ও পারিপর্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক সুযোগ সুবিধা অবস্থা বলিতে এখন বুঝিতে হয়—অন্যের চক্ষু, অন্যের দয়া—সরকারী আমলাতন্ত্রের খেয়াল,—এ অবস্থায় কি কাহারও সংস্কারের জন্য উৎসাহ থাকিতে পারে?"

গণতন্ত্রের অভ্যুত্থানের যুগে মহিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধটি একান্ত বেমানান সন্দেহ নেই। সারা ভারতে সামন্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কল্পনা ক'রে তিনি পরিষ্কার বলেছেন—"কিন্তু দশবৎসর মধ্যে ভারতবর্ষ Parliament পাইবার যে আশা অনেকে করিতেছেন, তাঁহারা নিজ নিজ রাজ্যে কখনও Parliament দিবেন, এ আশা বোধহয় সুদূর পরাহত। কারণ, তাঁহাদের পিতা, পিতামহ, কি পৌরাণিকালে অথবা আধুনিক কালে Parliament দ্বারা রাজ্যশাসন করিতে চান নাই এবং তাঁহারাও করিবেন না।"

"দিল্লীর শিল্প প্রদর্শনী" প্রবন্ধে দিল্লীদরবার উপলক্ষে অনুষ্ঠিত

শিল্পপ্রদর্শনী সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন। দিল্লীর দরবারের উদ্দেশ্যে নিয়ে গোড়াতেই তিনি মন্তব্য করেছেন—"রাষ্ট্রনীতি রক্ষার্থ, অথবা লর্ড কার্জ্জনের বাহাদুরির জন্মই হউক কিংবা ভারতীয় নৃপতি-বৃন্দকে নিয়া একটা তামাসা করার জন্মই হউক দিল্লীতে ১৯০৩ সালে একটা দরবার হইয়া গিয়াছে।"—ব্যাপারটার উদ্দেশ্য যাই থাক তার মধ্যে একটি সত্যিকার জিনিস এই শিল্প প্রদর্শনী। লেখক বলেছেন "কিন্তু এ বিরাট ব্যাপারের মধ্যে যাহা কিছু খাঁটি, যাহা কিছু দ্রষ্টব্যের শিক্ষার আক্কেলের জিনিষ তাহা এই শিল্প প্রদর্শনীতে ছিল একথা ভারতবাসী মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে।"

তারপর ভারত শিল্পের উত্থান পতনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। হিন্দু রাজত্বে যে শিল্পের উন্নতি হয় মুসলমান আমলেও তা অক্ষুন্ন ছিল। কারণ মুসলমান নবাবেরা হিন্দু শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।—"ভারতে প্রাচীন সভ্যতার যে একটা সাহিত্য ছিল, ভারতে আর্যদিগের যে প্রতিভা ছিল, যে আরাম ও শান্ত সুশীল ধীরতা ছিল তাহারই মহিমার নিদর্শন স্বরূপ ভারত শিল্প ফুটিয়া উঠিয়াছে। হিন্দুর সাম্রাজ্য পতনের পর মুসলমান তাহার সম্মান দান করিতে কৃপণতা করে নাই, শিক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই, ব্যবহার করিতে ক্রটী করে নাই।" কিন্তু ইংরেজ আমলে এই শিল্পের পতন শুরু হ'ল। কারণ ইংরেজের ভারত শিল্পের প্রতি সহৃদয়তা ছিল না। লেখকের ভাষায়—"তাহার পর ভাগ্যলক্ষ্মী যখন মোগল বাদশাকে ত্যাগ করতঃ ইংরেজ জাতির অঙ্কশায়িনী হইলেন তখন ভারত শিল্প অভিভাবক বিহীনা বিধবার ন্যায় পিতৃকুলে আশ্রয় লইয়া দীনহীন অবস্থাপ্রাপ্তা হইলেন—হিন্দুর বিধবার সাজ পরিয়া নিরাভরণ হইলেন। রাজামহারাজের ঘরে ভারত শিল্প প্রাণহীন প্রাচীনত্বের স্বরূপ গচ্ছিত হইল।"

এই অনাদর অবহেলায় কত অমূল্য শিল্প অন্তর্হিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। রাজামহারাজার ঘরে প্রাচীনত্বের নিদর্শনস্বরূপ ভারত-

শিল্প রক্ষিত হয়েছে সত্যি কিন্তু সমাদরের অভাবে এ সব শিল্পের ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে। তাই, "শিল্পদ্রব্যাদি এখনও অতি প্রাচীন রাজবংশে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শিল্পী আর নাই; তাহারা উপযুক্ত উৎসাহ অভাবে—পৃষ্ঠপোষক অভাবে অন্নাভাবে ব্যবসা হইতে ব্যবসান্তর গ্রহণ করায় বংশ পর্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। এমন কি কোন কোন শিল্প সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে।"

দেশীয় শিল্পের প্রতি আমাদের অবজ্ঞা এবং বিলাতী জিনিসের সমাদরের জন্য ও লেখক দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে দেশীয় রাজাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে এ-সমস্ত শিল্পকে রক্ষা করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁরাও বিলাতীর অনুকরণ করতে আরম্ভ করেছেন। দিল্লীর এই শিল্প প্রদর্শনী থেকে তাঁদের মন আবার দেশীয় শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হ'বে এবং তাঁরা ভারত শিল্পের পুনরুদ্ধারের যত্নবান হ'বেন এই আশা প্রকাশ করেই লেখক প্রবন্ধ শেষ করেছেন।

"দেশীয় রাজগণ ও উপাধিব্যাধি" প্রবন্ধটি খুব কৌতুকপ্রদ। রাজা, রায়বাহাদুর প্রভৃতি উপাধিলাভের জন্য লোক কি রকম লালায়িত তার হাস্যকর বিবরণ দিয়েছেন লেখক। উপাধিপ্রাপ্ত রাজারা যে "হিজ হাইনেস" ব'লে সম্বোধন না করলে কি রকম চ'টে যান তা নিয়েও তিনি কৌতুক করেছেন। একস্থানে তিনি লিখেছেন—

"উপাধিলোলুপতা আমাদের দেশে বৃদ্ধি পাইবার একমাত্র কারণ দশজনের কাছে বেশ যশঃ ও সম্মান সম্ভ্রম লাভের আশা কিন্তু আমরা দেখিতেছি তাহার বিপরীত। মনে করুন একজন টাকার জোরে রাজা হইলেন। * * * যিনি রাজা হইলেন তাহার পত্নী 'রাণী' হইলেন না; ব্যাকরণ শাস্ত্রে এরূপ প্রথা অসিদ্ধ হইলেও ইহা আধুনিক রাজব্যবহার সম্মত বটে।"

আরেক স্থানে এক রাজা সম্বন্ধে একটি মজার গল্প দেওয়া হয়েছে—"একদিন প্রত্যক্ষ করিয়া ছিলাম একজন 'রাজা' ছোট লাটের উদ্যান সম্মিলনীতে কোন রাজপুরুষের নিকট হইতে প্রা[illegible]

আদায়ের লোভে সেলাম ঠুকিবার জন্য আসে পাশে ঘুরিতে ছিলেন। সাহেবটি একজন সেক্রেটারী, সঙ্গে মেম ছিলেন। * * * * রাজা নাছোড়বান্দা, আর ধৈর্য ধরিতে পারিলেন না; সম্মুখে যাইয়া হাতখানি বাড়াইয়া দিলেন বটে; কিন্তু সাহেব 'Good morning Raja how do you do ?' বলিয়া চলিয়া গেলেন। মেমটি রাজার বেশভূষা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'Who is this living cushion ?' তারপর লেখক নিজেই প্রশ্ন করেছেন—"এমন কৌতুহলোদ্দীপক হাস্যরসাত্মক সজ্জা লইয়া রাজা নাম ফলাইবার দরকার কি ?"—আপাত হাস্যরসাত্মক হ'লেও এই উপাধিব্যাধিকে একটি জটিল ব্যাধিরূপে গণ্য ক'রে তার উপযুক্ত চিকিৎসার উপায় নির্ধারণ ক'রেছেন লেখক।

Montford Reform প্রবর্তিত হ'বার পর ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলিতে ও স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের জন্য যে আন্দোলন দেখা দেয় তারই সমলোচনা করা হয়েছে "দেশীয় রাজ্যের বর্তমান সমস্যা" প্রবন্ধে। ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যকে এক ক'রে দেওয়ার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন লেখক। যদিও এ-আন্দোলনের মূল কারণ সম্পর্কে তার মনে কোন সংশয় নেই। দেশীয় রাজাদের যে বিলাস ও দুর্নীতি চলেছে সে-কথা তিনি পরিষ্কার স্বীকার করেছেন।—"দেশীয় নৃপতির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে। তাঁহারা আদুরে দুলাল, আপনাদের আমোদ প্রমোদে আটখানা, প্রজার অর্থে আপনার রাজভোগ যোগান, রিপু চরিতার্থতায় জীবনের আয়ু ক্ষয় করেন, বিলাতে, য়ুরোপে, দেশে ইহাদের অনেকের জীবন ইন্দ্রিয় শিকারে রং তামাসার রঙীন তাসেরই মত। মানুষ খেলিতে পারে যখন পেটে অন্ন থাকে, কিন্তু অন্নহীন বসন ভূষণ ক্লিষ্ট প্রজারা এই সব রঙীন তাসের খেলা ভারতে আর কতদিন চলিতে দিতে পারে।"—এসব কথার সত্যতা স্বীকার করেছেন লেখক। কিন্তু তার জন্য ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য

এক ক'রে দেবার প্রস্তাব তিনি সমর্থন করেন নি। তাঁর মতে ব্রিটিশের লাল ফিতার শাসনই রাজ্য শাসনের চরম উৎকর্ষ নয়। দেশীয় রাজ্যগুলিতে ভারতীয় আদর্শে শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত হওয়া প্রয়োজন—"ইহা স্বীকার্য যে দেশীয় নৃপতিরা প্রাচীন ভারতের বিরাট আদর্শের অনুপাতে পর্ব্বতের নিকট বল্মীকস্তূপ বিশেষ।"—তবু ও তিনি আশা পোষণ করেন, এঁদের দ্বারাই গৌরবময় ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি তিনি উপেক্ষা করেন নি। তিনি বলেছেন—"আর জগতে সর্ব্বত্র মানুষ স্বাধিকার প্রমত্ত। সে অধিকার হইতে মানুষকে বঞ্চিৎ রাখা যুগধর্মের প্রতিকূল এবং স্বভাব বিরুদ্ধ হইবে। অতএব দেশীয় রাজ্যগুলিতে স্বায়ত্বশাসন প্রণালী ভারতীয় আদর্শ অনুপাতে প্রবর্তিত হইলে সেখানেই প্রকৃত স্বরাজ লাভ হইবে এবং ভারতীয় শক্তি এবং মেধার পরিচয় পাওয়া যাইবে।"—অবশ্যি এই 'ভারতীয় আদর্শ' বলতে লেখক কি বোঝেন তা কোথাও স্পষ্ট করে বলা হয় নি।

এর পরই প্রথম খণ্ডের শেষ।

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ডের বেশির ভাগ প্রবন্ধই ত্রিপুরাকে নিয়ে লেখা। শুধু শেষের দুইটি প্রবন্ধে মণিপুর ও মহীশূর রাজ্যের বর্ণনা আছে।

প্রথম প্রবন্ধটির নাম 'ত্রিপুরায় বীরচন্দ্র।' আগেই বলেছি মহিমচন্দ্র বীরচন্দ্র মাণিক্যের এডিকং ছিলেন। মানুষ বীরচন্দ্রকে খুব কাছে থেকে দেখবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। বীরচন্দ্র কূটনীতি-বিশারদ রাজ্য শাসক ছিলেন। কিন্তু তাঁর সবচাইতে বড় পরিচয় তিনি ছিলেন ভক্ত, রসিক, কবি ও গায়ক। আলোচ্য প্রবন্ধে বীরচন্দ্রের বিভিন্নমুখী ব্যক্তিত্বের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন লেখক।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটির নাম 'ঝুলন-স্মৃতি।' নাম শুনে মনে হ'বে ত্রিপুরার ঝুলন উৎসবকে নিয়ে এ-প্রবন্ধ লেখা, এবং তা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আসলে ব্যাপার অন্যরকম। ঝুলন উৎসবকে

উপলক্ষ ক'রে লেখক ধান ভানতে শিবের গীত গেয়েছেন। বীরচন্দ্র মাণিক্যের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের জটিলতাই প্রবন্ধের উপজীব্য।

'হোরি, প্রবন্ধটি ত্রিপুরার হোলি উৎসবকে নিয়ে লেখা। ত্রিপুরার জাতীয় উৎসব হোলি। এই হোলির দিনে সমগ্র ত্রিপুরায় এক আনন্দের প্রাণবন্যা বইতে থাকে। হোলিকে উপলক্ষ ক'রে প্রতি বছর নানা রকম গান রচিত হয়। বীরচন্দ্র মাণিক্যেরও হোলির গান রয়েছে। প্রবন্ধের গোড়াতেই লেখক বলেছেন—"রাজপুতানায় যেমন ফাগ উৎসব—ত্রিপুরায় তেমনি হোরি। রাজা হইতে প্রজাবৃন্দ এ উৎসবে সকলে মাতোয়ারা; সাধ্য কি কাহারও যে সেদিন পরিধেয় বস্ত্রের শুভ্রতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। সেদিন যে লালে লাল, ফাগের দাগে ত্রিপুরার হৃদয় রক্ত রাঙা ভাবময়,—সেদিন কে কাহাকে মান্য করে! কে ছোট কে বড়—আনন্দ—আনন্দ——হোরি—ফাগুয়া! হরষ পরশে সব একাকার!

তারপর তিনি বীরচন্দ্রের একটি গান দিয়েছেন—

"লালে লাল আজি কাল তনু,
বৈর নারী শত, একলা কানু
পড়েছে ছিঁড়িয়া নব গুঞ্জ ছড়া
হেলিয়া পড়েছে মোহন চূড়া।"

এরপর আছে হোলি উৎসবের মনোজ্ঞ বর্ণনা। বীরচন্দ্রের সুরুচি সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন লেখক। এ প্রসঙ্গে একটি বাঈজির গল্প রয়েছে। বীরচন্দ্র রসিক পুরুষ ছিলেন। কিন্তু অশ্লীলতার ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। বাঈজির গল্পটি থেকে তা-ই প্রমাণ হয়।

বীরচন্দ্রের দরবারে গুণী ও রসিকের আশ্চর্য সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁর দরবারী কবি গায়ক ও বাদকদের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। তারপর দুটি হোলির গান দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করা হয়েছে।

"বীরচন্দ্রের শাসনে জেল" প্রবন্ধে তখনকার ত্রিপুরার জেল ব্যবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সাধারণ জেল ছাড়া-ও সম্মানিত ব্যক্তিদের সামান্য অপরাধের জন্য বিশেষ জেলের ব্যবস্থা ছিল। প্রবন্ধের শেষে লেখক বলেছেন—"পূর্ব্বে 'আলঙ্গ' নামে একপ্রকার জেইল ছিল। সে আলঙ্গের আমরা ৪ পুরুষ সর্দ্দার ছিলাম। তাহাতে নানা শ্রেণীর লোক পড়িত কিন্তু দেশকাল পাত্রভেদে তাহাদের বসবাসের বন্দোবস্ত ছিল পৃথক পৃথক রকমে। রাজ সম্পর্কান্বিত ব্যক্তিবর্গ, ঠাকুর পরিবার, ও অপর ভদ্রলোকের প্রচুর ও নানা উপাদেয় আহার বিহারের বন্দোবস্ত ছিল, আমরা শিশুকালে মিষ্টান্ন প্রয়াসী বালকবৃন্দ বলিতাম—

"জামাই এলে খাই ভাল" কারণ এইরূপ কারাবাসকে লোকে "শ্বশুর বাড়ী" আখ্যা দিয়াছিল। সেই দিনের কথা (১৮৯৫ খৃঃ) Late Mr. Mc Minn আমাদের জেইল পরিদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"The prisoners seem to enjoy family comforts."

এরপর আছে তার বিখ্যাত প্রবন্ধ 'ত্রিপুর দরবারে রবীন্দ্রনাথ।' ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ ইতিহাস রচনার পক্ষে এ-প্রবন্ধটি অত্যন্ত মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পর্ক অতি নিবিড়। এই সম্পর্কের সূচনাও রবীন্দ্রনাথের ত্রিপুরায় আগমন ইত্যাদি এ-প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে।

ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে অনেক আগে থেকেই ত্রিপুরার মহারাজের পরিচয় ছিল। মহিমচন্দ্র লিখেছেন—

"পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছিলাম, বীরচন্দ্রের পিতা মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য কোন গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যা লইয়া কলিকাতায় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাহায্যপ্রার্থী হন। প্রিন্স দ্বারকানাথ (রবীন্দ্রনাথের পিতামহ) তখনকার কলিকাতা সমাজের এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রের নেতা। তাঁহারি সহায়তায় মহারাজ কৃষ্ণকিশোর সে যাত্রায় সফলকাম হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

সেই সময়েই ত্রিপুর রাজপরিবারের সহিত জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের প্রথম পরিচয় হয়।"

এরপর বীরচন্দ্রের সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ ঘটে। এ যোগাযোগ যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি সুন্দর। লেখকের ভাষায় বলি—

"প্রিয়তমা প্রধানা মহিষীর অকাল মৃত্যুতে প্রৌঢ় বীরচন্দ্রের হৃদয় অসহনীয় প্রিয়-বিরহ শোকাকুল হইয়া উঠে। তখন তিনি বিরহীর মর্ম্মবেদনা কবিতার লহরে লহরে গাঁথিতেছিলেন। এমনি সময়ে কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথ বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া "ভগ্ন হৃদয়" নামে এক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। কবি বীরচন্দ্রের তখনকার মানসিক ভাবের সহিত "ভগ্ন হৃদয়ের" কবিতাগুলি সায় দিয়াছিল। গুণগ্রাহী বীরচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের তখনকার এই কাঁচা লেখার মধ্যেও তাঁহার অন্তকার বিশ্ববিমোহন কাব্যপ্রতিভার প্রথম সূচনা দেখিতে পাইয়া তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী স্বর্গীয় রাধারমণ ঘোষকে কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট প্রেরণ করেন, "ভগ্নহৃদয়" কাব্যগ্রন্থ মহারাজকে প্রীত করিয়াছে, তজ্জন্য তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে। ইতিপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের বা তাঁহার পরিবারের কাহারো সহিত বীরচন্দ্রের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। এ সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন—

"মনে আছে এই লেখা বাহির হইবার কিছুকাল পরে কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের মন্ত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসেন, কাব্যটি মহারাজের ভাল লাগিয়াছে এবং কবির সাহিত্য সাধনার সফলতা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন, কেবল এইটি জানাইবার জন্য তিনি তাঁহার অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।"

তারপর এই পরিচয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হ'ল। মহিম চন্দ্র লিখেছেন—

"বীরচন্দ্র মাণিক্য কলিকাতায় যখনি যাইতেন, তখনি রবিবাবুকে ডাকাইয়া আনিতেন। বয়সে এই দুই কবির বিশেষ পার্থক্য থাকিলেও বীরচন্দ্র বাৎসল্যভাবে কিশোর সৌম্যদর্শন কবি রবীন্দ্রনাথের মুখে কবিতাপাঠ এবং সঙ্গীত শুনিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। তখন আমিও বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া বীরচন্দ্রের সেবায় দরবারে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। রবীন্দ্র পিতৃতুল্য বীরচন্দ্রের নিকট কবিতাপাঠ বিশেষতঃ গান করিতে নিতান্ত সঙ্কোচবোধ করিতেন। কিন্তু বীরচন্দ্রের স্বভাব সুলভ উৎসাহে রবীন্দ্রনাথের সঙ্কোচের বাধা অতিক্রম করা সহজসাধ্য হইত। আমরা যখন কলিকাতা হইতে ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারকল্পে মহারাজ বীরচন্দ্রকে লইয়া কার্সিয়াংএ গমন করি, তখন মহারাজ, কবি রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া লইলেন। তখনকার কথা আমার বেশ স্মরণ আছে। রাত্রি প্রায় ১০টা বাজিয়া যাইত, অবিশ্রান্ত ভাবে মহারাজ রবীন্দ্রনাথকে লইয়া সঙ্গীত এবং কাব্য আলোচনায় মগ্ন থাকিতেন ; বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেন।"

বীরচন্দ্র মাণিক্যের পুত্র রাধাকিশোরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধুতা ছিল। তাঁর সময়েই রবীন্দ্রনাথ প্রথমে আগরতলায় আসেন। রাজ্যের খুঁটিনাটি বৈষয়িক ব্যাপারেও রাধাকিশোর রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ নিয়ে চলতেন। নিবিড় বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ তাঁর "কাহিনী" কাব্যগ্রন্থ রাধাকিশোরের নামে উৎসর্গ করেছেন। এই বন্ধুত্বের সুচনা ও পরিণতি বর্ণনা করেছেন লেখক :—

"রবিবাবুর সঙ্গে রাধাকিশোর মাণিক্যের যুবরাজ জীবনে কলিকাতায় পিতার দরবারে একবারমাত্র ক্ষণকালের জন্য দেখা হইয়াছিল। বিশিষ্ট ইংরাজ কর্ম্মচারীর হঠাৎ আবির্ভাবে, আলাপ বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। সেই মুহূর্ত্তকাল দর্শনেই একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, গুণী ব্যক্তি, গুণীকে আকর্ষণ করিয়া লইলেন।

তারপর বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পর রাধাকিশোর ত্রিপুরার রাজা হন। তিনি তখন স্বল্প পরিচিত রবীন্দ্রনাথকে কাছে টেনে নিলেন। তাঁর আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ আগরতলায় আসেন। মহিমচন্দ্র তার বর্ণনা দিয়েছেন,—

"রবিবাবু সেইবার প্রথম আগরতলা রাজধানীতে আসিলেন; তখন বসন্তকাল—রাজধানীর উত্তরভাগে কুঞ্জবনের বসন্তোৎসবে কবি-সম্মিলনের ঘটা, রাজা প্রজার সমব্যবহার, কবি রবীন্দ্রনাথের যুগপৎ আনন্দ এবং বিস্ময় উৎপাদন করিল। মহারাজ রাধাকিশোরের মহৎ চরিত্রের মহানুভবতা দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন।"

রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমেই বাঙলার মনীষী-সমাজে রাধাকিশোর পরিচিত হন। তিনি কলকাতায় গেলে সংগীত সমাজের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জন" অভিনীত হয়। কবি নিজে রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় করেন। আর নাটোরের মহরাজ রবীন্দ্রনাথের রচিত গান গেয়ে মাল্যচন্দনে মহারাজকে সম্বর্ধনা করেন।

পারিবারিক ব্যাপারেও রাধাকিশোর রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ নিতেন। এ রকম একটি ঘটনার বিবরণ আলোচ্য প্রবন্ধে রয়েছে। —"যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোরের 'শিক্ষা' সম্বন্ধে মহারাজ রাধাকিশোর বিশেষ ভাবিত হইয়া পড়িলে, রবীন্দ্রনাথ আসিয়া কথঞ্চিৎ সে সমস্যার সমাধান করিলেন। তাঁহারি চেষ্টায়, প্রফেসার নগেন্দ্রনাথ এবং মোক্ষদাকুমার বসু বি. এ. মহাশয়ের মত শিক্ষক পাওয়া সহজ হইয়াছিল। তৎপর যুবরাজের শিক্ষা লইয়া যখন গভর্ণমেণ্ট পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদেশের অন্যতম সমকক্ষ কোচ-বিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের পরামর্শ গ্রহণ করিতে বলেন এবং এই বঙ্গ-গৌরব মহারাজদ্বয়ের পরিচয়ের সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন।"

রাধাকিশোর বাঙলা সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। কবি হেমচন্দ্র যখন শেষ জীবনে অর্থাভাবে পড়েন তখন রবীন্দ্রনাথের মারফতেই

তিনি কবির জন্য মাসে ত্রিশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করেন আর কবিকে অনুরোধ করেন এ-খবর যেন গোপন থাকে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মহিমচন্দ্রকে লেখেন—

"হেমবাবুর সাহায্যার্থে মহারাজ যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহাতে এখানে চতুর্দিকে ধন্য ধন্য পড়িয়াছে। এ কথা গোপন রাখা আমার সাধ্যাতীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে হেমবাবুও অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা বোধ করিতেছেন। মাঝে হইতে মহারাজের কল্যাণে যশের কিয়দংশ আমার কপালেও পড়িয়াছে।"

এখানে রাধাকিশোরের বদান্যতার আরেকটি বিবরণ আছে। জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞানাগারের জন্য রবীন্দ্রনাথ অর্থ সংগ্রহে ব্রতী হন। রাধাকিশোর তখন কলকাতায় ছিলেন। কবিকে প্রার্থীরূপে আসতে দেখে তিনি বললেন—"এ বেশ আপনাকে সাজে না, আপনার বাঁশী বাজানই কাজ, আমরা ভক্তবৃন্দ ভিক্ষার ঝুলি বহন করিব। প্রজাবৃন্দের প্রদত্ত অর্থই আমার রাজভোগ যোগায়। আমাদের অপেক্ষা জগতে কে আর বড় ভিক্ষুক আছে? এ ভিক্ষার ঝুলি আমাকেই শোভা পায়, আমাকেই ইহা পূর্ণ করিতে হইবে।" এটা ছিল যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোরের বিয়ের সময়। রাধাকিশোর বললেন—"বর্ত্তমানে আমার ভাবী বধূমাতার দু এক পদ অলঙ্কার নাই বা হইল, তৎপরিবর্তে জগদীশবাবু সাগরপার হইতে যে অলঙ্কারে ভারতমাতাকে ভূষিত করিবেন, তাহার তুলনা কোথায়?"

১৩১৫ ত্রিপুরাব্দের ১৭ই আষাঢ় রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে ত্রিপুরায় প্রথম সাহিত্য সভা স্থাপিত হয়। সে সভার বর্ণনায় লেখক বলেন—"সে বিরাট সভার মঞ্চোপরি একটি আসন মহারাজ রাধাকিশোরের জন্য, অপরটি সভার সভাপতি রবীন্দ্রনাথের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সভারম্ভে রবিবাবুকে সভাপতি পদে বরণ করিয়া মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য সর্বসাধারণের সমসূত্রে আসন গ্রহণ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ সসঙ্কোচে মহারাজকে নির্দিষ্ট আসনে বসিতে অনুরোধ করিলে, মহারাজ বলেন—

"সাহিত্যক্ষেত্রে আপনার স্থান সর্বোপরি, আপনি সাহিত্যের রাজা, আমি আপনার ভক্ত বন্ধু মাত্র, উচ্চ মঞ্চ আমার স্থান নহে।" দর্শক এবং উপস্থিত প্রজাবৃন্দ মহারাজের বিনয়নম্র ব্যবহারে মুগ্ধ এবং গৌরবান্বিত বোধ করিল, কবি রবীন্দ্রনাথ এ দৃশ্য দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন।"

ওপরের বিবরণ থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি মহারাজ রাধাকিশোরের গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের সেদিনকার অভিভাষণের অংশবিশেষ আলোচ্য প্রবন্ধে উদ্ধৃত হয়েছে, তার থেকে খানিকটা নিচে দিচ্ছি।......

"এই ত্রিপুরা রাজ্যের রাজচিহ্নের মধ্যে সংস্কৃত বাক্য অঙ্কিত দেখিয়াছি—'কিলবিদুর্বীরতাং সারমেকং'—বীর্যকেই সার বলিয়া জানিবে। এ কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। পার্লামেণ্ট সার নহে, বাণিজ্য-তরী সার নহে, বীর্য্যই সার। এই বীর্য্য দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে নানা আকারে প্রকাশিত হয়—কেহ বা শস্ত্রে বীর, কেহ বা শাস্ত্রে বীর, কেহ বা ত্যাগে বীর, কেহ বা ভোগে বীর, কেহ বা ধর্ম্মে বীর, কেহ বা কর্ম্মে বীর।"

ত্রিপুর রাজ্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর আকর্ষণ সম্পর্কে সেদিনকার অভিভাষণে তিনি বলেন—"দেশীয় রাজ্যের ভুলক্রটি মন্দগতির মধ্যেও আমাদের সান্ত্বনার বিষয় এই যে, তাহাতে যেটুকু লাভ আছে, তাহা বস্তুতই আমাদের নিজের লাভ। তাহা পরের স্কন্ধে চড়িবার লাভ নহে, তাহা নিজের পায়ে চলিবার লাভ। এই কারণেই আমাদের বাংলাদেশের এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরারাজ্যের প্রতি উৎসুক দৃষ্টি না মেলিয়া আমি থাকিতে পারি না।"

রাধাকিশোরের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বের ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে ও রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। এ সম্পর্কে মহিমচন্দ্রের বক্তব্য উদ্ধৃত করেই এ প্রবন্ধের আলোচনা শেষ করি।

"রবিবাবুর প্রতি রাধাকিশোরের বন্ধুতা এবং আত্মীয়তার সীমা

ছিল না। সাহিত্যের প্রচার বা রাজকার্য্যে সুশৃঙ্খলতা এবং উন্নতি সম্পর্কে রবিবাবুর মত এবং সাহায্য গ্রহণ করিতেন। রবিবাবুর কাব্য প্রতিভায় যেমন আকৃষ্ট ছিলেন, তেমনি তাঁহার কর্মভূমি শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয়ের প্রতি ও তাঁহা সহানুভূতি ছিল। * * * * ত্রিপুর রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি রবিবাবুর আন্তরিক দৃষ্টি ছিল—মন্ত্রী নির্ব্বাচনেও মহারাজ তাঁহার মতামত গ্রহণ করিতেন। এ সব ব্যাপারে লিপ্ত থাকায় এ রাজ্যের কর্ম্মচারী মহলে তাঁহার সঙ্গে এ রাজ্যের সম্বন্ধ লইয়া নানা কথা উঠিয়া আগরতলার মত ক্ষুদ্র স্থানকেও তোলপাড় করিত। সেজন্য কবির মনে সময় সময় চাঞ্চল্য এবং রাজ্য সম্বন্ধে বীতস্পৃহা উপস্থিত হইত, কিন্তু রাধাকিশোরের অকৃত্রিম বন্ধুতা এবং স্নেহ তাঁহাকে ত্রিপুরার সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হইতে দেয় নাই। সেই জন্যই এই দুই মহানুভবের বন্ধুত্বের গভীরতা ক্ষুদ্র দলাদলির ফাঁকা সোরগোলে কিছুমাত্র বিচলিত হইত না। বাঙ্গালা দেশের রাজা, বাঙ্গালী কর্ম্মচারী চালিত রাজ্যের ত্রুটি বিচ্যুতি, বাঙ্গালীরই কলঙ্কের পরিচায়ক বলিয়া রবিবাবুর মনকে আঘাত দিত। সেই জন্যই ত্রিপুরার মঙ্গল এবং উন্নতির জন্য যিনি সর্ব্বদা উৎসুক এবং চেষ্টিত আছেন। এ রাজ্যেই বাঙ্গালী মস্তিষ্কের সুব্যবহার হইবে, বাঙ্গালী প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত হইয়া অন্যান্য রাজ্যের স্থল হইবে এ আশা এখনো তিনি হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন।"

'ত্রিপুরা প্রসঙ্গ' প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কুমিল্লা শাখার বিশেষ অধিবেশনে পাঠ করা হয়। এর থেকেই আমরা জানতে পারি ছাত্র জীবনে মহিমচন্দ্রের সোনার চেনের সঙ্গে একটি মোহর ছিল। তা'তে মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য ও মহারানী গুণবতীর নাম বাঙলায় লেখা ছিল। তাই দেখে বিদ্যাসাগর মহাশয় উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন এবং মহিমচন্দ্রকে এসিয়াটিক সোসাইটিতে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কাছে নিয়ে গেছলেন।

এই প্রবন্ধে ত্রিপুরায় বাঙলা ভাষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক বলেছেন—"ত্রিপুরার মহিলাকুলও বঙ্গভাষা চর্চ্চা করিতেন ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি নানুয়া দেবীর নাম করেছেন। নানুয়া ছিলেন মহারাজ দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের পত্নী। "নানুয়া" তার ডাক নাম ছিল। পিতামহ মহারাজ মহেন্দ্র মাণিক্য আদর ক'রে নাতবৌকে নানুয়া বলে ডাকতেন। তাঁর সম্পর্কে মহিমচন্দ্র লিখেছেন—"এই ধর্ম্মশীলা বা নানুয়া দেবী বঙ্গভাষায় পণ্ডিতা ছিলেন এবং পার্শী ভাষাতেও তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। অনেক অনুসন্ধান করিয়া পার্শী ভাষায় গজল নামক সঙ্গীতের কয়েক টুকরা সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতদঞ্চলের উচ্চারণ দোষে ইহা পাঠ করিতে পারিতেছি না। বাঙ্গালা ভাষায় একখানা গ্রন্থ ছিল, তাহার নাম এখন লুপ্ত। কেবলমাত্র একটি গানের পালা পর্ব্বত অঞ্চলবাসী লোকেরা গাহিয়া থাকে। তাহাও সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, এবং সংগ্রহ করা শ্রমসাধ্য বটে।"

তারপর তিনি কৃষ্ণমাণিক্যের পত্নী জাহ্নবী দেবীর নাম করেছেন। ইনি বাঙলা ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। আখাউড়া রেল স্টেশনের কাছে রাধামাধবের মন্দির তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরে একটি শিলালিপি আছে। এটি সংস্কৃতে লেখা। "সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞা মহারাণী জাহ্নবী এই বচনের সৃষ্টিকর্ত্রী।" তারপর লেখক বলেছেন—"মোগরা গ্রাম নিবাসী সেনাপতি বংশীয়েরা আমার মাতুল সম্পর্কান্বিত। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত অর্চ্চামূর্ত্তি রাধামাধব দেবতার উদ্দেশ্যে যে সব সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আমার মাতুল স্বর্গীয় রামশঙ্কর সেনাপতির নিকট দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

ত্রিপুরার আরো কয়জন মহিলারই সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। দুর্গামাণিক্যের পত্নী মহারাণী সুমিত্রা দেবীর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ভাগবত শাস্ত্রে বিদুষী ছিলেন। তাঁর কন্যা আনন্দময়ী দেবী সম্পর্কে মহিমচন্দ্র বলেছেন—"আমি তাঁহার জী।বতাবস্থায় দেখিয়াছি,

তিনি তৈলের প্রদীপ জ্বালিয়া গ্রন্থপাঠ করিতেছেন এবং উপস্থিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেছেন। জানিতে পারিলাম শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছে। তিনি রাস পঞ্চাধ্যায় ব্যাখ্যা করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অমরকোষ মুখস্থ বলিয়া যাইতেছেন।"

তারপর তিনি কবি অনঙ্গমোহিনীর নাম করেছেন। প্রসঙ্গত তাঁর 'প্রীতি' গ্রন্থ থেকে একটি কবিতা উদ্ধৃত করেছেন লেখক।

পরিশেষে রাধাকিশোর মাণিক্যের প্রসঙ্গ রয়েছে। রাধাকিশোর ইংরেজী জানতেন না, কিন্তু বাঙ্গলায় তাঁর বিশেষ দখল ছিল। এ সম্পর্কে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর মন্তব্য দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন—"The Maharaja was a great scholar in the vernacular, though he was totally unacquainted with the English language."

"ত্রিপুরায় বঙ্গভাষা" প্রবন্ধের নামকরণের অর্থ ঠিক বোঝা গেল না। এর মধ্যে ত্রিপুরায় বাঙলাভাষার প্রসার সম্পর্কে কোন আলোচনা নেই। ত্রিপুরায় নববর্ষ উৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। হিন্দুদের প্রচলিত পূজাপদ্ধতি ছাড়াও ত্রিপুর জাতির নিজস্ব উৎসব অনুষ্ঠান আছে। এ সম্পর্কে মহিমচন্দ্র লিখেছেন—"আমরা দেখিতে পাই দৈবকার্য্যে শিল্প জিনিস ব্যবহার করা প্রাচীন হিন্দুকুলের প্রথা। এমন কি এই প্রথা অনুকরণ করিতে যাইয়া হিন্দুকুলে নব-প্রবেশী জাতিও এই প্রথা অনুকরণ করিতে একান্ত ব্যগ্র। দেবকাজে এই প্রথা ত্রিপুর রাজপরিবারে আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। নববর্ষে ত্রিপুরা পূজা "গরাই" অর্থাৎ গৌরী নামক দেবতার অর্চ্চনা হইয়া থাকে। এই অর্চ্চনা যদিও আজকাল তেমন সমারোহে সম্পন্ন হয় না কিন্তু State ভাবে রাজসিংহাসনের সম্মুখে এখনও এই পূজা হইয়া থাকে। এই দেবতার পূজোপকরণ মধ্যে আমরা দেখিতে পাই রাজার দর্পণ ও রাণীর রিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, এবং ঐ সব জিনিসের পূজা পৃথকভাবে হইয়া থাকে। রাজার দর্পণ এবং মাই

দেবতার রিয়া পূজা হইবে না—তবে পূজা হইবে কোন্ দেবতার? "মাতা ঈশ্বরীর" বক্ষবন্ধনী দেবোপচারে পূজা হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? রাজবাড়ীতে সময় সময় বিশেষতঃ মহারাজার যাত্রার সময় এবং শুভ বিবাহাদির কার্য্যে "লাম্প্রা" পূজা হইয়া থাকে। এই 'বিনাইগর' নামক হিন্দুদেবতার পূজা। বিনাইগর অর্থাৎ বিনায়ক গণেশ পূজা। এই পূজায় শ্রীশ্রীমতী ঈশ্বরীর রিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।"

ওপরের বর্ণনা থেকে সহজেই বোঝা যায় ত্রিপুর জাতির নিজস্ব পূজাপ্রথাকে কেমন ভাবে হিন্দুরূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে। এখানে বলে রাখা ভাল ত্রিপুরার মেয়েদের বক্ষাবরণ বস্ত্রকে 'রিয়া' বলে। রাজ পরিবারের মহিলারা পর্যন্ত রিয়া বুনতে ভালবাসেন। এর মধ্যে নানারকম গাছপালা জীবজন্তুর নক্সা তোলা হয়। রিয়া ত্রিপুরার বিশিষ্ট শিল্প নিদর্শন।

'বার্ষিক' প্রবন্ধটি আকারে ছোট। ত্রিপুরা রাজপরিবার থেকে একটি বার্ষিকী প্রকাশিত হ'ত, তার নামই "বার্ষিক"। এই বার্ষিক প্রবন্ধটি ১২৮৬ ত্রিপুরাব্দের লেখা। এখানে ত্রিপুরার ইতিহাসের এক বীরাঙ্গনার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। মহারাজ কীর্তিধরের সময় হীরাবন্ত খাঁ নামে এক ধনী বণিকের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজের বিরোধ উপস্থিত হয়। হীরাবন্তর পক্ষ অবলম্বন ক'রে গৌড়েশ্বর ত্রিপুরার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। মহারাজ ভয়ে সন্ধি করতে মনস্থ করেন, কিন্তু রাজমহিষী সৈন্যদের উৎসাহিত করে নিজে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তাঁর প্রবল বিক্রমে গৌড়সৈন্য পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাসের এই গৌরবময় অধ্যায়টি নিয়ে মহিমচন্দ্র একটি কবিতা লিখেছেন। গদ্যরচনার মত কবিতা রচনায়ও যে তাঁর পাকা হাত ছিল এই থেকে তাই প্রমাণ হয়।

"ত্রিপুরার শিল্প" প্রবন্ধে লেখক ত্রিপুরার বিশিষ্ট শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। রিয়া, সুজনি ইত্যাদি ত্রিপুরার বিশিষ্ট শিল্প

নিদর্শন। রিয়া হচ্ছে মেয়েদের বক্ষাবরণী আর শুজনি হচ্ছে বসবার আসন। ত্রিপুরার প্রাচীন শিল্পগৌরব সম্পর্কে লেখক বলেছেন—"প্রাচীনকালে ত্রিপুরা রাজ্য সাম্রাজ্যের ন্যায় বিস্তৃত ছিল। আরাকান হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত তাহার বিস্তৃতি ছিল। ত্রিপুরার আর্ট এই সুবিস্তীর্ণ দেশ প্রদেশের আচার ব্যবহার বক্ষে করিয়া লইয়া গিয়াছিল।"

আধুনিক সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার প্রাচীন শিল্প ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। এগুলিকে রক্ষা করবার আবেদন জানিয়ে লেখক প্রবন্ধ শেষ করেছেন।

এর পরের প্রবন্ধটির নাম 'মণিপুর চিত্র'। চিত্রাঙ্গদার দেশ মণিপুর এক স্বপ্নময় রাজ্য। এ রাজ্যের সঙ্গে ত্রিপুরার কুটুম্বিতা বহুদিনের। সেই সুবাদে ত্রিপুরার মহারাজের সঙ্গে মহিমচন্দ্র একবার মণিপুরে গিয়েছিলেন। এই প্রবন্ধে তখনকার অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে।

মৃদঙ্গমুখর মণিপুরের মর্ম্মের মাঝখানটিতে প্রবেশ করেছেন লেখক। আনন্দ নির্ঝর নৃত্যচঞ্চল মণিপুরের স্বপ্নময় পরিবেশটি তাঁর লেখনী মুখে মোহনীয় হ'য়ে ফুটে উঠেছে। সেখানকার কতগুলি খুঁটিনাটি চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। তার থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

রসের দেশ মণিপুর। রসিকতা মণিপুরীদের মজ্জাগত। এ সম্পর্কে লেখক বলছেন—"মণিপুরে যাহা দেখিলাম এবং যাহা শুনিলাম তাহাতে এ জাতি যে প্রচুর আমোদী তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। মণিপুর স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ। পথে—ঘাটে—বাজারে মণিপুরবাসিনীদের একচেটিয়া গতিবিধি—তাহারা যেমন রসিকা, তেমনি সরস আমোদিনী। মণিপুরে কোন আমোদ প্রমোদই স্ত্রীলোক ছাড়া হইবার জো নাই। পদে পদে রসিকতা ইহাদের আয়ত্তাধীন। মণিপুরের বাজারের নাম 'সোনার বাজার'। সেই বাজারে

গেলে, দেখা যায় কে যেন গোলাপ ছড়াইয়া দিয়াছে। এ বাজারে স্ত্রীলোকই গ্রাহক, স্ত্রীলোকই বিক্রেতা, এই বাজারে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। এমন কি, যদি কোনক্রমে পুরুষ তথা উপস্থিত হয়, তবে তাহার অদৃষ্টে প্রচুর সরস লাঞ্ছনা—অভিসম্পাত লাভ সুনিশ্চিত। আমাদের সঙ্গী কোন এক কুমারবংশীয় সন্তান এই বাজার দেখিবার জন্য গিয়াছিলেন,—বেচারীকে অপদস্থ হইতে হইয়াছিল। ললনাসুলভ রসিকতায় এবং কটাক্ষপাতে তাঁহার প্রায় মুণ্ডপাত হইয়াছিল।" তারপর সেই কৌতুককর ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক।

তারপর আছে মণিপুরীদের পোষাকের বর্ণনা। "সকালে মণিপুরীগণ কৃষিক্ষেত্রে রীতিমত পরিশ্রম করে—কিন্তু বৈকালে ইহারা সুসজ্জিত হইয়া নগর ভ্রমণে অথবা আমোদ প্রমোদের স্থানে গতিবিধি করে। মাথায় উষ্ণীষ, পরণে ত্রিকচ্ছ বসন এবং একখানা ধপ্ধপে সাদা চাদরে শরীর ঢাকা, প্রায় সমস্ত মণিপুরীজাতির এই পোষাক।"

রাস্তায় ঘাটে মণিপুরীদের পরস্পর অভিবাদন একটা দেখবার মত জিনিস। এ সময়ও রসিকতার ফোয়ারা ছুটতে থাকে। মহিমচন্দ্র বলছেন—

"রাস্তাঘাটে মণিপুরীদের একে অন্যকে অভিবাদন একটা বৃহৎ ব্যাপার। ইহারা জাপানীদের মত প্রচুর আমোদী এবং সাদর অভিবাদন ইহাদের স্বাভাবিক ধর্ম। স্ত্রীলোক বলিয়া ইতর বিশেষ নাই। অভিবাদন করাই যেন তাহাদের আর এক রকমের আমোদ। আমি দেখিয়াছি একটি অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দণ্ডবৎ পাইতে পাইতে হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছেন তবুও বৃদ্ধ রসিকতা ছাড়েন নাই। —একটি স্ত্রীলোক কতকগুলি সন্তান সন্ততি লইয়া চলিয়াছে; বৃদ্ধকে অভিবাদন করিল। বৃদ্ধ সহাস্য বদনে বলিয়া বসিলেন 'তোমাকে দেখিলে আমার পেঁপে গাছের কথা মনে পড়ে। অর্থাৎ সন্তানগুলি যেন বৃক্ষটিকে বেড়িয়া আছে।' আর স্ত্রীমহল হইতে উচ্চ হাসি উত্থিত হইল। যুবতী পুষ্পাভরণে সজ্জিত হইয়া রাস্তা

দিয়া চলিয়াছে। যুবকগণ আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে 'হে সুন্দরী, তোমার গায়ে মেলা মৌমাছি বসিয়াছে; ফুলের গন্ধে।' যুবতী উত্তর করিল—'এই মৌমাছি হুল ফুটায় না তোমার ভয় নাই।' এরূপে রাস্তাময় কেবলই হাসির ছড়াছড়ি পড়িয়া যায়।"

তারপর আসছে মণিপুরীদের অতিথি সৎকার। আতিথেয়তার জন্য মণিপুরীদের দেশজোড়া নাম আছে। তারা যে শুধু অতিথি বৎসল তা-ই নয়, তাদের অতিথি সৎকারের নিয়মটাও চমৎকার। মহিমচন্দ্র লিখেছেন—"মণিপুরে অতিথি সৎকার এক শোভনীয় ব্যাপার। অতিথিসৎকার ভারতবর্ষের অন্যপ্রদেশে যাহা দেখিয়াছি তাহার সঙ্গে ইহার তুলনাই হয় না। আজকাল আমরা অতিথি সৎকারার্থে Garden party, Evening Party, অথবা Dinner party প্রভৃতির উদ্যোগে করিয়া থাকি, কিন্তু এই Happy valleyতে অতিথি সৎকারের জন্য 'কীর্ত্তন' দিয়া থাকে। সেই কীর্ত্তন আমাদের যাত্রাকীর্ত্তন অথবা বাউল কীর্ত্তন প্রভৃতি বিরাট আয়োজন নহে।" এরপর তিনি সেই কীর্ত্তনের বর্ণনা দিয়েছেন। কীর্ত্তনের আগে এদের অভ্যর্থনাটি অতি চমৎকার। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আগে আগরতলা ছিলেন। মণিপুরে গিয়ে মহিমচন্দ্র তাঁকে দেখতে যান। তিনি আগে থেকেই এ খবর পেয়েছিলেন। লেখক বলছেন—"আমি শকটারোহণে এই দুই মাইল পথ যাইয়া দেখি তাঁহার বাটীতে লোকারণ্য। বাটীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবামাত্র আমাকে একটি চৌকীতে বসাইয়া আমার পদপ্রক্ষালনের ব্যবস্থা হইল, ইহাকে পাদ্য অর্ঘ্য বলা যাইতে পারে। পাদুকা ত্যাগপূর্ব্বক এই স্বাগত অভিবাদন গ্রহণ করিয়া আমি নগ্নপদে একটি নাটমন্দির-ঘরে প্রবেশ করিলাম। এখানে দেখিতে পাইলাম বহুতর লোকের সমাগম হইয়াছে। ব্যাপারখানা কি জানিতে অভিলাষ হইবামাত্র কতকগুলি মণিপুরী লোক অগ্রসর হইয়া আমাকে 'বার্ত্তন' করিয়া বসিল। এই 'বার্ত্তন' করার প্রথা মণিপুরীদের মধ্যে প্রচলিত। একখানা থালে

পান, সুপারী, পুষ্পমালা, এবং চন্দন লইয়া আমার নিকট নতশিরে উপস্থিত হইল। ইহাই অতিথির স্বাগত অভ্যর্থনা। চন্দনের টীকা দান করিয়া, পুষ্পমালা গলায় ঝুলাইয়া তাম্বুল দ্বারা আমাকে স্বাগত করিল।”

তারপর আছে কীর্ত্তনের বর্ণনা। লেখক বলছেন—“আমার আগমনে গ্রামের লোকেরা এই সম্মিলন-সভার আয়োজন করিয়াছেন। ইহাতে খরচের বিড়ম্বনা নাই, গ্রামের লোক সকলের ঘর হইতে যে যে রকম সাহায্য করিতে পারেন তাহাই সংগৃহীত হইয়াছে। খোল করতাল লইয়া বাদকবৃন্দ আসরে নামিয়া বাদ্য বাজাইতেছেন আর গায়কগণ জয়দেবের পদাবলী গাহিয়া যাইতেছেন। এই জয়দেবের পদাবলী মণিপুরী রাগিনীতে গীত হইতেছে এবং মাঝে মাঝে এক একজন লোক উঠিয়া গায়কগণের মধ্যে যিনি উৎকৃষ্ট গান গাহিতে পারিতেছেন তাহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক তাম্বুলদানে সম্মানিত করিতেছেন। ইহাতে বালক বৃদ্ধ ভেদ নাই। ইহা গায়কের প্রাপ্য সম্মান। বয়সের সঙ্গে তাহার তারতম্য হয় না। এ প্রথাও আমার নিকট বড় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। কোমল কলাপাত এমন বিচিত্র রকমের কাটা হইয়াছে যে তাহা দেখিলে মণিপুরের শিল্পচাতুর্য্যের তারিফ না করিয়া উপায় নাই। সে পাতায় তাম্বুল বিতরিত হইতেছিল। যখন কীর্ত্তন শেষ হইল, তখন পরস্পর কোলাকুলি এবং অতিথির নিকট আসিয়া আবার বার্ত্তন করিয়া সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন।”

মণিপুরের বিচারালয় ও বিচার পদ্ধতিতে বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মণিপুরের প্রাচীনতার চিহ্ন স্বরূপ এই বিচারালয়টি রক্ষিত, এর নাম চেরাব। মহিমচন্দ্রের বর্ণনা নীচে দেওয়া গেল—“বিচারালয়ের নাম —মণিপুরে আবহমান কাল যইতে চেরাব নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এই ‘চেরাব’ নামক কোর্টই আদালতের কার্য্য করিয়া থাকে। মণিপুরে যখন মহারাজাদের পূর্ণ ক্ষমতা ছিল, বাহির হইতে

কোন শক্তিমান জাতি আসিয়া—শক্তি সঞ্চালন করেন নাই—সেই প্রাচীন সময়ের 'চেরাব' যে প্রণালীতে গঠিত এবং পরিচালিত হইত অদ্য পর্যন্ত তাহাই নিখুঁত অবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। এই 'চেরাব' কোর্ট সমস্ত দেশীয় রাজ্যের পক্ষে একটি শিক্ষানীয় বিষয় এবং অনুকরণীয় বলিয়া মনে করি। 'চেরাবে' বিচারপতিগণের অমোঘ ক্ষমতা। এই 'চেরাব' বিচারপতিগণের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ রাজকার্তৃক নিযুক্ত হয় এবং অপর তিন ভাগ প্রজা সাধারণ হইতে দস্তর মত নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, কাজেই রাজার পক্ষে Majority কখনও পাওয়া যায় না, প্রজার পক্ষেই Majority হইয়া পড়ে। এই পাঁচজন চেরাব কোর্টের বিচারপতিগণ একত্র বসিয়া রাজ্যের বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই আদালতে উকিল নাই, মোক্তার নাই, ষ্ট্যাম্প নাই, কোর্টফি প্রভৃতি কোন জঞ্জাল নাই—এমন কি লেখাপড়া পর্য্যন্ত নাই।"

মণিপুরে বিধবা বিবাহ প্রচলিত। এ প্রসঙ্গে মণিপুরের প্রশংসা করতে গিয়ে লেখক বাঙলাদেশের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। গোড়াতেই তিনি বলছেন—"বিধবা বিবাহের সমস্যা আজও বঙ্গে বর্ত্তমান। ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মরিয়া পুড়িয়া গেছেন কিন্তু সেই বহ্নি এখনও জ্বলিতেছে। তুষানলের ন্যায় ইহা বঙ্গদেশে রহিয়াছে।"—তারপর প্রবন্ধের উপসংহারে 'প্রবাসী' পত্রিকার উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। —"প্রবাসী শ্রাবণের সংখ্যায় ৪০৪ পৃষ্ঠায় হিন্দু বিবাহ প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে—বঙ্গে বিধবা বিবাহ চলিতেছে না, গুজরাট, পাঞ্জাব, আগ্রা, অযোধ্যা, অন্ধ্র প্রভৃতি দেশে তদপেক্ষা অধিক চলিতেছে। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, বাংলাদেশ ন্যূনাধিক ভণ্ড, দেশাচারের দাস, ন্যায়নিষ্ঠ হৃদয়বান লোকের সংখ্যা কম।" আমি বলি বঙ্গে বীর্য্যবান লোকের অভাব। সাহস কম—পরমুখাপেক্ষী—অভাবে স্বভাব নষ্ট হইয়া যাইতেছে। বীর্য্যবান লোক যখন উপস্থিত হইবেন তখন বিধবা বিবাহের সমস্যা পূর্ণ হইবে। মণিপুর তখন শীর্ষস্থানে থাকিবে।"

সর্বশেষ প্রবন্ধের নাম "মহীশূরে রাজ্যোদ্বাহ"। মহীশূরের মহারাজের ও রাজকুমারীর বিয়েতে লেখক সেখানে গিয়েছিলেন এই ঘটনাই বর্ণিত হয়েছে। এতে বিবাহের বিশদ বর্ণনা আছে কিন্তু মহীশূর রাজ্যের বা সেখানকার অধিবাসীর কোন পরিচয় পাওয়া গেল না। তাই এ প্রবন্ধটী নিয়ে আলোচনা করবার কিছু নেই।

'দেশীয় রাজ্য' চিন্তাশীল ও বর্ণনামূলক প্রবন্ধের সমষ্টি। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল ও সরস। প্রথম খণ্ডে সর্বভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে একজন দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। ত্রিপুরাকে জানবার পক্ষে দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য কম নয়। এর কোন কোন প্রবন্ধ বাঙলা সাহিত্যে স্থায়ী মর্যাদার আসন দাবি করতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "ত্রিপুর-দরবারে রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধটির নাম উল্লেখযোগ্য।

তিনটি বই

ভারতীয় স্মৃতি

বীরচন্দ্র মাণিক্যের পুত্র সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা সুসাহিত্যিক ছিলেন। ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দে তিনি "ভারতীয় স্মৃতি" নামে একখানা বই লেখেন। এ বইটিতে ভারতবর্ষের কতকগুলি ঐতিহাসিক স্থানের আলোকচিত্র ও বর্ণনা আছে। অবতরণিকায় লেখক বলেছেন—"কয়েকটী প্রদেশ পরিভ্রমণকালে আমি সেই সমস্ত স্থানে অবস্থিত প্রাচীন কীর্ত্তিচিহ্ন-নিচয়ের যে সমুদয় আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম তৎসম্বন্ধে কোন পুস্তক যে প্রকাশ করিব এইরূপ ভরসা কিংবা ধারণা আমার মনে কখনও উদিত হয় নাই। কেবল—সুহৃদ্‌বর ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভৃতি কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে আমি এই কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে সাহসী হইয়াছি। বিশেষতঃ আমার একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার জীবদ্দশায় অনেকদিন হইতেই আমাকে এই বিষয়ে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পুস্তকখানি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে পারিলাম না, এই জন্য চিরদিনের তরে দুঃখ রহিয়া গেল।"

"এই পুস্তকে বর্ণিত প্রবন্ধ-নিচয়ে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই। প্রসিদ্ধ ইতিহাসকার পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক—ইংরাজী, বাংলা, ও পারস্য ভাষায় বিরচিত ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং সংস্কৃত পুরাণাদি গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বকই এই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছি। প্রধানতঃ গভর্ণমেণ্ট গেজেটিয়র সমূহের উপরেই নির্ভর করিয়াছি।"

এই গ্রন্থে মৌলিকতা বিশেষ না থাকলেও বিষয় সন্নিবেশ ও বর্ণনা নৈপুণ্যে প্রবন্ধগুলি আকর্ষক হয়েছে। ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বে লেখকের অসামান্য দখল ছিল। প্রতিটি প্রবন্ধে তার পাণ্ডিত্যের পরিচয় মেলে।

গ্রন্থে আলোচিত প্রসিদ্ধ স্থানগুলির নাম নিচে দেওয়া গেল—

পুরী জিলা

বরুণী গড়, ধবলী।

গয়া জিলা

কাওয়াডোল, বরাবর পর্বত, নাগার্জুন পর্বত, ধরাওত, দাপ্‌থু, শেরঘাটি ও গুণেরী, উমেগা, দেওগ্রামস্থিত সূর্যমন্দির, পালী, কেস্‌পা, ঘেঁজন, সীতামারী।

শাহাবাদ জিলা

রোহিতাশ্ব দুর্গ, ভোজপুর।

এলাহাবাদ জিলা

কৌশাম্বী, বিতভয় পত্তন, প্রতিষ্ঠানপুর, জতুগৃহ।

ত্রিপুরার স্মৃতি

১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দে সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা "ত্রিপুরার স্মৃতি" নামে আরেকখানা বই লেখেন। এই গ্রন্থে ত্রিপুরা-রাজ্য ও ত্রিপুরা জেলা, এ-অঞ্চলের ঐতিহাসিক স্থান ও প্রাচীন কীর্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের পরিশিষ্টে গোবিন্দমাণিক্যের কাছে আওরঙ্গজেবের লেখা ফারসী চিঠির মূল ও তার বাঙলা অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। "রেসিয়ার খাগরা" নামে এক ধরণের লোক-সংগীতের নমুনা ও তার বাঙলা অনুবাদও এতে রয়েছে। বইটি অনেকগুলি আলোকচিত্র সুশোভিত।

গ্রন্থের আরম্ভে লেখক বলেছেন—"ত্রিপুরা নামক উক্ত সুবিস্তীর্ণ প্রদেশের প্রায় অধিকাংশই অধুনা চন্দ্রবংশ সম্ভুত বর্ত্তমান ত্রিপুরেশগণের অধিকার ভুক্ত। কিন্তু সুপ্রাচীনকালে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ যে কালে এতৎ প্রদেশের উত্তর পূর্ব্বাংশে রাজত্ব করিতেন, তৎকালে

তাহার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী জনপদ-নিচয় যে পালবংশীয় নৃপতিগণের শাসনাধীন ছিল তাহার নিদর্শন এই প্রদেশে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই অঞ্চল যে একদা অপরাপর বংশসম্ভূত নৃপতিগণেরও অধিকারভুক্ত ছিল তাহা এতৎ প্রদেশস্থ কতিপয় প্রাচীন নিদর্শন প্রতিপন্ন করে।"

এই গ্রন্থে পাইটকারা, ময়নামতী, লালমাই ইত্যাদি অঞ্চলের বিস্তৃত পরিচয় আছে। ত্রিপুরা জেলার নুরনগর, বরদাখাত ও সরাইল পরগণার বিবরণও লেখা রয়েছে। এ সব স্থানে এবং ত্রিপুরার আর সব জায়গায় যে-সমস্ত প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে লেখক তাই নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোকচিত্র সুশোভিত প্রবন্ধগুলিতে যথার্থ ঐতিহাসিক মর্যাদা রক্ষা করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত লেখক "ঊনকোটী" নামে এক তীর্থের বর্ণনা দিয়েছেন। এটি এ-অঞ্চলের এক প্রাচীন তীর্থ। এখানে অসংখ্য দেবমূর্তি পাওয়া যায়। কোন কোন মূর্তির গঠন-কৌশল অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে। লেখক বলেছেন—"উল্লিখিত 'ঊনকোটী' নামে খ্যাত পার্ব্বত্য তীর্থটি ত্রিপুর রাজ্যের উত্তর প্রান্তবর্ত্তী 'কৈলাশহর' উপবিভাগের অন্তর্ভূক্ত। ইহার সম্বন্ধে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে যে দুইটী অলৌকিক প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।"

প্রথমটি হ'ল এই—

"একদা বারাণসী পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে কৈলাসনাথ শম্ভু দেবগণ সহ হিমাচল হইতে অবতরণ পূর্ব্বক উদ্দিষ্ট স্থানে গমন সময়ে দিবা অবসানকালে ঊনকোটীতে আসিয়া উপস্থিত হন। তৎকালে সকলেই পথশ্রমে কাতর হওয়ায় এই স্থানে রজনী যাপন পূর্ব্বক সূর্য্যোদয়ের প্রাক্‌কালেই যথাস্থানে পৌঁছিবেন—এইরূপ মনস্থ করিয়া তাঁহারা সকলে শয়ন করেন। কিন্তু নিশা-অবসান পূর্ব্বে উমাপতি শঙ্কর ব্যতিরেকে আর কাহারও নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। তখন দেবাদিদেব ভূতনাথ তদীয় সহযাত্রী-দেবগণকে নিদ্রিতাবস্থায়

পরিত্যাগ পূর্ব্বক বারাণসীতে গমন করেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে বিভাবরী শেষ হইয়া বায়স-রব হইলে দেবগণ পাষাণে পরিণত হন। এক মহাদেবের অভাবে কোটী দেবতা পূর্ণ না হওয়া বশতঃ এই স্থান উনকোটী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে; নতুবা ইহা বারাণসীতে পরিণত হইত।"

দ্বিতীয়টি হচ্ছে এরকম—

"কোন এক কালে জনৈক মহাত্মা এই স্থানে কোটী দেবমূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক ইহাকে দ্বিতীয় বারাণসী ক্ষেত্রে পরিণত করিতে সঙ্কল্প করেন। তদুদ্দেশ্যে তাঁহার দ্বারা এই স্থানে বহু দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ মহাপুরুষ কোটী দেবমূর্ত্তি স্থাপিত করিতে কৃতকার্য্য হন নাই—একটী মূর্ত্তি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তজ্জন্য এই স্থান বারাণসী না হইয়া উনকোটি আখ্যা প্রাপ্ত হয়।"

উল্লিখিত দুটি অনুচ্ছেদ থেকে লেখকের ভাষার প্রসাদ গুণ সম্পর্কে আমরা ধারণা করতে পারি। এ রকম নানা মনোজ্ঞ প্রবাদ ও ঐতিহাসিক তথ্যে গ্রন্থটি পূর্ণ। এ অঞ্চলের ইতিহাসের এক অনধীত অধ্যায় লেখকের আলোচনায় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এ হিসেবে গ্রন্থটির মূল্য অনস্বীকার্য্য।

মহম্মদ সিরাজউদ্দীন আবু জফর বাহাদুর শাহ

মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের কতগুলি কবিতার মূল ও তার বাঙলা অনুবাদ এতে রয়েছে। বইটি ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দে লেখা। লেখক উর্দ্দু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। অবতরণিকায় তিনি লিখেছেন—

"ভুবন বিখ্যাত শাহানশাহ্ মহম্মদ জলালুদ্দীন আকবরের পরবর্ত্তী মুগল বাদশাহ্‌গণ রসনার তৃপ্তিকর দ্রব্যভোজন, সুরাপান ও রমণীমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া নৃত্যগীত প্রভৃতি বিলাস-সাগরেই দিবা-নিশি মগ্ন থাকিতেন, তাঁহারা কখনও বিদ্যানুশীলন করিতেন না—এইরূপ প্রায় লোকেরই ধারণা। একথা যে একেবারে অপ্রকৃত এমন

নহে। তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে দুই একজন যে লেখাপড়া করিতেন এ বিষয়ের নিদর্শন আজ পর্যন্ত ও বিদ্যমান রহিয়াছে।"

* * * * *

"জাহাঙ্গীর বাদশাহের পর তৈমুর বংশের মিট্‌ মিট্‌ প্রদীপ স্বরূপ দিল্লীর শেষ মুগল বাদশাহ্‌ "মহম্মদ সিরাজুদ্দীন আবুজফর বাহাদুর শাহ"—এর নাম উল্লেখযোগ্য। এই ভাগ্যহীন নামে মাত্র বাদশাহ্‌ যে ফার্সী ও উর্দু ভাষায় সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন তাহার রচিত কবিতা পর্য্যালোচনা করিলেই ইহা স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তিনি সঙ্গীতকলায়ও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন—এইরূপ কথিত আছে।"

প্রসঙ্গত বাহাদুর শাহের কবিত্ব ও কাব্যচর্চা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন লেখক। কবিতাগুলির অনুবাদ করা হয়েছে গদ্যে। এ সম্পর্কে তাঁর কৈফিয়ৎ—"কবিতাগুলি পদ্যে অনূদিত হইলে সুপাঠ্য হইত। কিন্তু কবিতা লিখা আমার অভ্যাস না থাকায় গদ্যেই অনুবাদ করিয়াছি।"

বাহাদুর শাহের কাব্যচর্চা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লেখক উর্দু ভাষার উৎপত্তি নিয়েও আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন—"উর্দু ভাষার জন্মস্থান ভারতবর্ষ এবং ইহা অধিক পুরাতন নহে। ভাষাটিকে একপ্রকার আধুনিকও বলা যাইতে পারে। "সাহেব-এ-কিরান্‌ শাহজহাঁ" বাদশাহ্‌ পুরাতন দিল্লীর উত্তরদিকে বর্ত্তমান দুর্গ ও তাহার মধ্যস্থ বাদশাহী মহল ইত্যাদি নির্ম্মাণ পূর্বক নিজ নামানুসারে ঐ অঞ্চল "শাহজহানাবাদ" নামে অভিহিত করেন। সেই সময়ে তথায় যে একটী সুবৃহৎ "উর্দু" অর্থাৎ সৈনিক বাজার স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে নানাদেশীয় লোকের সমাবেশ ও সমাগম হেতু আরবী, ফার্সী ও হিন্দী প্রভৃতি নানা ভাষার শব্দ মিশ্রিত হইয়া নূতন একটি ভাষা উৎপন্ন হয়। এইরূপে ভাষাটী "উর্দু" হইতে উদ্ভব হওয়াতে "উর্দু" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে মুগল সম্রাট আকবর শাহের রাজত্বকালেই তাঁহার রাজধানীতে নানা দেশীয় লোকের সমাগম ও সম্মিলনে এই ভাষার সূত্রপাত হইয়াছিল।"

"উক্ত ভাষাকে ইংরাজেরা "হিন্দুস্থানী বোল" কহে। সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য লর্ড ওয়েলেসলির শাসনকালে ইহা ফার্সীর পরিবর্তে বৃটিশ আদালত প্রভৃতি রাজকার্যালয়ে প্রচলিত হয়।"

* * * *

"উর্দু ভাষায় আরবী ও ফার্সী শব্দের আধিক্য হেতু ইহা লিখিতে ফার্সা অক্ষরই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কি গদ্যে কি পদ্যে ইহার স্থান বিশেষের পদবিন্যাস ফার্সী ব্যাকরণের নিয়মানুসারেই করা হয় এবং ফার্সী কবিতার ছন্দেই বর্ণিত ভাষার কবিতাও রচিত হইয়া থাকে। আদৌ উর্দুভাষা সাধারণতঃ বাক্যালাপেই ব্যবহৃত হইত। ইহাকে সাধারণ লোকের কথিত ভাষা বিবেচনায় হেয় মনে করিয়া কোন সাহিত্যিকই এই ভাষায় লেখাপড়া করিতেন না। যাহা হৌক ক্রম-বিকাশে ইহা উন্নত হইতে থাকিলে উক্ত ভাষায় কবিতাদি রচিত হইতে আরম্ভ হয়। * * * কিন্তু গালিব ব্যতীত তাঁহারা কেহই কোন গদ্য পুস্তক লেখেন নাই।"

উর্দুভাষায় আমাদের কোন জ্ঞান নেই। তাই কবিতাগুলির অনুবাদের সমালোচনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

দুর্ভাগা দিল্লীর সম্রাট নির্বাসিত অবস্থায় রেঙ্গুনে মারা যান। তাঁর রচিত একটি কবিতার প্রথম দুটি লাইন বাঙলায় অনুবাদ ক'রে লেখক বলেছেন গোরের নিচ থেকে হতভাগ্য সম্রাট যেন করুণ সুরে গান করছেন—

মৃত্যুর পর আমার সমাধির উপরে
কোন ব্যক্তি যে প্রদীপটা জ্বালাইয়া দিয়াছিল,
দুঃখের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে তাহা
সন্ধ্যার প্রারম্ভেই নিবাইয়া দিয়াছে।

বাহাদুর শাহ ব্রজভাষায়ও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সর্বশেষে ব্রজভাষায় রচিত একটি গজল ও তার অনুবাদ রয়েছে।

গ্রন্থটি শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা হয়েছে।

উদয়পুর বিবরণ

এ বইটি ত্রিপুরার ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্তের লেখা। এতে ত্রিপুরার অন্তর্গত উদয়পুর উপবিভাগের বিস্তৃত বিবরণ আছে। বইটি অনেকটা গেজেটিয়ারের ধরণে রচিত। ভূমিকায় লেখক বলেছেন—"রাজমালা গ্রন্থে এই রাজ্যের কীর্ত্তিমান রাজন্যবর্গের বিবরণই প্রধানত বিবৃত আছে ও হইতেছে, কিন্তু রাজ্যের ইতিহাস ও জ্ঞাতব্য বিবরণ সম্বলিত এমন কোন গ্রন্থ এ যাবৎ বিরচিত বা প্রকাশিত হয় নাই, যাহা পাঠ করিয়া আধুনিক গেজেটিয়ারের অভাব কথঞ্চিৎ পরিমাণেও বিদূরিত হইতে পারে।"—ভূমিকার শেষে আছে—"ভবিষ্যতে যোগ্যতর ব্যক্তি দ্বারা গেজেটিয়ার রচনার সহায়তা হইলে পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।"

এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিষয় পর্যায় অনুসারে আলোচনা করা হয়েছে—

প্রথম অধ্যায়—পদার্থ বিষয়ক অবস্থা
দ্বিতীয় অধ্যায়—ইতিহাস
তৃতীয় অধ্যায়—অধিবাসী লোক
চতুর্থ অধ্যায়—সাধারণ স্বাস্থ্য
পঞ্চম অধ্যায়—আর্থিক অবস্থা
ষষ্ঠ অধ্যায়—গমনাগমনের রাস্তা
সপ্তম অধ্যায়—কৃষি
অষ্টম অধ্যায়—স্থান ও ব্যক্তি

এই গ্রন্থ পাঠ করলে জানা যায় উদয়পুর বহুদিন পর্যন্ত ত্রিপুরার রাজধানী ছিল। এর প্রাচীন নাম ছিল রাঙামাটী। মুসলমান রাজত্বের সময়ে "সরকার উদয়পুরের" রাজস্ব নির্ধারিত হয়েছিল।

ত্রিপুরা সুন্দরী—উদয়পুরের পুণ্য পীঠস্থান ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির। এখানে কালীমূর্তি স্থাপিত। এই বিগ্রহ স্থাপন সম্পর্কে নানারকম প্রবাদ প্রচলিত। "চন্দ্রনাথ মাহাত্ম্য" গ্রন্থে আছে—"যে সময়ে ত্রিপুরাধিপতি ধন্যমাণিক্য বাহাদুর ত্রিপুরেশ্বরীকে লইয়া যান সেই সময় স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরের একাংশ অর্থাৎ যে প্রকোষ্ঠে স্বয়ম্ভুনাথ আছেন সেই মন্দিরখানি নির্ম্মিত হইয়াছে।" মহারাজ ধন্যমাণিক্য স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ত্রিপুরাসুন্দরীকে চন্দ্রনাথ থেকে ত্রিপুরায় নিয়ে আসেন এ কিংবদন্তী চট্টগ্রামে প্রচলিত। কিন্তু উদয়পুরে প্রবাদ আছে, এই বিগ্রহ উদয়পুরে "মায়ের বাড়ি"-র কাছে ব্রহ্মছড়ার কোন জায়গায় জলমগ্ন ছিল। ত্রিপুররাজ স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠা করেন।

পার্বত্য প্রজা—উদয়পুরে নানারকম পাহাড়ী জাতির বাস। এদের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন লেখক। তার থেকে সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া গেল।—

এরা সবাই হিন্দু বলেই পরিচিত। এদের মধ্যে নানা জাত রয়েছে। যেমন, জমাতিয়া, রিয়াং নোয়াতিয়া, পুরানত্রিপুরা, মুরছুম, কলই, কাইপেং, বোম, বেথু, রূপ্নী, কুকি, চাকমা, মগ, মুড়াসিং, তোতারাম প্রভৃতি। এরা জঙ্গলে বাস করতেই ভালবাসে।

১। **জমাতিয়া**—কৈলাসচন্দ্র সিংহের রাজমালায় আছে—"পার্ব্বত্য ত্রিপুরা জাতির একটি পরাক্রমশালী সম্প্রদায় প্রাচীনকালে দলবদ্ধ থাকিয়া ত্রিপুরেশ্বরের সৈনিককার্য্য নির্ব্বাহ করিত। এজন্য ইহারা জমাতিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল।" আগে নাকি এরা সাতশ ঘর মাত্র ছিল। ক্রমশ এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য পাহাড়ী জাতির মত জমাতিয়াদেরও প্রত্যেক পাড়ায় একজন সর্দার বা চৌধুরী নির্বাচিত হয়। সবার ওপর তুজন সর্দার নির্বাচিত হয়, তাদের 'মুলুকের সর্দার' বলে। রাজসম্মান ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ ক'রে এরা বেশ উন্নতি করেছে। অন্য সব পাহাড়ী জাতির তুলনায় এরা অনেক উন্নত। এরা বাঙালীর মত চাষ করে। অনেকেই

আর আগের মত "পাছড়া" কাপড় ব্যবহার করে না। বাঙালীর মত ধুতি ও শাড়ি পরে। হারমোনিয়ম প্রভৃতি বাজিয়ে এরা যাত্রা করে। এদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু কোন বিপত্নীক কুমারী বিবাহ করতে পারে না।

২। **রিয়াং**—কৈলাসচন্দ্র সিংহের রাজমালায় আছে "কাপ্তান লেউইন পার্ব্বত্য চট্টগ্রামবাসী মানবদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—খউংতা (নদীবংশজ) ও তউংতা (পর্ব্বত বংশজ)। তউংতাগণ এই পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রাচীন অধিবাসী। তউংতাদিগের মধ্যে রিয়াংগণ বিশেষ পরাক্রমশালী ছিল। এইজন্য পূর্ব্বকালে ইহাকে রিয়াং রাজ্য বলা হইত।"—

রিয়াংরা রাজার জাত ব'লে গর্ব করে। এদের আরেক নাম 'রেম'। রেম অর্থ রাজা। এরা সত্যনিষ্ঠ, অতিথি বৎসল ও অত্যন্ত রাজভক্ত। রিয়াং সম্প্রদায় চৌদ্দটি দফা বা বংশে বিভক্ত। দফার সর্দাররাই সমাজের পরিচালক। এরা কতকগুলি রাজচিহ্ন বিশেষ গৌরবের সঙ্গে পুরুষানুক্রমে রক্ষা ক'রে আসছে। এদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত। পুরুষের চাইতে মেয়েদের সংখ্যা কম। এরা মদ ও মাংস ভালবাসে। এরা খুব স্বাধীনতাপ্রিয়। চৌধুরী সর্দার প্রভৃতি নিজেরাই নির্বাচন করে।

৩। **মুরছুম**—এরা হালাম শ্রেণীর অন্তর্গত। এরা কুকিদের ভাষা বুঝতে পারে। এরা কুকির "মা বাপ" বলে গর্ব করে। রায়, কাঞ্চন প্রভৃতি হচ্ছে এদের সমাজপতিদের উপাধি। এরাই এদের শাসন করে। চিরপ্রচলিত প্রথাকে এরা খুব মান্য করে। রাজাদেশ ছাড়া এরা তার অন্যথা আচরণ করে না। এরা বারোটি দফা বা বংশে বিভক্ত। এদের মধ্যেও নির্বাচিত প্রতিনিধি রয়েছে। তাদের নাম 'জোয়ান সর্দার'। এরাই লোক সংগ্রহ ক'রে বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পন্ন করে।

এরা কতগুলি রাজচিহ্ন সযত্নে রক্ষা ক'রে আসছে। এদের পূজাপদ্ধতি অনেকটা রিয়াংদের মত। এদের পুরোহিতের নাম ওঝাই।

৪। **নোয়াতিয়া**—এদের আচারপদ্ধতি রিয়াংদের মত। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে এরা অনেকে বাস করে। এদের সর্দার চৌধুরীকে "রোয়াজা" বলে। রোয়াজা মানে রাজা। এদের অনেকেই চাষ আবাদ করে। ভেকধারী বৈরাগীর সংখ্যাও কম নয়।

৫। **কলই দফা**—এরা ক্রমেই পাহাড়ের ভেতর দিকে চ'লে যাচ্ছে। এদের দলপতির উপাধি রায়, কাঞ্চন, গালিম, গাবুর প্রভৃতি। এরা জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত হয়। এদের রায়ের কাছেও রাজসরকার থেকে দেওয়া মোহর ও অন্যসব জিনিস আছে।

৬। **কাইপেং**—এরা সাধারণতঃ দূরবর্তী ও দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে বাস করে। এদেরও রায়, কাঞ্চন প্রভৃতি দলপতি আছে। এরা হালাম শ্রেণীর অন্তর্গত একধরণের কুকি ব'লে পরিচিত।

৭। **বোম দফা**—কুকিদের সঙ্গে মিলে এরা দেশ লুণ্ঠন করত ব'লে এদের 'মেলা কুকি' বলে। লুসাই কুকিদের সঙ্গে মিলে এরা ইংরেজ সিপাই মেরেছিল বলে গর্ব করে। এরা বলিষ্ঠ, সাহসী ও আমোদ প্রিয়। বর্তমানে বাঙালীর সংশ্রবে এসে এরা বিলাসিতাপ্রিয় হয়ে পড়েছে।

৮। বেথু, রূপ্নী, রাংখল, বংশী প্রভৃতি দফা কুকি এবং হালামদেরই মত।

৯। **ত্রিপুরা**—এরা সাধারণত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত :—পুরান-ত্রিপুরা, বোম্থোম, হারম্ বাং, মুরসিম, তোতারাম, দাংর, মছবান, নোয়াতিয়া, আনকথালি বা খালিশা, থাকলু, গাবিন। মুরসিম, দাংর, তোতারাম ও মছবান এই চার দফার লোক যুবরাজের "জুলাই" ব'লে সামাজিক হিসেবে নিকৃষ্ট ব'লে গণ্য হয়। 'হসম ভোজন' বা সামাজিক পানভোজনের সময় এদের জাতিগত মর্যাদার বিচার হয়।

১০। চাকমা ও মগ—পার্বত্য চট্টগ্রামেই এদের প্রাধান্য। এরা বৌদ্ধ। কৈলাসচন্দ্র সিংহের রাজমালায় আছে—"কাপ্তান লেউইন সাহেবের বর্ণিত খউংতা বংশের একটি শাখা চাকমা নামে পরিচিত। চাকমা সর্দ্দারগণ প্রথমতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে কার্পাস কর প্রদান করিত। ১৬৯৯ শকাব্দে চাকমারাজ শ্রীদৌলত খাঁ কোম্পানীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। ১৭০৪ শকাব্দে তাঁহার উত্তরাধিকারী বার্ষিক পাঁচশত মণ কার্পাসের পরিবর্ত্তে মুদ্রাকর দান করেন। এইরূপ সামান্য কর প্রাপ্ত গভর্ণমেণ্ট দীর্ঘকাল পার্ব্বত্য প্রদেশে পূর্ণ রাজশক্তি পরিচালন করিতে বিরত হইয়াছিলেন।"

ওপরের বিবরণ থেকেই বোঝা যায় ত্রিপুরাকে জানবার পক্ষে এ গ্রন্থের মূল্য অনেকখানি। গ্রন্থটির আরেক নাম "ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বৎসর"। লেখক দীর্ঘকাল ত্রিপুরার রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। সরকারী কাজে তাঁকে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে যেতে হয়েছে। সেখানকার খুঁটিনাটি সমস্ত অবস্থা তিনি সযত্নে পর্যবেক্ষণ করেছেন, সেখানকার অধিবাসীদের পরিচয় সংগ্রহ করেছেন। যারা আমাদের অত্যন্ত কাছে থেকেও অনেক দূরে, আমাদের সেইসব অচেনা অবহেলিত প্রতিবেশীদের সম্পর্কে আমরা এর থেকে জানতে পারি।

হোলির গান

ত্রিপুরার জাতীয় উৎসব হোলি, বাঙলাদেশের চেয়ে এখানে হোলির প্রাধান্য অনেক বেশি। মনিপুরীদের মত ত্রিপুরীরাও হোলির দিনে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। এদের উচ্ছলতার ছোঁয়াচ লেগে স্থানীয় বাঙালীদের মধ্যেও প্রাণবন্যা ব'য়ে যায়। প্রকৃতির সৌন্দর্য নিকেতন ত্রিপুরার আকাশ বাতাস সেদিন রঙে রঙে রঙীন হয়ে ওঠে।

এই হোলি উৎসবকে অবলম্বন ক'রে অনেক সুন্দর-গান রচিত হয়। প্রত্যেক পাড়ায় এক একটি দল থাকে, তারা বিবিধ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নিজেদের রচিত গান গেয়ে গেয়ে নগর পরিভ্রমণ করে। মহারাজ বীরচন্দ্র ও রাধাকিশোরের রচিত অনেক গান এ উৎসবে গাওয়া হ'ত। জনসাধারণও অনেক গান রচনা করেছেন। কিন্তু এদের বেশির ভাগই মুখে মুখে রচিত। লিখিত আকারে রক্ষিত না হওয়ায় অধিকাংশ গানই আজ লুপ্ত প্রায়। তবু আমরা যে কটি গান পেয়েছি তার থেকে নমুনা দেওয়া গেল।

রাগিণী—ভূপালী

আবিরে অরুণ ভেল শীতল তমাল তল
ধরিল অরুণ ভাতি নীলিম যমুনা জল।
অরুণিত শ্যামতনু,
অরুণ মোহন বেণু,
অরুণিম অভাময়ী বরজ-গোপিকাকুল।
আবিরে নীলিমা ঢাকা,
কনকে সিঁদুর মাখা,
একতনু রাধাকানু জলদে বিজলীদল।

রাগিণী—কেদারা

যুবতী-ধরমনাশা বিষম বাঁশের বাঁশী,
বধিতে অবলাগণে উগারে গরল রাশি।
মোহন মুরলী তানে,
মরম সহিত টানে,
বাঁশী নয়—বাঁশী নয়—দারুণ প্রেমের ফাঁসী।
কোন্ বনে কে বাজায়—
বনপথে কে বা যায়,
দেখে আয়—দেখে আয়—হইনু তাঁহার দাসী।

রাগিণী—মালকোষ

এ কেমন ব্যবহার
নিপট কঠিন কালা ;
দুপুরে ডাকাতি কর
পথে পেয়ে কুলবালা।
হানি লাল পিচকারী,
তিতাইছ নীল শাড়ী,
কাচলি দিয়েছ ছিঁড়ে—
অঙ্গেতে আবির ঢালা।
কত লোকে কত ছলে,
কত কি কুকথা বলে,
কেমনে ফিরিব ঘরে,—
লইয়ে কলঙ্ক ডালা॥

× × ×

রাগিণী—সাহানা মিশ্র

হোরিয়া খেলত রাই কানাইয়া সঙ্গে,
আবির কুমকুম ছোড়ে সখিগণ রঙ্গে।
চারি ভিতে ঘুরি ঘুরি,
মারে সবে পিচকারী,
কুমকুম ছোড়ত কেহ সে কোমল অঙ্গে।
সখিগণ সহ রাই
আকুলি ব্যাকুলি হই,
কালাচাঁদে করে লাল মাতিয়া স্থরঙ্গে।

রাগিণী—পূরবী

আবির খেলিছে ঐ নিঠুর তোর কালিয়া,
ঘুম ঘোরে আঁখি দুটি পড়িতেছে ঢলিয়া।
মালতীর মালা গলে,
পীত বসন দোলে,
অলস আবেশে তাহা পড়িতেছে খসিয়া।
সারারাতি কাটাইনু,
বসে কত কাঁদিনু,
ধিক তোর কানুকে সখি লাজেতে যাই মরিয়া।

রাগিণী—মিশ্র

(আজি) বসন্ত ফাগুয়া আইল,
হৃদয় বাঁশরী বাজিল।

লতায় পাতায় ফাগুন জাগায়,
কোকিল কুহরে পুলক ব্যথায়,
বিরহিণীজনে ঝরাফুল প্রায়,
সারাটী রজনী যাপিল।
আজি এ জোছনা বসন্ত নিশিথে
হোলিতে মাতিব রাই—কানু সাথে
লুটাব বরজ অরুণ পথে
পুলকে পরাণ পূরিল।

ওপরের গানগুলি ১৩৩৮ ত্রিপুরাব্দের চৈত্র মাসের 'রবি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

হোলী

এই হোলি উৎসব উপলক্ষে ত্রিপুরার মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দে 'হোলী' নামে একখানি বই প্রকাশ করেন। এর মধ্যে কতগুলি হোলির গান রয়েছে। তাছাড়া সংগীতের বিভিন্ন দিক এবং রাগ রাগিনী নিয়ে আলোচনা আছে। "অবতরণিকায়" হোলি ও নবরস নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক। তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল ও প্লাবনশীল। গ্রন্থে তাঁর নাম নেই।

হোলির উৎপত্তি সম্পর্কে লেখক বলেছেন—"হোলী উৎসবটি অতি প্রাচীন। এই চিত্তবিনোদনকারী মহামিলনোৎসব সম্বন্ধে সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে বাৎস্যায়ন তাঁহার 'কামসূত্রে' উল্লেখ করিয়াছেন। কিম্বদন্তী আছে যে একদা অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর ভগ্নী হোলীকা কৃষ্ণভক্ত প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে হঠাৎ বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া অগ্নিতে ঝম্পপ্রদান করে। প্রজ্বলিত হুতাশন হোলীকা এবং প্রহ্লাদকে ত্বরায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ইহাতে হিরণ্যকশিপু যদিও ভগ্নীর অনিবার্য্য মৃত্যুর আশঙ্কায় দুঃখিত হইলেন তবুও প্রহ্লাদের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের আশায় ততোধিক উৎফুল্ল

হইয়া উঠিলেন। অগ্নি প্রহ্লাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিল না কিন্তু সেই দাবানলে হোলীকার ধ্বংস হইল। এই হোলীর নামানুসারেই হোলী এবং নরনারীগণ পুণ্যের দ্বারা পাপের পরাজয়ের এই অবিনশ্বর স্মৃতি যুগে যুগে হোলী উৎসব দ্বারা অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে।"

নবরস সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক নয়টি রসের ব্যাখ্যা করেছেন। আদিরস সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা—

"নিশি প্রভাতের ন্যায় জীবন প্রভাত হয় যখন যৌবনের সমাগমে, যখন ইন্দ্রিয়সমূহ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং যখন বিকশিত হইয়া উঠে হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা তখন তরুণ তরুণীর মনে আসে ভালবাসা ও অনুরাগ তখন তাহাদের হয় বিলাস-কামনা মিলন-লালসা, তখন চাহে তাহারা সঙ্গসুখের পরম মাধুর্য্য এবং আগ্রহে করে সুখের দান প্রতিদান, আবেগময় হৃদয় তাহাদের সদা চাহে করিতে একে অন্যের চিত্তবিনোদন, নৃত্যগীতাদি কলা অনুশীলনে ও আরও কত প্রকারে, তারপর ক্রমে প্রীতির পরিপুষ্টির সঙ্গে তাহারা মিলনের পরমসিদ্ধ আদিরস অনুভূতির সৌভাগ্য ও সাফল্য উপভোগ করে এমন কি বিচ্ছেদে বিরহে ও পুনর্মিলনের আশায় আশ্বস্ত থাকিয়া সুখস্মৃতিতে নিমগ্ন থাকে।"

অদিরসের আধ্যাত্মিক তাৎপর্যও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন—"জীবন-প্রভাতে যৌবনে ও নিশিপ্রভাতের নবালোকে যেমন নরনারী আদিরস করে অনুভব, তদ্রূপ অজ্ঞানের প্রভাতে জ্ঞানের আলো যখন আসে তখনও আদিরস অনুভূত হয়। যখন জ্ঞানালোকের প্রভাবে মানবের পার্থিব ভোগলালসার সমাপ্তিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কামনা অন্তর্হিত হইয়া বিমল শান্তি সুখ হয় উপভোগ, তখন তাহারা নিজস্বতার বিশেষত্ব ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের বিরাট দেহে হইয়া লীন পরমাত্মাপ্রীতিতে অদ্বৈতভাবে অবিরাম আরাম উপভোগ করে। যখন তাহাদের আদিরস আস্বাদন হয় সার্থক, তখন শান্তিরসের আবির্ভাব হইয়া নিজ সুখ বাঞ্ছা না করিয়া অন্যকে সুখপ্রদান আকাঙ্ক্ষায় অপার্থিব জগতের

আদিরসে প্রেমের উদ্ভবে করে মহা আনন্দ উপভোগ। এই সংসারে নরনারী কতরূপে আদিরস উপভোগ করিতেছে।"

বাৎস্যানের কামসূত্র ও অন্যান্য কামশাস্ত্রে লেখকের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে তা-স্পষ্ট বোঝা যায়—

"রসিক রসিকাকে রসানুভূতির সুখদায়ক এই উৎসব যদিও বিবিধ কামসূত্র ও শাস্ত্র অনুযায়ী রসিক নায়ক ও রসিকা নায়িকা—যাহারা নৃত্যগীত ও সঙ্গীত নিপুণ ও নিপুণা—যাহারা পুষ্পমালা, পুষ্পতোড়া, পুষ্পরথ ও নানাহ ফুলচয়নে ফুলশয়ন রচনা করিতে জানেন—যাহারা বহু প্রকার সুগন্ধি সৃজনক্রমে তাহা নিজদেহে প্রলেপ করেন ও বিভিন্ন প্রকার রঙ্গীন মধুপানীয় ও অরিষ্টাদি প্রস্তুত ও পান করেন—যাহারা বহুপ্রকার সাঙ্কেতিক লিখা বুঝেন ও নানাহ হেঁয়ালী জানেন—যাহারা সর্ব্বদা মধুভাষী গদ্য পদ্য রচনায় ও বহুভাষায় অভিজ্ঞ—যাহারা ক্ষীর নীরক ইত্যাদি আটপ্রকার আলিঙ্গনে প্রিয়জনকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিতে জানেন—যাহারা কম্পন ইত্যাদি দ্বাদশ প্রকার চুম্বনে স্বজনের সহিত প্রীতি করিতে জানেন—যাহারা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ইত্যাদি আটপ্রকার নখচিহ্ন সুকোমল প্রিয়তমের দেহে অঙ্কিত করিতে জানেন—যাহারা গোপন দংশন ইত্যাদি আটপ্রকার প্রেমদংশনে ভালবাসার পাত্র ও পাত্রীর গণ্ডদেশ রক্তিম করিতে জানেন ও নানাহ কামশাস্ত্রে নিপুণ ও নিপুণা—এমন রসিক ও রসিকার নায়ক ও নায়িকার জন্যই যেন হোলী সৃজিত হইয়াছে বলিয়া প্রথমে মনে হয় কিন্তু এই বসন্তোৎসব শুধু পার্থিব জগতে নায়ক ও নায়িকার প্রেমলীলা ও রস আস্বাদনের সুযোগ ও সাধারণত কণ্টকময় প্রেম অভিসার পথকে যেন কণ্টকবিহীন করিতেছে তাহাই নহে পরন্তু এই মহোৎসব অতি উচ্চ—অতি মহান্।"

ওপরের অনুচ্ছেদটিতে বার বার "নানাহ" ব'লে একটি শব্দের উল্লেখ আছে। ত্রিপুরা-নোয়াখালি অঞ্চলের কথ্য ভাষায় 'নানা'-কে 'নানাহ' বলে। লেখক এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

হোলির এই মহৎ তাৎপর্য, এই আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনাকে লেখক এভাবে প্রকাশ করেছেন—

"নবজলধরসম অপূর্ব্বকান্তি মনোরম ময়ুরপুচ্ছ যাঁহার শিরোভূষণ, যিনি পীতবসন পরিধানে ত্রিভুবন সুন্দর, যিনি সুমধুর বেণুবাদ্যে বিশ্বকে উন্মাদিত করেন, সেই সকল রসের আকর প্রেমসাগর রসিক কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেমে দেহ যাঁহার চিররঞ্জিত, যাহার কনকচম্পক নিন্দিত বরণ, যাহার পদ্মনয়নে মৃগ-চাহনী নবপ্রসূত খঞ্জনের ন্যায় চঞ্চল—যাহা নিত্য উপজাত ভঙ্গীতে প্রেমরসিক কৃষ্ণহৃদয় হরণ করে—যিনি নানাহ মনোজ্ঞরূপ ধারণে রসসাগর কৃষ্ণহৃদয়ে নিয়ত বিলাসপরা—সেই কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি-নম্রা সদা কৃষ্ণ চিন্তায় নিমগ্না শ্রীরাধাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া দোলযাত্রায় রাধাকৃষ্ণের লীলাসঙ্গীতে নরনারী উৎফুল্ল হইয়া উঠে এবং এই আনান্দে তাহারা শ্রীভগবানের উপস্থিতি অনুভব করিতে পারে। হোলী উৎসবটি যেন নরনারীর প্রচেষ্টা, প্রেমকে পার্থিব জগৎ হইতে বহু উচ্চে লইয়া যাওয়া—প্রেমপূর্ণ প্রাণের আবেগকে যেন ভগবানে নিবেদিত করা—ভগবান—যিনি স্বয়ং প্রেমের প্রতিরূপ।"

অবতরণিকার পর হিন্দুসংগীতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তা'তে রাগরাগিণীর উৎপত্তি, স্বর ও গ্রাম, রাগ ও রাগিণী, রাগ-রাগিণীর ঠাট, জাতি ও গাইবার সময়, বাদী, সম্বাদী, অনুবাদী, বিবাদী, আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ, সংগীতের অলংকার, সংগীতের শ্রেণী, ও কয়েকটি প্রচলিত তাল নিয়ে আলোচনা রয়েছে। ধ্রুপদ গানের উদাহরণ স্বরূপ একটি গান দেওয়া হয়েছে সেটি বিখ্যাত গায়ক যদুভট্টের লেখা। যদুভট্ট বীরচন্দ্র মাণিক্যের দরবারী গায়ক ছিলেন। গানটির ওপরে লেখা—"অনুমান ৮০ বৎসর পূর্বে স্বর্গীয় ত্রিপুরেশ্বর মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের দরবারে তৎকালের বিখ্যাত গায়ক যদুনাথ ভট্টাচার্য্য (যদুভট্ট) নিযুক্ত ছিলেন এবং উক্ত মহারাজের নিকট হইতে তিনি 'তানরাজ' উপাধি লাভ করেন।" গানটি বাঙলায় লেখা না-হলেও পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য নিচে দেওয়া গেল—

তিলক কামোদ—চৌতাল

তড়পত চিত মম তুম বিন হো রাজাধিরাজ
বীরচন্দ্র মাণিক্য ত্রিপুরেশ্বর ঘরি পল ছিন।
ইত্তনী অরজ মোরি শুন লিজে কৃপা করো
দুখ অপার মাঁঝ ভয়োহু মগন।
কহন সকত বখান জো বীতন লাগ তুঅ দরশ বিন
দিল বিচ অব সোঁ চেত বিছুট জাত প্রাণ।
নিঁদিয়া ন আবে নৈন গই চৈন নিশি দিন
তু অ পাস মৈঁ আজ তান রাজ বন॥

(সুর ও কথা—'তানরাজ')

তারপর আছে "হোলী গান ও স্বরলিপি"। এতে বিভিন্ন ঢঙের হোলির গান ও তার স্বরলিপি দেওয়া আছে। গানগুলি মহারাজের নিজের লেখা। দুটি গান বাঙলায় লেখা। আলোচ্য অধ্যায়ের আরম্ভেই এই গানটি রয়েছে—

আজু মধুর নিঠুর ঋতুরাজ বসন্তে—
বাজে গো বাঁশী যবে সুরে দূর দিগন্তে॥
একান্তে বসন্তে কান্তের কথা ভাবে যে বালা,
আজু ফাগুয়ার দিনে তার সনে খেলিবে খেলা,
সে যে নিঠুর কপট নাগর সদা রস রঙ্গ চায়,
সে যে ভ্রমরার মতন চঞ্চল নানা ফুলে মধু খায়।
তাই গোপনে মনে সদা সাধে বালা সাধনার ধনে,
ফাগুয়ার দিনে খেল সব সনে সুধু ভুল না মনে,
যত আবীর কুম্‌কুম্ দিও সবারে করিয়া লাল,
সুধু আমারে দিতে রেখ গো, একটি আবীর গুলাল।
গাঁথিয়ে মালা দিও সবারে যত বাগানের ফুল,
একটি ফুল আমারে দিতে কোরো না ভুল,

শুনাইয়ো গেয়ে জানা আছে যত রাগ রাগিণী
গেয়ো না সুধু রাগিণী যোগিয়া ভালবাসি সে যে আমি,
দিও সবারে দিও গো সখা তব তন ধন,
দিও না সুধু দিও না সখা তব প্রাণ মন,
যবে বাজে গো সুরে বাঁশী দূর দিগন্তে,
সাধে যে বালা বসিয়া কান্তেরে একান্তে ॥

গ্রন্থের শেষে তাঁর আরেকটি গান রয়েছে। গানটির মধ্যে কবি মহারাজের মর্মবেদনা বিষণ্ণ সুরে অনুরণিত হচ্ছে। তার মধ্যে একটি মিস্টিক ইঙ্গিত ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করবার মত। সম্পূর্ণ গানটি নিচে দেওয়া গেল—

যে আশায় এতদিন পরাণ বাঁধিয়া,
ভেবেছিনু যবে আসিবে হোলিয়া,
সে হোলী আসিয়া গিয়াছে চলিয়া,
আমার খেলা ত হল না খেলা ॥

হোলী প্রভাতে প্রখর তপন,
লাল বাদলে মধুর তাপন,
হোলী অরুণ অরুণ বরণ,
তরুণ তরুণী করে খেলা ॥

মন্দিরা মৃদঙ্গ দফা ডাম্বর,
গরজে কাঁপায়ে ধরা অম্বর,
বীণা সারঙ্গ সরত সেতার,
সুমধুর সুরে উঠে বাজিয়া ॥

কত কাননে বাগানে ফুটে যে ফুল,
ফুলে ফুলে গায় অলিয়া কুল,
কত যে কামিনী হইয়া আকুল
যাপে যামিনী সাথে সখা ॥

এমন সুন্দর হোলীর দিনে,
রসিক নাগর শ্যাম বিনে,
খেলিব ফাগ কাহার সনে,
আমার খেলাত হল না খেলা ॥

পত্র পত্রিকা

পত্র পত্রিকার ক্ষেত্রেও বাঙলার রত্নভাণ্ডারে ত্রিপুরার সামান্য দান রয়েছে। রাধাকিশোর মাণিক্যের সময়ে রবীন্দ্রনাথ রাজধানী আগরতলায় এসে প্রথম সাহিত্য সভার সূচনা ক'রে যান। এই সভাতেই তিনি 'দেশীয় রাজ্য' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এ সম্পর্কে রবীন্দ্র জীবনীতে আছে—"রবীন্দ্রনাথ বহুকাল হইতেই স্থানিক সাহিত্য পরিষদ স্থাপনের কথা সুপারিশ করিয়া আসিতেছিলেন, এখন পর্যন্ত তাহা কোথাও কার্যে পরিণত হয় নাই; ত্রিপুরাই অগ্রসর হইয়া এই কার্যে নামিল ও রবীন্দ্রনাথকেই উহার আদর্শ পুরোহিত স্থানে সভা অলংকৃত করিবার জন্য আহ্বান করিল। কবি আগরতলায় উপস্থিত হইলে মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য ত্রিপুরা সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিরূপে কবিকে বরণ করিলেন (১৭ই আষাঢ় ১৩১২) সভার উদ্‌বোধনে রবীন্দ্রনাথ 'দেশীয় রাজ্য' নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন।—(রবীন্দ্র জীবনী—২য় খণ্ড—১২০ পৃষ্ঠা)।

সে-সময় ত্রিপুরা থেকে "বঙ্গভাষা" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। এর প্রথম প্রকাশ ১৯০৩ খৃঃ বা ১৩১৩ ত্রিপুরাব্দ। সম্পাদক ছিলেন সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা। এ ছাড়া "অরুণ" ও "ধূমকেতু" নামে দু'খানা সাপ্তাহিকও ছিল। অরুণের সম্পাদক ছিলেন চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ আর ধূমকেতুর সম্পাদক মহেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা। 'ধূমকেতু' ইংরেজী Punch-এর আকারে প্রকাশিত হ'ত। ব্যঙ্গ রচনা ও ব্যঙ্গচিত্রই ছিল তার বৈশিষ্ট্য। তারপর বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের সময়ে 'কিশোর সাহিত্য সমাজ' নামে একটি সাহিত্যসভা স্থাপিত হয়। এই কিশোর সাহিত্য সমাজ থেকেই 'রবি' নামে ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। ১৩৩৪ ত্রিপুরাব্দের (১৩৩১ বাঙলা) আষাঢ় মাসে রবির প্রথম সংখ্যা বের

হ'ল। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের সম্পাদক ছিলেন নরেন্দ্রকিশোর দেববর্মা ও কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত। তৃতীয় বৎসর থেকে ষষ্ঠ বৎসর পর্যন্ত নরেন্দ্রকিশোর দেববর্মা একাই পত্রিকা সম্পাদন করেন।

মাত্র ছয় বৎসর 'রবি' জীবিত ছিল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই এই পত্রিকাটি বাঙলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন লাভ করেছে। বাঙলার শিক্ষিত সমাজ এই 'রবি'র জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মণ্ডিত হয়ে 'রবি' বাঙলার সাহিত্যাকাশে উদিত হ'ত। আজকালকার কোন কোন সাহিত্যরথী তরুণ বয়সে 'রবি'র লেখক ছিলেন। তার মধ্যে বুদ্ধদেব বসু ও সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের নাম করা যেতে পারে। গল্প কবিতা ও চিন্তাশীল প্রবন্ধে সমৃদ্ধ হয়ে 'রবি' বাঙলার পত্রসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। কলকাতার বাইরে সুদূর পার্বত্য অঞ্চলে এ রকম একটি উচ্চমানের পত্রিকার প্রচার বাস্তবিক গৌরবের বিষয়।

অন্যান্য পত্রিকা থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা চয়ন করা হ'ত। এগুলির নাম ছিল "ভাবের ঝুলি"। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিজেও লিখতেন। ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দ আশ্বিন সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় এই গানটি রয়েছে—

গান

আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে
ওরা যে ডাকতে জানে॥
আশ্বিনের ঐ শিউলি শাখে
মৌমাছিরে যেমন ডাকে
প্রভাতে সৌরভের গানে॥
ঘরছাড়া আজ ঘর পেল যে,
আপন মনে রইল মজে',
হাওয়ায় হাওয়ায় কেমন ক'রে
খবর যে তার পৌঁছিল রে,
ঘরছাড়া ঐ মেঘের কানে॥

আবার ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দের পৌষ সংখ্যায় এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়—

লগ্ন

প্রতীক্ষা মোর আকাশ পানে তাকিয়ে আছে,
লজ্জা জানায় ব্যর্থ রাতের তারার কাছে।
ললাটে তার পড়ুক লিখা—
তোমার প্রসাদ জ্যোতির শিখা,
দাও এঁকে দাও বিজয় টীকা এই সে যাচে ॥
দীপ্ত প্রাণের পরশ আশে, সীমন্তিনী,
আলোক ঋণে করো আমায় নিত্য ঋণী।
তোমার উষায় আমার রাতে
সেই আলো তার রাখী গাঁথে,
সেই আলোকের আভাস আমার চিত্তে নাচে ॥

মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে তরুণ কবি বুদ্ধদেব বসু 'অভিনন্দন' নামে একটি কবিতা পাঠ করেন। এই কবিতাটি ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দের আষাঢ় সংখ্যার রবিতে প্রকাশিত হয়। কবিতাটির আরম্ভ এ রকম—

একদিন এসেছিনু নিঃসম্বল মৌন ভাষাহীন
ধরিত্রী আলয়ে
বিশ্বের বাতাস মোরে ভরিয়া তুলেছে নিশিদিন
অজস্র সঞ্চয়ে
শূন্যতার জীর্ণ বক্ষ পূর্ণ হ'য়ে উঠিয়াছে আজি
বিচিত্র সম্ভারে,
স্তব্ধতা বিদার করি মহামন্ত্র উঠিয়াছে বাজি'
উদাত্ত ঝঙ্কারে।
সে বাণীর জন্ম যেথা—প্রস্ফুটিত কমল অন্তরে
মধুরস-সম

মাতৃরূপা বঙ্গভাষা—রক্তরাঙা পাদপদ্ম' পরে
নমো, নমো নমঃ।

১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় বুদ্ধদেবের 'বিকাশ' নামে একটি কবিতা রয়েছে। দীর্ঘ কবিতাটির প্রথমাংশ এই রকম—

ত্রিযামা রজনী রহে নিদ্রাবেশে মুদিয়া নয়ন
কুসুমের কোরক যেমন ;
সুকুমার তনিমার পল্লবে—পল্লবে
বাঁধি রাখে আপনার সুবাস বৈভবে
রূপ তার রাখে বন্দী করি' ;
মধুলুব্ধ ভ্রমরের সঙ্গীত—লহরী
করে নাকো নিরন্তর গুঞ্জরণ,
বিশ্ব যবে করে তারে আমন্ত্রণ
ডাকে তার সৌন্দর্য্য সভায়,
নয়ন মুদিয়া রহে সুকঠিন কঠোর হেলায়।

তারপর শেষ ভাগ—

প্রভাতের আলো তারে করিলা চুম্বন,
সুরভি দখিণবায় দিয়ে গেল বুক-ভরা আলিঙ্গন,
আকাশ ডাকিলা তারে নীরব ভাষায়,
ভরি' দিল চিত্ত তার বিপুল আশায়।
চারিদিক হ'তে এলো বাহিরিয়া শত নরনারী
নয়নের পাত্র ভরা অভিষেক বারি
নিয়ে সাথে,
কেহ এসে ধরিল দু'হাতে
কহিলা করুণ কণ্ঠে—"ভালো আছ ভাই?"
তাই আজ কোথা কোন দীনতার লেশমাত্র নাই ;
কেহ বা ডাকিল বন্ধু, কেহ দিল বুক ভরা স্নেহ,
কেহ বা পরশ দিয়ে শিহরিত করি' গেল দেহ,—

আঁধারে হৃদয়ে তাই উঠিয়াছে জ্বলি'
প্রেম প্রদীপের দীপ্ত শুচি স্নিগ্ধ আলোর অঞ্জলি ;
তাই আজ জীবনের কলি,
রূপে-রসে-গানে-গন্ধে
মহানন্দে
উঠিল বিকশি ;
খুলিল উর্ব্বশী
তার
রহস্যের দ্বার ;
সার্থক মানিল তাই সমস্ত অন্তর
নিখিল ধরণী তাই এমন সুন্দর !

এরপর ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দের পৌষ সংখ্যায় 'নরবন্দনা' কবিতাটি দেখতে পাই। তা'তে বুদ্ধদেব লিখেছেন—

ওগো নর,
ভঙ্গুর, বন্ধুর তুমি, অপবিত্র, অনিত্য, নশ্বর,
পাপের কলঙ্ক-পঙ্কে পর্য্যুষিত ঘৃণিত ভয়াল,
নিষ্ঠুর করাল ;—
তোমার বন্দনা তবু কণ্ঠ মম সঙ্গীতের উন্মত্ত ধারায়
ধূলি-ধূসরিত এই পথপ্রান্তে বসি' আজি গাহিবারে চায় ;
অন্ধকার কারাগৃহে যন্ত্রণার কঠোর বন্ধনে
বন্দী তুমি মর্ম্মময় ব্যথার ক্রন্দনে—
মৃত্যুর ভ্রুকুটি জালে বদ্ধ হয়ে নির্দ্দয়, নির্ভয়-
জয়, জয়, হোক তব জয় !

এই কবিতাটিতে "বন্দীর বন্দনা"র ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। অনতিব্যক্ত খ্যাতির দিনে লেখা এই কবিতাগুলি কবির বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি বুকে ধারণ ক'রে আছে। এ হিসেবে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এদের মূল্য কম নয়।

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের দুটি লেখা আমরা পেয়েছি, একটি 'ফাগুনবাদল', আরেকটি 'তিমিরাভিসার'। 'তিমিরাভিসার' কবিতা, 'ফাগুনবাদল' গান। কবিতাটি এরকম—

আজি তিমির ঘন বরিষায়
আমার কুটীর দুয়ারে আঘাত করিয়া
ফেরে যদি মিছে নিরাশায়।
তার নূপুরের ধ্বনি জলধারা সনে
হৃদয় নাচিয়া ওঠে ক্ষণে ক্ষণে
বিজুরি আলোকে মুখছবি হেরি
চরণে পরাণ মুরছায়।

যত ভাবি তারে দিই দ্বার খুলি,
ভয় বাসি বুঝি এল পথ ভুলি
আমারে হেরিয়া আঁচল আবরি
যদি আন পথে চলে যায়—ইত্যাদি

(রবি ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দ—চৈত্র)

ত্রিপুরার রাজকুমারী কবি অনঙ্গমোহিনীর অনেকগুলি অপ্রকাশিত কবিতা 'রবি'তে ছাপা হয়েছে। প্রায় সবগুলি কবিতাই তাঁর স্বর্গত প্রিয়ের উদ্দেশে রচিত। সরজ সরল ভাষায় একান্ত সাবলীল ছন্দে কবি তার মনের বেদনাকে ভাষায় রূপ দিয়েছেন। ১৩৩৪ ত্রিপুরাব্দের পৌষ সংখ্যায় "কোথা তুমি" কবিতাটি রয়েছে। কবি লিখেছেন—

আমি যখন খুঁজে সারা, কোথায় তুমি থাক?
তাহার পরে শ্রান্ত-দেহে
লুকাই যবে আঁধার গেহে
কোথা হ'তে ডাক?

তোমার ধ্যানে যখন আমি বিভোর হয়ে পড়ি,
মনের ভ্রান্তি চোখের ধাঁধায়
নিরবধি আমায় কাঁদায় ;
তোমার পুতুল গড়ি !

কখনো বা কবি তাঁর প্রিয়কে আহ্বান করছেন অমরার বুক থেকে নেমে আসতে এই মর্ত্যভূমিতে—

প্রাণের নিভৃত নীরব পূজনে
বিদূরি বিরহ-তম
এস একবার আজি এ বিজনে
হৃদয়-দেবতা মম !
নিদ্-হীন এই বিরহ-শয়ন
শিয়রে দাঁড়াও হে'সে,
প্রাণ ভরে হেরি মুদিব নয়ন—
দীঘল রজনী শেষে !

(রবি ১৩৩৪ ত্রিপুরাব্দ-চৈত্র)

১৩৩৮ ত্রিপুরাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় 'বর্ষ' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। আশ্বিন সংখ্যায় 'বিজয়ায়' কবিতাটি দেখতে পাই। বিশ্বের সৌন্দর্যের মধ্যে কবি তাঁর প্রিয়ের স্পর্শ পেয়েছেন। তাই বিজয়ার দিনে লিখছেন—

আজি শেফালির সনে ফুটে তব হাসি
শুভ্র জ্যোৎস্না সনে ভাসে দীপ্ত প্রেমরাশি।
তব চির পরিচিত প্রীতি-আলিঙ্গন
বিজয়ার—আজি তাহা আনে সমীরণ।

কবির মন স্বপ্নে ভরা। তাঁর বাস্তব জগৎ আর স্বপ্নের জগৎ এক হ'য়ে গেছে। ভাবুক কবি কখনো বা মনে মনে প্রিয়-সমাগম কল্পনা করছেন। তাই 'অনুরোধ' কবিতায় তিনি লিখেছেন—

বহুদিন পরে আজি এসেছ এ খেলা ঘরে
কেন তবে ম্লান মুখে রয়েছ বিষাদ ভরে ?
যথায় এসেছ সখা, চিনিতে পার না যেন
তাই কি সঙ্কোচ ভরে বিষাদ বিষণ্ণ হেন ?
থাকিবে কি চলে যাবে ভেবে যেন নাহি পাও
ব্যথিত হৃদয়ে শুধু ছলছল চোখে চাও।

(রবি ১৩৩৮ ত্রিপুরাব্দ—পৌষ)

এ ছাড়া কবির অন্যভাবের কবিতাও সংগৃহীত হয়েছে। ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দের আশ্বিন সংখ্যার রবিতে 'পূর্বরাগ' নামে একটী কীর্ত্তন রয়েছে। এটি আগেই কবির 'প্রীতি' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। "প্রীতি"র আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তার উল্লেখ করেছি।

১৩৩৮ ত্রিপুরাব্দের চৈত্র সংখ্যায় একটি মিশ্রব্রজবুলি পদ দেখতে পাই। যেমন—

আওল ঋতু-রাজ রে।
কোকিল কূজিত ঘন, মধুকর গুঞ্জন
মলয় মৃদুল সমীরে।—

এ ছাড়া আরো অনেক কবির রচনাই 'রবি'তে প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে সম্পাদক নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা ও যতীন্দ্র-প্রসাদ ভট্টাচার্যের নাম করা যেতে পারে। এঁদের কোন কোন কবিতা অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে।

প্রবন্ধ—প্রবন্ধ সাহিত্যে-ও 'রবি'র স্থান নগণ্য নয়। সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক প্রবন্ধে 'রবি'র পৃষ্ঠাগুলি সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রবন্ধকারদের অধিকাংশই স্থানীয় লেখক। "বাঙ্গলা ভাষার চারিযুগ" নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধে নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মা বাঙলা ভাষার উৎপত্তি ও ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। কবি গোবিন্দদাসের কবিতার ধারাবাহিক সমালোচনা করেছেন হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

১৩৩৪ ত্রিপুরাব্দের পৌষ সংখ্যার 'রবি'তে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর "ময়মনসিংহ গীতাবলী" প্রবন্ধে কাঞ্চনমালার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কাঞ্চনের সপত্নীর কথায় তাঁর স্বামী তাঁকে বানবাস দিলেন। কিন্তু বনে পাঠিয়েও মন থেকে দূর করতে পারলেন না। কাঞ্চনের শোকে রাজা অন্ধ হ'য়ে বনে বনে ফিরতে লাগলেন। কাঞ্চন ও পাগলের মত স্বামীর খোঁজ করছিলেন।—

"রাত্রি যায় দিনরে আসে বাম হইয়াছে বিধি।
পাগল হইয়া ছুটে কন্যা যেন শাউনিয়া নদী।"

শেষে দু'জনের দেখা হ'ল। এক সাধুকে পেয়ে কাঞ্চন তাঁকে বললেন,

"ধনরত্ন নাহি চাই করহ আহ্বান।
আমায় অন্ধ করে কর স্বামীর নয়নদান।"

সাধু একটি সর্তে তাঁর স্বামীর চক্ষুদান করতে রাজি হ'লেন। সর্তটি হ'ল, কাঞ্চন জন্মের মত স্বামীকে সপত্নীর হাতে দান করবেন। এই অগ্নি-পরীক্ষায় পরে হ'লেন কাঞ্চন। তাঁর স্বামী দৃষ্টি ফিরে পেলেন। পল্লীকবি লিখেছেন—

"এ বড় কঠিন পণ নারী হইয়া জিনে।
না জিনিবে হেন পণ পুরুষ প্রবীণ।

পাঠকের সুবিধার জন্য দীনেশবাবু কাঞ্চনমালা গীতিকার ভাষা খানিকটা পরিবর্তন করেছেন।

১৩৩৮ ত্রিপুরাব্দের চৈত্র সংখ্যায় ত্রিপুরার দেওয়ান সাধক কবি রামদুলাল ও কবি রামপ্রসাদের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন বরদারঞ্জন চক্রবর্তী। এই প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত হয়।

শীতলচন্দ্র চক্রবর্তীর প্রবন্ধগুলি বিশেষ পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। তাঁর পুত্র ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীর নানা প্রবন্ধ রবির পৃষ্ঠায় ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। "ঋষিসঙ্গ বা ষড়দর্শন প্রবেশিকা" নামে

ধারাবাহিক প্রবন্ধে হেমন্তকুমার বসু দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করেছেন।

"ত্রিপুরার মঠ ও মন্দির" নামে লেখা ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মার ধারাবাহিক প্রবন্ধটি ত্রিপুরার স্থাপত্য সম্পদকে আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত করছে। কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্তের প্রবন্ধগুলি প্রাচীন ত্রিপুরার দিগ্‌দর্শক। এ-অঞ্চলের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক অনেক তথ্য এদের মধ্যে সন্নিবিষ্ট রয়েছে। ত্রিপুরাকে জানবার পক্ষে এদের মূল্য অনেকখানি। ১৩৩৮ ত্রিপুরাব্দের আশ্বিনের 'রবি'তে 'ত্রিপুরায় হুসমভোজন' নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরায় প্রচলিত একটি অভিনব প্রথার সন্ধান পাই। আগেকার দিনে কোন কোন সময় বিশেষ ক'রে যুদ্ধযাত্রার আগে ত্রিপুর রাজ্যে সৈন্যদের ভোজ দেওয়া হ'ত। তার নাম 'হুসমভোজন'। 'হুসম' শব্দের অর্থ অনেকে অনেক রকম করেছেন। তবে সাধারণত এটা সৈনিকদের ভোজ। প্রতিবৎসর বিজয়া দশমীর রাত্রে এই ভোজ হ'ত। এতে পার্বত্য প্রজা ও সর্দারগণ নিমন্ত্রিত হ'তেন। ত্রিপুরারাজ্যের এই বিশিষ্ট সামাজিক প্রথার অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়েও লেখক আলোচনা করেছেন।

তাঁর আরেকটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ "ত্রিপুরায় সতীদাহ" ১৩৩৮ ত্রিপুরাব্দের পৌষের রবিতে প্রকাশিত হয়। তার থেকে আমরা জানতে পারি, ত্রিপুরায় সতীদাহ বহুকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। মহারাজ ধন্যমাণিক্যের মৃত্যুর পর মহারানী কমলাদেবী চিতারোহণ করেন। দেবমাণিক্যের মহিষী ও বিজয়মাণিক্যের মহিষীগণ-ও সহমরণে যান। 'রাজমালা'য় এ-রকম বিস্তর উদাহরণ রয়েছে। রাজ-পরিবার ছাড়া জনসাধারণের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ভারতে সতীদাহ বন্ধ হয়—এবং দেশীয় রাজ্যগুলিতেও এ-আইন বলবৎ হয়। কিন্তু তার পরও ষাট বছর ত্রিপুরায় সতীদাহ ছিল।

অবশেষে ১২৯৯ ত্রিপুরাব্দের ৮ই জৈষ্ঠের রোবকারী দ্বারা বীরচন্দ্রমাণিক্য এই প্রথা বন্ধ করেন।

"উত্তর পশ্চিমে ও কাশ্মীরে" নামে বিচিত্র ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত। রাজনৈতিক কারণে কাশ্মীর সম্পর্কে আজ আমাদের আগ্রহের অবধি নেই। এই কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন লেখক।

কাহিনী ও রূপকথা—'রবি'র বিভিন্ন সংখ্যায় কতগুলি বড় গল্প রয়েছে। আর আছে কাহিনী ও রূপকথা। এগুলো ত্রিপুরার নিজস্ব সম্পদ। আর সব জাতির মত ত্রিপুরার পার্বত্য জাতির মধ্যে ও নানা রকম রূপকথা প্রচলিত। এদের মধ্যে ত্রিপুরার সামাজিক ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রয়েছে। বিভিন্ন লেখক লেখিকা 'রবি'র পৃষ্ঠায় এদের সাহিত্যিক রূপ দান করেছেন।

১৩৩৪ ত্রিপুরাব্দের চৈত্রের রবিতে "অজগর সাপের গল্প" লিখেছেন নিরুপমা দেবী। এটি ত্রিপুর ভাষায় প্রচলিত রূপকথা। এক ছিল ওঝা, তার দুই মেয়ে। বড় হয়ে মেয়ে দুটি 'জুমে' কাজ করতে গেল। ত্রিপুরার পার্বত্য জাতির মধ্যে হালচাষ করবার প্রথা নেই। বড় বড় জঙ্গল কেটে তা'তে তারা আগুন লাগিয়ে দেয়। ছাই পড়ে মাটি বেশ উর্বর হয়। তারপর টাককাল নামে তাদের এক রকমের দা দিয়ে গর্ত খুঁড়ে ধান, তরকারি, কার্পাস, তিল ইত্যাদি একই সঙ্গে লাগিয়ে দেয়। তাদের এই আদিম প্রথাকে 'জুমচাষ' বলে। আর ক্ষেতটিকে বলে 'জুম'। বন্য জন্তু থেকে জুম পাহারা দেবার জন্য তারা বাঁশের মাচার ওপর এক রকমের ঘর তৈরি করে। তার নাম 'টঙ্' ঘর।

অন্যদের জুমের মত এই দুটি বোনের জুমে কোন টঙ্ ছিল না। এজন্য বর্ষায় তাদের বড় কষ্ট হ'ত। একদিন বড় মেয়েটি বলল "কেউ যদি আমাদের জুমে টঙ্ বেঁধে দেয় তবে সে যে-ই হোক

তাকেই আমি বিয়ে করব।" তারপর তারা ঘরে চলে এল। পরদিন গিয়ে দেখে তাদের ক্ষেতে একটি সুন্দর টঙ্‌ ঘর আর তার ওপর শুয়ে আছে এক প্রকাণ্ড অজগর সাপ। বড় মেয়েটি তার কথামত ওই সাপকে স্বামী ব'লে মেনে নিল। একদিন সে তার ছোট বোনকে বলল তার ভগিনীপতিকে নিমন্ত্রণ করতে। ছোট বোনটি তো ভয়েই সারা। শেষে সে অনেক কষ্টে রাজি হ'ল। সে ভাত বেড়ে সুর ক'রে তার "কুমুই"কে ডাকল। "কুমুই" মানে ভগিনীপতি। খানিক বাদে সাপটা এসে ভাত খেয়ে গেল। রোজ এরকম ক'রেই চলতে লাগল। একদিন ওঝা মেয়েদের দেখতে এল। বড় মেয়েটি তখন বাইরে ছিল। ছোট মেয়ের কাছ থেকে বুড়ো সব কথা শুনল। তারপর ওইদিন যেই সাপটা এসে ভাত খাবার জন্য গলা বাড়িয়েছে, অমনি সে এক কোপে তার মাথাটা কেটে ফেলল। তারপর, সাপটার মাংস বেশ ভাল করে রেঁধে বড় মেয়েকে খেতে দেওয়া হ'ল। কিন্তু, কি জানি এক অজানা আশঙ্কায় মেয়েটির বুক কেঁপে উঠল। সে ছোট বোনটিকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীর খোঁজে যাত্রা করল। সুর করে সে স্বামীকে ডাকতে লাগল। তার আকুল কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হ'ল বনে বনে। তারপর চলতে চলতে দুই বোন এসে হাজির হ'ল এক খালের ধারে। এই খালে অনেক "খুম্পুই" ফুল ফুটেছিল। আর এখানেই সাপটার কাটা মাথা ফেলা হয়েছিল। ত্রিপুর ভাষায় দোলন চাঁপাকে বলে 'খুম্পুই'। ছোট বোনটি একটি ফুল কানে পরতেই সেটা শুকিয়ে গেল, আর বড় বোনটি পরতেই সেটা সতেজ হ'য়ে উঠল। এই অদ্ভুত ঘটনায় বড় বোনটির মনে খটকা লাগল। তার কেমন মনে হল তার স্বামী এই জলের ভেতর আছে। এই ভেবে সে জলে ডুব দিল। ডুব দিতেই দেখে জলের ভেতর মস্ত পুরী, আর তার স্বামী দরজায় দাঁড়িয়ে।

তারপর ঘটনাক্রমে ছোট বোনটির সঙ্গে রাজার বিয়ে হ'ল। তার সাতটি ছেলে আর একটি মেয়ে হ'ল। কিন্তু অন্যান্য রানীরা

ছেলেমেয়েগুলিকে এই খালের জলে ফেলে দিল আর বললে ছোটরানী কাঠপাথর ইত্যাদি প্রসব করেছে। রাজা ভাবলেন এ নিশ্চয় রাক্ষসী, নইলে মানুষ কখনো কাঠ পাথর প্রসব করে? রাজা তাকে ছাগল চরাতে হুকুম দিলেন। অতি দুঃখে ছোটরানীর দিন কাটতে লাগল।

ওদিকে ছেলেমেয়েরা জলের ভেতর তাদের মাসীর কাছে বড় হ'তে লাগল। এদিকে যারা জল তুলতে যায় তারা দেখে কারা যেন ঢিল ছুঁড়ে তাদের কলসী ফুটো করে দেয়। ক্রমে কথাটা রাজার কানে উঠল। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হ'ল। ছোটরানী আবার মহিষী হলেন। আর সব রানীদের শাস্তি হ'ল।

"সিপিং তুই মাইরুং তুই"—এর কাহিনী লিখেছেন গোলাপফুল দেবী। এটিও ত্রিপুরার রূপকথা। এক কৃষকের দুই স্ত্রী। বড় স্ত্রীর একটি মেয়ে, তার নাম সিপিংতুই। আর ছোট স্ত্রীর একটি মেয়ে। মেয়েটির নাম মাইরুং তুই। সিপিং তুই-এর মা ছিল না। তার সৎমা তাকে বড় কষ্ট দিত।

সিপিং তুই-এর রং কালো, কিন্তু শরীরের গঠন খুব সুন্দর। মাইরুং তুই দেখতে ফর্সা হ'লেও চেহারা বিশ্রী। মাইরুং তুই ভাল শাড়ি প'রে ভাল কলসীতে জল আনতে যেত আর সিপিং তুই ছেঁড়া শাড়ি প'রে ভাঙা কলসীতে জল আনতে। একদিন দুই বোন টঙে ব'সে জুম পাহারা দিচ্ছে। এমন সময় রাজার বিনন্দিয়ারা এসে জল খেতে চাইল। পার্বত্য প্রদেশে যারা পুলিশের কাজ করত ত্রিপুরায় তাদের বলা হ'ত বিনন্দিয়া। এদের কর্তার নাম "নাজির।" সিপিং তুই 'তিলক' (লাউ) থেকে ঠাণ্ডা জল খেতে দিল তাদের। তারা গিয়ে রাজাকে এই খবর দিতেই রাজা ছদ্মবেশে সিপিং তুইকে দেখতে এলেন আর তাকে পছন্দ ক'রে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে এলেন রাজধানীতে।

সিপিং তুই-এর সৌভাগ্য দেখে মাইরুং তুই আর তার মা তো ঈর্ষায় জ্বলে মরতে লাগল। একদিন মাইরুং তুই-এর মা সিপিং

তুই-এর কাছে মিথ্যে খবর পাঠাল যে তার বাপ অসুস্থ। খবর পেয়ে সিপিং তুই বাপকে দেখবার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। রাজা তখন নিজের হাতে সিপিং তুই-এর খোঁপা বেঁধে দিলেন। আর একটি সোনার ফুল তা'তে পরিয়ে দিলেন। বললেন, ওই খোঁপা যেন যেখানে সেখানে না খোলে। বাপের বাড়িতে এলে মা বলল তার বাপ ম'রে গেছে। সিপিং তুই কাঁদতে লাগল। এদিকে মাইরুং তুই সিপিং তুই-এর খোঁপা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ফুলটি খুলে টঙের নিচে ফেলে দিল। সিপিং তুই যেই ফুল আনতে টঙের নিচে গেল অমনি মা-মেয়েতে ওপর থেকে গরম জল ঢেলে দিল। তারপর সিপিং তুইকে মরা ভেবে তার দেহটা জঙ্গলে ফেলে দিল।

সিপিং তুই-এর শাড়ি গয়না পরে মাইরুং তুই রাজবাড়িতে এল। রানীকে দেখে রাজার মনে কেমন একটা খটকা লাগল, তিনি আর অন্তঃপুরে আসেন না। একদিন তিনি শিকারে গেলেন, সেখানে এক হরিণের ঘর ছিল। সে মানুষের মত কথা বলতে পারত। তার ঘরে সিপিং তুই-এর সঙ্গে রাজার দেখা হ'ল। হরিণ বলল রাজা যদি মাইরুং তুই-এর রক্তে সিপিং তুইকে স্নান করাতে পারেন তবেই তিনি আবার রাজধানীতে ফিরে যাবেন, নইলে নয়। রাজা একদিন রানীকে নিয়ে নদীতে স্নান করতে গেলেন আর সেখানে তলোয়ার দিয়ে তাকে কেটে ফেললেন। তার রক্ত নেওয়া হ'ল। মাথাটা একটা বড় হাঁড়িতে রাখা হ'ল। আর শরীরটা ভাল ক'রে রাঁধতে দেওয়া হ'ল।

রক্তস্নান ক'রে সিপিং তুই প্রাসাদে ফিরে এলেন। তারপর মাইরুং তুই-এর মাকে নিমন্ত্রণ করা হ'ল তার নাতির সূর্যদর্শন ব'লে। নাতি হয়েছে শুনে বুড়ি তো বেজায় খুশি হ'য়ে ছেলেকে নিয়ে এসে হাজির। তখন সেই মাংস তাদের খেতে দেওয়া হ'ল। বাড়ি ফেরার সময় মুখবাঁধা হাড়িটা পথের খাবার ব'লে

দেওয়া হ'ল। বাড়ি ফিরে মাইরুং তুই-এর মা স্বামীকে বলল চল হাঁড়ির ভেতর কি আছে দেখা যাক। হাঁড়ির মুখ খুলে মেয়ের কাটা মাথা দেখে বুড়োবুড়ি মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

"আচু জোয়ান খাঁ" এরকম আরেকটি রূপকথা, লিখেছেন বিপিন চন্দ্র দেববর্ম্মা। এক গৃহস্থের সাতটি মেয়ে ছিল। একদিন তারা জুমে গেল তরকারি সংগ্রহ করতে। যে যার লাঙা (ঝুড়ি) ভ'রে তরকারি নিয়ে বাড়ি ফিরে আসছে এমন সময় পথের ধারে একটি ছড়া দেখতে পেল। এই ছড়ায় স্নান করবার ইচ্ছে হ'ল তাদের। কিন্তু, বাড়ি থেকে আলাদা কোন কাপড় তো আনেনি। তখন সাত বোন মিলে যুক্তি ক'রে কাপড় ছেড়েই স্নান করতে নামল। এদিকে একটা বানর এসে তাদের কাপড়গুলি নিয়ে গেল। স্নান সেরে কাপড়ের খোঁজ করতেই সবাই দেখে কাপড়গুলি গাছের ডালে আটকে আছে। টঙ ঘরের মই নিয়ে এসে যেই তারা কাপড় পাড়তে গেল অমনি দেখে মস্ত এক বানর। তখন তারা হাতজোড় করে বানরকে বলতে লাগল "আচু আচু জোয়ান খাঁ" অর্থাৎ হে জোয়ান ঠাকুরদা, আমাদের কাপড় ফিরিয়ে দাও। বানর তাদের বলল মই-এর ওপর উঠে কাপড় নিয়ে যেতে। একে একে সবাই গিয়ে কাপড় নিয়ে এল, কিন্তু যেই ছোট মেয়েটি কাপড় আনতে মই-এর ওপর উঠেছে অমনি বানর তাকে টেনে তুলল গাছের মাথায়। ছয় বোনে কত মিনতি করল, কিন্তু বানর ছাড়বার পাত্র নয়। তখন তারা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে গেল।

এদিকে বানর মেয়েটিকে নিয়ে দূর বনে ঘর বাঁধল। তাদের দুটি ছেলে হ'ল,—টতে আর বাতে। একদিন মেয়েটি আমড়া খেতে চাইল। বানর পরদিনই একটা ঝুড়ি নিয়ে আমড়া পাড়তে গেল। ঝুড়ি বোঝাই আমড়া নিয়ে সে বাড়ির দিকে রওনা হ'ল। কিন্তু বানরের লোভ তো। সে ঝুড়ি থেকে এক একটি আমড়া খায় আর বিচিটা ঝুড়িতেই রেখে দেয়। এভাবে বিচি বোঝাই ঝুড়ি

নিয়ে সে বাড়ি ফিরল। টতের মা তো দেখেই রেগে আগুন। বানর বুঝিয়ে বলল সে পরদিন আবার আমড়া এনে দেবে। পরদিন যখন বানর বেরিয়ে গেল তখন টতের মা-ও চলল বাপের বাড়ির উদ্দেশে। অনেক ঘুরে সে বাপের বাড়ি এসে পৌঁছল। এদিকে বানর ফিরে এসে দেখে ঘর খালি। তখন সে কাঠ দিয়ে একটি 'সারিন্দা' তৈরি করল আর পোষা বেড়ালটাকে মেরে তার চামড়া দিয়ে ছাউনি দিল। সারিন্দা বাজিয়ে অত্যন্ত করুণ সুরে গান গাইতে গাইতে সে স্ত্রী-পুত্রের খোঁজে এ-জুম থেকে ও-জুমে ঘুরতে লাগল। শেষে অনেক কষ্টে হাজির হ'ল শ্বশুর বাড়িতে। তারা তাকে মৌখিক সম্বর্ধনা জানাল।

এদিকে সবাই মিলে পরামর্শ করতে লাগল কি ক'রে তাকে মারা যায়। তারা ঘরের মাচার খানিকটা কেটে ফাঁক ক'রে রাখল আর তার নিচে রাখলে মনকাঁটা আর চোখাল বাঁশ। পাড়ার শুয়োর আর কুকুরটিকে বেঁধে রাখল মাচার নিচে। তারপর বানরকে খুব মদ খেতে দিল। নেশায়-বিভোর হ'য়ে সে যখন ঘুমুতে চাইল তখন ওই ফাঁকের কাছটিতে তার শোবার জায়গা দেওয়া হ'ল। বানরের পাশে তার স্ত্রী-ও শুয়েছে। সে রাত্রে তাকে বলল একটু স'রে ঘুমুতে। বানর স'রে গেল। স্ত্রী আবার বলল সরতে। এভাবে সরতে সরতে বানর ফাঁক দিকে পড়ে গেল। তার গায়ে ফুটল কাঁটা, চোখাল বাঁশ পেটে বিধঁল, কুকুর আর শুয়োরও যথাকর্তব্য করতে লাগল। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে বানর মরে গেল।

পরদিন টতের মা বানরকে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে শুকোতে দিল। কয়দিন শুকোলে পর ওই মাংস পাড়ায় বেচতে গেল। ছেলেরা পেছন থেকে বলতে লাগল "বানর বাবার মাংস।" একথা শুনে সবাই তাকে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিল। তখন টতের মা রাগ ক'রে ছেলে দু'টোকেও মেরে ওই মাংসের ঝুড়িতে ক'রে জঙ্গলে ফেলে দিল।

"স্নারেম্বি চায়শ্রা" একটি মণিপুরী রূপকথা। লেখক বিপিনচন্দ্র দেববর্মা। এর কাহিনী অনেকটা "সিপিং তুই মাইরুং তুই"—এর অনুরূপ। এক গৃহস্থ দুটি মেয়ে রেখে মারা যায়। তার স্ত্রী মেয়েদুটিকে ঘরজামাই এনে বিয়ে দিল। বড় মেয়েটির একটি মেয়ে হ'ল। খুব সুন্দরী ব'লে তার নাম রাখা হ'ল স্নারেম্বি। ছোট মেয়েরও একটি মেয়ে হ'ল, তার নাম রাখা হ'ল চায়শ্রা। কিছুদিন পর চায়শ্রার বাপ মারা গেল। তখন স্নারেম্বির বাপই দুই সংসারের কর্তা হ'লে বসল। এদিকে চায়শ্রার মার সব সময় চিন্তা কি ক'রে তার দিদির অনিষ্ট করা যায়। একদিন দুই বোনে মাছ ধরতে গেল। মাছের সঙ্গে সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি অনেক রকম বিষাক্ত জীব ওঠে। দিদি কেবল বেছে মাছই তুলল, কিন্তু বোনটি সবকিছু 'তোলা'য় ভ'রে নিল। ফেরবার পথে তাদের সখ হ'ল আমড়া খাবে। কথা হ'ল ছোট বোন ওপরে উঠে ঝাঁকা দেবে আর দিদি নিচে থেকে আমড়া কুড়োবে। এইরকম দিদি যখন আমড়া কুড়োচ্ছে তখন ছোট বোন ওপর থেকে সাপ ব্যাঙ ইত্যাদি ঢেলে দিলে। এদের দংশনের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে বড় বোনটি মরে গেল। ছোট বোন তখন তার দেহটা ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

মাতৃহীনা স্নারেম্বি মাসীর সংসারে দাসীর মত খাটতে লাগল। একদিন সে ও চায়শ্রা জল আনতে পাড়ায় চলল। এমনি সময় সে-দেশের রাজাও শিকার থেকে ফিরছেন। তিনি স্নারেম্বির হাতে জল খেতে চাইলেন। আর সে যেমনি জল দিতে গেল অমনি তাকে হাতির পিঠে তুলে নিয়ে চললেন রাজধানীর দিকে।

কিছুদিন পর রানী স্নারেম্বির ছেলে হয়েছে শুনে তো চায়শ্রার মা হিংসায় ম'রে যেতে লাগল। একদিন সে খবর পাঠাল স্নারেম্বির বাপ অসুস্থ, তাঁকে দেখতে চায়। স্নারেম্বি বাপকে দেখতে এল। মাসীমা তাকে বলল 'চল ঘাট থেকে স্নান ক'রে আসি।' স্নান করতে ব'সে স্নারেম্বির পিঠ ঘষবার ছলে মাসী তার গায়ে ফুটন্ত গরম জল ঢেলে

দিল। স্নারেস্থি জ্বালায় ছটফট করতে করতে ম'রে গেল। তখন মাসী তাকে ঝোপের ভেতর লুকিয়ে রেখে বাড়ি ফিরে এল।

চায়শ্রা স্নায়েস্থির শাড়ি গয়না প'রে প্রাসাদে ফিরে এল। কিন্তু রাজার মনে যেন শান্তি নেই। এদিকে স্নারেস্থির প্রাণ ঘুঘুপাখি হ'য়ে ফিরে এল রাজবাড়িতে। রাজবাড়ির ছোকরা সহিস তাকে দেখতে পেল। পাখিটা বলছে—

"আমার বাছা রাজকুমার মরবে, আমার রেশমি শাড়ির সুতো ছিঁড়বে, ওহে ভোলা অবোধ স্ত্রৈণ রাজা, কি ভুলেই ভুলেছ, ভুলেই থাক।" সহিসের কাছে খবর পেয়ে রাজা এলেন আর প্রমাণ পেলেন এই তার রানী। তখন রাজা পাখিটাকে ধ'রে এনে সোনার খাঁচায় রাখলেন আর নিজের হাতে যত্ন করতে লাগলেন। রাজাদের সখ আর ক'দিন থাকে? ক্রমে পাখির সেবার ভার পড়ল দাসীদের ওপর। একদিন রানী চায়শ্রা রাজকুমারকে নিয়ে এলেন পাখি দেখতে। এই রাজকুমার স্নারেস্থির ছেলে। পাখিটা আদর ক'রে আস্তে আস্তে কুমারের চোখের ময়লা ফেলে দিচ্ছে দেখে রানী ভাবলেন তাকে কানা করে দিচ্ছে। এই ভেবে তিনি আদেশ দিলেন পাখিটাকে মেরে ফেলতে। মরা পাখিটা আবার পাতিনেবুর গাছ হ'য়ে উঠল। একদিন সহিস ছোকরা ওই গাছ থেকে একটি নেবু পেড়ে নিয়ে এল। ওই নেবু থেকে রানী বেরোলেন। রানী একদিন কুমারকে দেখতে চাইলেন। সহিস কুমারকে কোলে ক'রে তার ঘরে নিয়ে এল। রানী তাকে অনেক আদর করলেন আর খেতে দিলেন। এমনি রোজ চলতে লাগল। এদিকে রাজার কানে কথা উঠল, কুমার কোনদিন রাত্রেই কিছু খায় না। তখন রাজা তাকে জিজ্ঞেস ক'রে সব শুনে সহিসের ঘরে এসে হাজির হলেন। রানীকে দেখে তিনি তো অবাক। অনেক মান অভিমানের পর রানী রাজাকে সব কথা খুলে বললেন। রাজা অন্দরে ফিরে এসে জল্লাদকে হুকুম দিলেন চায়শ্রাকে জঙ্গলে নিয়ে কেটে ফেলতে। তারপর মিছিল পাঠিয়ে রানী স্নারেস্থিকে নিয়ে আসা হ'ল।

এদিকে চায়শ্রার মাকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠানো হ'ল। সে তো খুব খুশি হ'য়ে মেয়ের বাড়িতে এসে হাজির। তাকে খুব যত্ন ক'রে খেতে দেওয়া হ'ল। খেয়ে দেয়ে ব'সে যখন তামাক খাচ্ছে তখন রানী স্নারেম্বি হঠাৎ সামনে এসে জিজ্ঞেস করলেন—"মাসীমা, আমাকে চেনেন?" মাসীমা তাকে দেখে একেবারে হতজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিল, কোন কথাই বলতে পারল না। রাজা তখন হুকুম দিলেন—"একে নিয়ে জীবন্ত কবর দাও গে।"

১৩৩৮ ত্রিপুরাব্দের পৌষের 'রবি'তে 'ত্রিপুর পৌরাণিক কথা' লিখেছেন বিপিনচন্দ্র দেববর্মা। এটি ত্রিপুরার কুলদেবতা চৌদ্দ দেবতার কাহিনী। মহারাজ ত্রিলোচনের মা রানী হীরাবতী একদিন নদীর ঘাটে জল আনতে গেছেন। অমনি কারা যেন ব'লে উঠল "রানীমা, আমাদের রক্ষা কর, রক্ষা কর।" রানী জিজ্ঞেস করলেন "তোমরা কে?" তখন ওপার থেকে জবাব এল—"আমরা চৌদ্দ জন দেবতা, এক দুর্দান্ত মহিষের ভয়ে শিমুল গাছে আশ্রয় নিয়েছি। মহিষটা সারাদিন ধ'রে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। এখন সে ঘুমিয়েছে। তুমি তোমার 'রিয়া' (বক্ষবন্ধনী) মহিষটার গায়ে ফেলে দিলে সে বশ হ'বে। তখন তাকে শিমুল গাছে বেঁধে বলি দিয়ো।"

দেবতাদের কথা শুনে রানী বাড়ি গিয়ে প্রতিবেশী প্রজাদের নিয়ে ফিরে এলেন। আর 'রিয়া' খুলে তাদের হাতে দিয়ে যা যা করতে হ'বে ব'লে আবার বাড়ি ফিরে গেলেন। 'রিয়া'টা পিঠের ওপর ফেলতেই মহিষটা বশ হ'ল। তখন তাকে বেঁধে বলি দেওয়া হ'ল। দেবতারা গাছ থেকে নেমে এসে তার রক্ত খেলেন আর বললেন তাঁদের পিঠে ক'রে নিয়ে যেতে। কারণ তাঁদের চলবার শক্তি ছিল না।

সেদিন ছিল আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী। মহিষটা বলি দিতে বেশ রাত হ'য়ে গিয়েছিল। তখন আর চাঁদনী ছিল না। প্রজাদের প্রত্যেকের মাথায় ছিল এক একটি পাতার ছাতা। টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল। তাই ছাতা মাথায় দিয়ে দেবতাদের পিঠে নিয়ে

"এহোঁউ, এহোঁউ" শব্দে তারা অগ্রসর হ'তে লাগল। অন্ধকার রাত্রে পথভ্রষ্ট হ'বার আশঙ্কায় তারা এ রকম শব্দ ক'রে পরস্পরের গতির প্রতি লক্ষ্য রাখছিল। রাজবাড়িতে ফিরে এসে রানী হীরাবতী দেবতাদের একটি ঘর দিলেন আর তাদের সেবা পুজোর ব্যবস্থা করলেন।

মহারাজ ত্রিলোচন তখন শিশু ছিলেন। রানী তাঁকে রোজ দেবতাদের ঘরে খেলতে পাঠাতেন আর খবার সময় ডেকে নিয়ে আসতেন। একদিন চেয়ে দেখেন ছেলের মুখ রক্তহীন বিবর্ণ। ত্রিলোচনকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন দেবতাদের ঘরে যাবার সময় তিনি বেশ থাকেন কিন্তু ফিরে আসবার সময় বড় দুর্বল বোধ হয়। একথা শুনে রানীর মনে খটকা লাগল। তিনি একদিন দেবতাদের ঘরে আড়ি পেতে দেখেন একটি পাঁঠা বলি দেওয়া হ'ল, দেবতারা সবাই মিলে তার রক্ত পান করলেন। তারপর মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিতেই পাঁঠা আবার মানুষ হ'য়ে উঠল। সে আর কেউ নয়, ত্রিলোচন। এই কাণ্ড দেখে রাগে অধীর হয়ে রানী ঘরের দরজা খুলে ফেললেন। দেবতারা ধরা প'ড়ে লজ্জায় মাথা নিচু ক'রে রইলেন। রানীর তিরস্কারের জবাবে তাঁরা বললেন একবিন্দু রক্ত পান করলে তাঁদের যে-তৃপ্তি হয় নিত্য অমৃত পানে-ও তা হয় না। তখন রানী নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাঁদের জন্য রোজ একটি পাঁঠা বলির ব্যবস্থা করলেন।

এই কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু তা বলা কঠিন। কিংবদন্তী থেকে প্রকৃত ইতিহাস খুঁজে বের করা সহজ নয়। তবে খার্চি পুজো উপলক্ষে এখনো চৌদ্দ দেবতাকে নদীতে নিয়ে স্নান করান হয়, আর সেই স্নানের সমারোহের সময় সবাই পাতার ছাতা মাথায় দিয়ে "এহোঁউ, এহোঁউ" শব্দ ক'রে অগ্রসর হয়। তা ছাড়া মহিষ বলির সময় রিয়ার পরিবর্তে একটি পৃষ্ঠাচ্ছাদন বস্ত্র দেওয়া হয়, আর শিমুল গাছ রোপণ ক'রে তা'তে বেঁধে বলি দেওয়া হয়।

১৩৪০ ত্রিপুরাব্দের চৈত্র মাসে ষষ্ঠ বর্ষ—চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হ'বার পর 'রবি' পত্রিকাটি বন্ধ হ'য়ে যায়। তারপর, শঙ্করীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'ত্রিপুরা' নামে একটী সাপ্তাহিক কিছুদিন চলেছিল।

"ত্রিপুরা" পত্রিকাটি আকারে অত্যন্ত ছোট। ১৩৪২ ত্রিপুরাব্দের ২৪শে ফাল্গুন তার 'ফাগুয়াসংখ্যা' প্রকাশিত হয়। এতে বীরচন্দ্র মাণিক্যের একটি অপ্রকাশিত কবিতা আছে। কবিতাটি নিচে দেওয়া গেল—

বসন্ত

মন্দ মন্দ বহত পবন,
বিরহিণীজন হৃদয় দহন,
পিয়াকি কারণ ঝুরত নয়ন,
মাহেরী ফাগুন আয়েরী।
ফুটে রহি ফুল মাধবী-মালতী
গেন্দি গোলাপ উজর সেউতি,
আউর বকুল চম্পক যুথী
অলিগণ সদা গুঞ্জরী।
মত্ত ময়ুর নাচত সঘন,
হেরত বরজ যুবতী গণ,
কোয়েলা কোয়েলী আনন্দে মগন,
দাস বীরচন্দ্র গায়েরী।

রবীন্দ্র সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পর্ক বহুদিনের। তার 'ভগ্নহৃদয়' প্রকাশিত হ'বার পর বীরচন্দ্র মাণিক্য তা প'ড়ে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর একান্ত সচিব রাধারমণ ঘোষকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন কবিকে

অভিনন্দন জানাবার জন্য। এভাবে যে-সম্পর্কের সূচনা হয় কালক্রমে তা নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়েছে। রাধাকিশোর মাণিক্যের আমন্ত্রণে কবি প্রথম ত্রিপুরায় আসেন। তারপর রাধাকিশোরের প্রীতির আকর্ষণ বার বার তাঁকে অগরতলায় টেনে এনেছে।

১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দের ১০ই ফাল্গুন শেষবারের মত কবি আগরতলায় আসেন। ওই বৎসরের চৈত্র সংখ্যার রবিতে রবীন্দ্রনাথের ত্রিপুরা আগমন বর্ণিত হয়েছে। কবির চিঠিপত্র ও পুরনো প্রবন্ধে মণ্ডিত হ'য়ে 'রবি' আত্মপ্রকাশ করল। এর নাম 'রবীন্দ্র-সম্মিলন সংখ্যা।'

রবীন্দ্রনাথের আগমন উপলক্ষ্যে নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মার রচিত একটি গান গাওয়া হয়। গানটি "রবিমঙ্গল" নামে 'রবি'তে প্রকাশিত হয়।

'কিশোর সাহিত্য সমাজ'-এ রবীন্দ্রনাথ এলেন। সে-সভায় দীনেশচন্দ্র চৌধুরীর লেখা আগমনী গান গাওয়া হ'ল। সভাপতি ছিলেন ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা। তাঁর বিনয় নম্র ভাষণে তিনি কিশোর সাহিত্য সমাজের জন্য কবির আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। রবীন্দ্র প্রশস্তি পাঠ করেন শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী। কবি তার উত্তরে বলেন—

"এই ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে আমার যে প্রথম পরিচয়, তা খুব অল্প বয়সে। সদ্য England থেকে ফিরে এসেছি; তখন একখানিমাত্র কাব্য প্রকাশিত হয়েছে। বাল্যের রচনা, অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি অনেক ত্রুটী থাকায় পুনঃ প্রকাশিত হয় নাই।

সেই সময় আমাকে এবং আমার লেখা সম্বন্ধে খুব অল্প লোকেই জানতেন। আমার পরিচয় তখন কেবল আত্মীয় স্বজন নিকটতম বন্ধুজনের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। একদিন এই সময়ে ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের দূত আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। বালক আমি, সসঙ্কোচে আমি তাঁকে অভ্যর্থনা করলাম। আপনারা হয়তো অনেকেই দূত মহাশয়ের নাম জানেন—তিনি রাধারমণ ঘোষ।

মহারাজর তাঁকে সুদূর ত্রিপুরা হ'তে বিশেষভাবে পাঠিয়েছিলেন কেবল জানাতে যে, আমাকে তিনি কবিরূপে অভিনন্দিত করতে ইচ্ছা করেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বালক কবির বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

এর পর থেকে নানা সময়ে নানা উপদেশ এবং বিশেষ ক'রে 'রাজর্ষি' লিখিবার সময়ে 'রাজমালা' থেকে সংস্কৃত বিষয়গুলি ছাপিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তার থেকে আমি গোবিন্দমাণিক্যের প্রকৃত ইতিবৃত্ত জানতে পেরেছিলুম।

তিনি কার্সিয়াং-এ যাবার সময়ে আমাকে তাঁর সঙ্গে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ করলেন। আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় তিনি আমার লেখা শুনতেন আর গান গাইতে বলতেন। তাঁর স্নেহ, আদর আমার প্রাণে স্থায়ী রেখা টেনে গেছে।

মহারাজ বীরচন্দ্র অসাধারণ সঙ্গীত বিশারদ ছিলেন। তাঁর কাছে আমার মত অনভিজ্ঞের গান গাওয়া যে কতদূর সঙ্কোচের ছিল তা সহজেই অনুমেয়। কেবলমাত্র তাঁর স্নেহের প্রশ্রয়ে আমাকে সাহস দিয়েছিল।

তিনি যে আমার কাছে আবৃত্তি ও সঙ্গীত আলাপ শুনেই আমাকে রেহাই দিতেন তা নয়। তিনি তাঁর বিষয় কর্মেও আমার শক্তিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন।

জীবনে যে যশ আজ আমি পাচ্ছি, পৃথিবীর মধ্যে তিনিই তার প্রথম সূচনা ক'রেছিলেন, তাঁর অভিনন্দনের দ্বারা। তিনি আমার অপরিণত আরম্ভের মধ্যে ভবিষ্যতের ছবি তাঁর বিচক্ষণ দৃষ্টি দ্বারা দেখতে পেয়েই তখনি আমাকে কবি সম্বোধনে সম্মানিত করেছিলেন। যিনি উপরের শিখরে থাকেন তিনি যেমন যা সহজে চোখে পড়ে না তাকেও দেখতে পান বীরচন্দ্র ও তেমনি সেদিন আমার মধ্যে অস্পষ্টকে স্পষ্ট দেখেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বে যখন আমি তাঁর আতিথ্য ভোগ করেছিলেম, সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে সাহিত্য সম্বন্ধে নানারকম আলাপ

হ'তো। বৈষ্ণব পদাবলী যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ ও প্রকাশ করবার অভিপ্রায়ে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করবার সঙ্কল্প তাঁর ছিল, কিন্তু তার পরই সহসা তাঁর মৃত্যু হওয়াতে সে সঙ্কল্প সফল হ'তে পারে নি।

বীরচন্দ্রের পুত্র রাধাকিশোর মাণিক্য আমার প্রতি তাঁর পিতৃদত্ত সমাদরের ধারাকে রক্ষা করেছিলেন। অকৃত্রিম স্নেহে তিনি আমাকে কাছে টেনে নিলেন। সেদিন রাজার হাত থেকে যখন কবির তিলক পরেছিলোম, তখন এ কবির যশ সংশয়িত ও সঙ্কীর্ণ ছিল। আমার সে-দিনকার বহু নিন্দা লাঞ্ছিত খ্যাতির প্রতি তার শ্রদ্ধা তিনি সমভাবে রক্ষা করেছিলেন। কেবলমাত্র কবি ব'লেই নয়, সুহৃদ ও ভ্রাতৃভাবে তিনি আমাকে আত্মীয় ক'রে নিয়েছিলেন। সে এমন আত্মীয়তা, যা মিথ্যা স্তুতির প্রত্যাশা করত না, বিরুদ্ধ বাক্যকেও স্বীকার ক'রে নিতে কুণ্ঠিত হ'ত না। মনে আছে, তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন— 'রবিবাবু, আপনি আমাকে আমার ইচ্ছার ও প্রকৃতির প্রতিকূলেও রক্ষা করবেন।'

তাঁর সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে আমি বারংবার এসেছি তাঁর এই অকৃত্রিম স্নেহের টানে।

সে দিনও চ'লে গেছে। শুভ দৈববশতঃ অনেক সম্মান—এমন কি য়ুরোপীয় রাজহস্তেও আমার ভাগ্যে জুটেছে। কিন্তু আমার এই ঘরের এবং স্বদেশের রাজার কাছ থেকে যে সম্মান লাভ ক'রে এসেছি— ব্যক্তিগত জীবনে আমার কাছে তার মূল্য অনেক বেশী। এই জন্যই এই ত্রিপুরার সঙ্গে আমার ক্ষণিক অতিথির সম্বন্ধ নয়। এ সম্বন্ধ এখানকার রাজপিতা ও পিতামহের স্মৃতির সঙ্গেই জড়িত।

আমি একান্ত মনে এই রাজ্যের কল্যাণ কামনা করি। এই রাজ্যের যে দুইজন রাজাকে বিশেষভাবে জান্‌বার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেম তাঁদের রাজোচিত গুণে ও রসজ্ঞতায় আমি মুগ্ধ। এমন সৌজন্য দাক্ষিণ্য ও সহৃদয়তা দেখা যায় না।

এই রাজ পরিবারে বহুকাল থেকে বাংলা ভাষার সম্মান চ'লে আসছে। বস্তুতঃ সকল দেশের ইতিহাসে স্বাভাবিক অবস্থায় দেশের ভাষা কেবল মাতৃভাষা নয়, তা রাজভাষা। দেশের রাজার যেমন কর্ত্তব্য প্রজাকে পালন করা, তেমনি ভাষাকে রক্ষা করা। বিদেশী আচারের মোহে বিক্ষিপ্ত চিত্ত হ'য়ে কোন দিনই দেশীয় রাজন্যবর্গ এই মহৎ দায়িত্ব থেকে যেন বিচ্যুত না হন। এই পরিবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আমি দেখেছি। এই পরিবারের সঙ্গে আমার যোগ সেই অনুরাগ সূত্রে দৃঢ়তর হয়েছিল।

রাধাকিশোর ও বীরচন্দ্রের লেখার মত চিঠি আমি খুব অল্পই দেখেছি। সেগুলি যেমন সংযত, তেমনি সুসংস্কৃত,—তেমনি সরস। মাতৃভাষাকে এমন সুনিপুণ ভাবে ব্যবহার করা এ যে তাঁদের রাজোচিত সৌজন্যেরই অঙ্গ। এই বৈদগ্ধ্যে, স্বদেশের সঙ্গীত-শিল্প-সাহিত্যের এই রসজ্ঞতায় তাঁদের আভিজাত্যের গৌরব ঘোষণা করে। এই সঙ্গে তাঁদের স্বাভাবিক নম্রতা দেখেছি, সেই নম্রতা আমার কাছে তাঁদের চরিত্রের উচ্চতারই পরিচয় দিয়েছিল।

ব্রজেন্দ্রকিশোর তখন বালক, যখন তিনি আমার নিকটে এসেছিলেন। তিনি তাঁর ব্যবহারে ও আচরণে আমার নিকটতম আত্মীয়ের স্থান গ্রহণ করেছেন। বালককাল থেকেই তিনি আমার সঙ্গে পত্র ব্যবহার করতেন। ইহা যে ব্যর্থ হয় নাই ইহাই আমার আনন্দ। আমি ত্রিপুর রাজ্যের আর কোনো হিত যদি না ক'রে থাকি, কেবলমাত্র যদি ব্রজেন্দ্রকিশোরের চরিত্রকে কর্ত্তব্যের দীক্ষায় দৃঢ় করতে পেরে থাকি, তবে তাঁর দ্বারা ত্রিপুরার স্থায়ী কল্যাণ সাধন করতে পেরেছি ব'লে গৌরব করতে পারবো। এই উপলক্ষে আমি তাঁকে আমার সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ দিয়ে যাচ্ছি। আজকের দিনে এখানকার পূর্ব্ব স্মৃতি আমার মনে বিষাদের ছায়া ফেলেচে। আমার একমাত্র আনন্দ, এখানে ব্রজেন্দ্র কিশোরকে দেখলাম। নিজের স্বাস্থ্য ও কাজ উপেক্ষা ক'রেও তাঁর

আমন্ত্রণে এখানে উপস্থিত হয়েছি। এঁর পিতার ও পিতামহের কাছ থেকে যে সমাদর পেয়েছি, আজও তা এঁরই হাত দিয়ে ভোগ করতে পারছি। সেইজন্যে আজ বসন্তে, ত্রিপুরার বনশ্রী যখন দক্ষিণ বাতাসে দিকে দিকে পুষ্পোৎসবের আমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন, তখন আমি এঁরই কাছ থেকে এঁর পিতৃসখারূপে সেই মাল্য গ্রহণ করতে এসেছি, যা এঁর পিতা পিতামহ তাঁদের প্রীতিভাজন এই অতিথির জন্য সজ্জিত করে রেখে দিতেন।

আমি এঁর কল্যাণ কামনা করি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কামনা করি যে, এঁর চরিত্র মহিমায় ত্রিপুর রাজ্যের কল্যাণ বর্দ্ধিত হউক।

এই উপলক্ষে ত্রিপুরার রাজগণের প্রতি আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে ইচ্ছা করি। আজ বিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল শান্তি নিকেতনে বিদ্যায়তন স্থাপন করেছি। সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশের লোকের মধ্যে একমাত্র রাধাকিশোর মাণিক্যের কাছ থেকে আমি নিয়মিত আনুকূল্য পেয়েছি। তিনি স্বয়ং আমাদের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ ক'রে আমাদের আনন্দিত ও সম্মানিত করেছেন। সে সময় আমার এই প্রতিষ্ঠান দৈন্য-পীড়িত ও অধিকাংশের অপরিজ্ঞাত ছিল। অথচ তখনই রাধাকিশোর কেবল যে বার্ষিক অর্থদানের দ্বারা এই শুভ কর্ম্মের সাহায্য করেছিলেন তা নয়, ত্রিপুরার অনেক বালককে ছাত্রবৃত্তি দিয়ে শান্তিনিকেতনে বিদ্যাশিক্ষার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র বীরেন্দ্রমাণিক্যও যে কেবলমাত্র এই দানকে শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করেছিলেন তা নয়, সেকালকার হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করতে পাঁচ হাজার টাকা দিতে স্বীকার ক'রে গিয়েছিলেন। আমার কর্ম্মের প্রতি প্রথম থেকেই তাঁদের এই শ্রদ্ধার স্মৃতি আমার পক্ষে একান্ত সমাদরের সামগ্রী।

অবশেষে কিশোর সাহিত্য সমাজ ও ত্রিপুরার জনসাধারণকে অদ্যকার দিনে আমার জন্যে তাঁদের এই সম্মান আয়োজনের প্রতি-দানস্বরূপ আমার শুভ ইচ্ছাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং

শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাকে যে অভিবাদন করেছেন, তারই প্রত্যভিবাদন জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করি। তাঁদের কাছে আমার এই শেষ কথাটি জানিয়ে যাই যে, আমি যশোভাগ্যবান কবির মত এখানে মান নিতে আসিনি। আমি স্বর্গগত মহারাজদের বন্ধুরূপে যেমন আমার তরুণ বয়সে এখানে প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করেছি, আজ আমার শেষ বয়সে ও সেই আত্মীয়তার শেষ রসটুকু ভোগ করে বলে যেতে এসেছি—

সর্ব্বস্তরতু দুর্গানি সর্ব্বো ভদ্রানি পশ্যতু।"

দেশীয় রাজ্য—১৩১৫ ত্রিপুরাব্দের ১৭ই আষাঢ় "ত্রিপুরা সাহিত্য সম্মিলনী"র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'দেশীয় রাজ্য' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এটি পরে 'বঙ্গদর্শনে' (নবপর্যায়, পঞ্চম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা) প্রকাশিত হয়। রবির আলোচ্য সংখ্যায় এই প্রবন্ধটি উদ্ধৃত হয়েছে। তার থেকে অংশ বিশেষ নিচে দেওয়া গেল। একস্থানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"এই ত্রিপুর রাজ্যের রাজচিহ্নের মধ্যে একটি সংস্কৃত বাক্য অঙ্কিত দেখিয়াছি—"কিলবিদুর্বীরতাং সারমেকং"—বীর্য্যকেই সার বলিয়া জানিবে। এই কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। পার্লামেণ্ট সার নহে, বাণিজ্যতরী সার নহে, বীর্য্যই সার। এই বীর্য্য দেশকাল পাত্রভেদে নানা আকারে প্রকাশিত হয়—কেহ বা শস্ত্রে বীর, কেহ বা শাস্ত্রে বীর, কেহ বা ত্যাগে বীর, কেহ বা ভোগে বীর, কেহ বা ধর্ম্মে বীর, কেহ বা কর্ম্মে বীর। বর্ত্তমানে আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রতিভাকে আমরা পূর্ণ উৎকর্ষের দিকে লইয়া যাইতে পারিতেছি না, তাহার কতকগুলি কারণ আছে,—কিন্তু সর্ব্বপ্রধান কারণ বীর্য্যের অভাব। এই বীর্য্যের দারিদ্র্যবশতঃ যদি নিজের প্রকৃতিকেই ব্যর্থ করিয়া থাকি, তবে বিদেশের অনুকৃতিকে সার্থক করিয়া তুলিব কিসের জোরে।

* * * *

দেশীয় রাজ্যের ভুলত্রুটি মন্দ গতির মধ্যেও আমাদের সান্ত্বনার বিষয় এই যে, তাহাতে যেটুকু লাভ আছে, তাহা বস্তুতই আমাদের নিজের লাভ। তাহা পরের স্কন্ধে চড়িবার লাভ নহে, তাহা নিজের পায়ে চলিবার লাভ। এই কারণেই আমাদের বাংলাদেশের এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতি উৎসুক দৃষ্টি না মেলিয়া আমি থাকিতে পারি না। এই কারণেই এখানকার রাজ্য ব্যবস্থার মধ্যে যে সকল অভাব ও বিঘ্ন দেখিতে পাই তাহাকে আমাদের সমস্ত বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করি। এই কারণে এখানকার রাজ্যশাসনের মধ্যে যদি কোনো অসম্পূর্ণতা বা শৃঙ্খলার অভাব দেখি তবে তাহা লইয়া স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আলোচনা করিতে আমার উৎসাহ হয় না—আমার মাথা হেঁট হইয়া যায়। এই কারণে যদি জানিতে পাই, তুচ্ছ স্বার্থপরতা আপনার সামান্য লাভের জন্য—উপস্থিত ক্ষুদ্র সুবিধার জন্য রাজশ্রীর মন্দির ভিত্তিকে শিথিল করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না, তবে সেই অপরাধকে আমি ক্ষুদ্র রাজ্যের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। এই দেশীয় রাজ্যের লজ্জাকেই যদি যথার্থরূপে আমাদের লজ্জা এবং গৌরবকেই যদি যথার্থরূপে আমাদের গৌরব বলিয়া না বুঝি তবে দেশের সম্বন্ধে আমরা ভুল বুঝিয়াছি।

× × × ×

আমাদের মন্দভাগ্য আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলিকে বিদেশী আপিসের ছাঁচের মধ্যে ঢালিয়া তাহাদিগকে কলরূপে বানাইয়া না তোলে—এই সকল স্থানেই আমরা স্বদেশ লক্ষ্মীর স্তন্যসিক্ত স্নিগ্ধ বক্ষস্থলের সজীব কোমল মাতৃস্পর্শ লাভ করিয়া যাইতে পারি, এই আমাদের কামনা। মা যেন এখানেও কেবল কতকগুলো ছাপমারা লেপাফার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া না থাকেন—দেশের ভাষা, দেশের সাহিত্য, দেশের শিল্প, দেশের রুচি, দেশের কান্তি এখানে যেন মাতৃকক্ষে আশ্রয় লাভ করে এবং দেশের শক্তি মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত আপনাকে অতি সহজে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিতে পারে।"

রাজর্ষি ও বিসর্জন—এই সংখ্যায় সত্যরঞ্জন বসুর "রাজর্ষি ও বিসর্জন" প্রবন্ধটি অত্যন্ত মূল্যবান। এর থেকে আমরা জানতে পারি, 'রাজর্ষি' উপন্যাস লেখার সময় গোবিন্দমাণিক্যের প্রকৃত ইতিহাস জানাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বীরচন্দ্র মাণিক্যকে পত্র লেখেন। বীরচন্দ্র মাণিক্য তার উত্তর দিয়েছিলেন এবং 'রাজরত্নাকর' থেকে ছাপিয়ে অংশ বিশেষ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। "ভগ্নহৃদয়" প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথকে বীরচন্দ্র অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এই পত্র ব্যবহার তার পরের ঘটনা। তখনো দু'জনের সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নি। রবীন্দ্রনাথের পত্র ও বীরচন্দ্রের উত্তর নিচে দেওয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথের পত্র

ওঁ ২৩শে বৈশাখ, ১২৯৩ সন

বুধবার

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

আপনাদের রাজপরিবারের সহিত আমাদের পরিবারের পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় আছে এইরূপ শুনিতে পাই—সেই জন্য সাহসী হইয়া মহারাজকে পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের পূর্ব্বকার সম্বন্ধ মহারাজের স্মরণে আসে এই আমার অভিপ্রায়।

মহারাজ বোধ করি শুনিয়া থাকিবেন যে, আমি ত্রিপুরা রাজ বংশের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া 'রাজর্ষি' নামক একটি উপন্যাস লিখিতেছি। কিন্তু তাহাতে ইতিহাস রক্ষা করিতে পারি নাই। তাহার কারণ ইতিহাস পাই নাই। এজন্য আপনাদের কাছে মার্জ্জনা প্রার্থনা বিহিত বিবেচনা করিতেছি। এখন যদিও অনেক বিলম্ব হইয়াছে, তথাপি মহারাজ যদি গোবিন্দমাণিক্য ও তাহার ভ্রাতার রাজত্ব সময়ের সবিশেষ ইতিহাস আমাকে প্রেরণ করিতে অনুমতি

করেন তবে আমি যথাসাধ্য পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করি। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য তাঁহার নির্ব্বাসন দশায় চট্টগ্রামের কোন্ স্থানে কিরূপ অবস্থায় ছিলেন যদি জানিতে পাই তবে আমার যথেষ্ট সাহায্য হয়। প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরের এবং ঐতিহাসিক ত্রিপুরার অন্যান্য স্থানের ফটোগ্রাফ যদি পাওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলেও আমার উপকার হয়।

এই পত্রের উত্তর পাইলে এবং মহারাজের সহিত আলাপ হইলে আমি সৌভাগ্য জ্ঞান করিব।

প্রণত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ

৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন

যোড়াসাঁকো

কলিকাতা

বয়োজ্যেষ্ঠ বীরচন্দ্রকে চিঠি লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজের নামের আগে 'প্রণত' লিখেছেন। এতেই বোঝা যায় তিনি কি রকম ব্রাহ্মণ্য সংস্কার মুক্ত ছিলেন।

বীরচন্দ্রের উত্তর

শ্রীহরি

সদগুণান্বিতেষু

আপনার পত্র পাইয়া যার পর নাই সুখী হইলাম। লিখিয়াছেন, আমাদের পরিবারের সহিত আপনাদের পরিবারের যে সম্বন্ধ ছিল তাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়াই আপনার উদ্দেশ্য। সে সুখের সম্বন্ধ আমি ভুলি নাই। আপনি পুনরায় তাহার গৌরব করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তজ্জন্য বিশেষ আপ্যায়িত ও বাধিত হইলাম। ভরসা করি মধ্যে মধ্যে আপনার অবসর মতে এইরূপ অমায়িক ভাবপূর্ণ পত্র পাইব।

'মুকুট' ও 'রাজর্ষি' নামক দুইটি প্রবন্ধই আমি পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে যে স্খলন হইয়াছে তাহা সংশোধন করা আপনার বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না।

'রাজরত্নাকর' নামে ত্রিপুর রাজবংশের একখানা ধারাবাহিক সংস্কৃত ইতিহাস আছে। এই গ্রন্থ ধর্ম্ম মাণিক্যের রাজত্ব সময়ে সঙ্কলিত হইতে আরম্ভ হয়। ধর্ম্ম মাণিক্য "জীবারি বসু মানে" ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ত্রিপুরা ৮৬৮ সনে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এখন ত্রৈপুর ১২৯৬ সন। উক্ত 'রাজরত্নাকরে' আর একখানা প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'রাজমালার' উল্লেখ আছে। কিন্তু সেই প্রাচীন রাজমালা এখন কোথাও অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না। 'রাজমালা' বলিয়া যাহা প্রচলিত তাহা রাজরত্নাকর হইতে সংক্ষিপ্ত ও সংগৃহীত এবং বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত। সাধারণে পাঠ করিয়া যেন অনায়াসে বুঝিতে পারে এই অভিপ্রায়েই দ্বিতীয় রাজমালা রচিত হইয়াছে। ইহাতে মহারাজ দৈত্যের জীবনবৃত্ত হইতে বর্ণিত আছে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অনেক রাজার ইতিহাস নাই। দ্বিতীয় বাঙ্গালা রাজমালার লেখককে আমি বালক বয়সে দেখিয়াছি। এতদ্ভিন্ন ঐরূপ বাঙ্গালা কবিতায় কেবল ৺কৃষ্ণ মাণিক্য মহারাজার চরিত্র অবলম্বন করিয়া একখানা ইতিহাস আছে, উহার নাম কৃষ্ণমালা। পার্ব্বতীয় প্রজাগণের মধ্যে এরূপ প্রথা আছে যে তাহারা নিজ নিজ ভাষায় রচনা করিয়া মহারাজগণের জীবন চরিতের কোন বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে গান করিয়া থাকে। সেই গানগুলি হইতে অনেক বিবরণ সংগৃহীত হইতে পারে। মন্দিরের ফলক ও সনদ পত্রাদি হইতেও যে ইতিহাসের অনেক ঘটনা সংগৃহীত হইবার সুবিধা আছে তাহা বলাই বাহুল্য।

আপনি যে ত্রিপুর ইতিহাস অবলম্বন করিয়া নবন্যাস লিখিতে যত্ন করিতেছেন, ইহাতে আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। যে যে স্থানে ইতিহাসের সহায়তা প্রয়োজন হয়—আমি আদরের সহিত পূর্ব্বোক্ত

নানা মূল হইতে তাহা সঙ্কলন করিয়া দিতে প্রস্তত আছি। আপনার অপরাপর বিষয়ে প্রশংসিত প্রবন্ধগুলিতে ইতিহাসের যথাযথ ব্যাখ্যা থাকে, ইহা আমারও একান্ত বাসনা। ঐতিহাসিক কোন বিশেষ ভাগের সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ সময় মধ্যে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে কেবল রাজরত্নাকর হইতে যে সহায়তা পাওয়া যায় তাহাই দিতে পারিব। একটুকু সময় থাকিতে জিজ্ঞাসা হইলে স্থানীয় অবস্থা সংগ্রহ করিয়াও জানাইতে চেষ্টা করিব। বোধ হয় শেষোক্ত প্রণালী আপনার সন্তোষজনক হইবে।

আমার পূর্ব্বপুরুষগণের উদয়পুর ব্যতীত ধর্ম্মনগর, কল্যাণপুর, অমরপুর প্রভৃতি স্থানেও রাজধানী ছিল। সেই সেই স্থলেও অনেক কীর্ত্তি কলাপের চিহ্ন পাওয়া যায়। আপনার প্রয়োজন হইলে সে সকল স্থানেরও ইতিহাস জানাইতে পারিব।

উদয়পুরের যে কয়েকখানা ফটোগ্রাফ আছে তাহার বিবরণ লিখিয়া ইহার পর তাহা আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব।

'রাজরত্নাকরে' গোবিন্দমাণিক্য ও তাহার ভ্রাতা ছত্রমাণিক্যের চরিত্র যেরূপ বর্ণিত আছে তাহা নকল করান হইয়াছে সত্বর ছাপান যাইতে পারে কিনা উদ্যোগ করিতেছি। মুদ্রাঙ্কন শেষ হইলে আপনার নিকট পাঠান যাইবে। 'রাজর্ষির' কোন কোন স্থলে ইতিহাস রক্ষিত হয় নাই তাহা রাজরত্নাকরের উক্ত উদ্ধৃত ভাগ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

'রাজরত্নাকর' ছাপাইবার উদ্যোগে আছি। সমুদয় আয়োজন হইয়া উঠে নাই। যদি ঈশ্বর ইচ্ছায় ছাপা হইতে পারে তবে আপনাকে একখণ্ড পাঠাইয়া দিব।

'রাজরত্নাকর' পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক দুইটি ভাগ আছে। পৌরাণিক ভাগে মহারাজ দৈত্য প্রভৃতির জীবনচরিত এবং ঐতিহাসিক ভাগে যখন বাঙ্গালা যবনাধিকারে ছিল—সেই সময়ের অনেকানেক

ভাগ নিতান্ত সুন্দর। সেই অংশ অবলম্বন করিয়া আপনি নবন্যাস লিখিলে অপেক্ষাকৃত অনেক প্রশংসনীয় হইবে এরূপ আমার বিশ্বাস।

এথাকার কুশল। আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীন নিরাময় সংবাদ দানে সুখী করিবেন। ইতি ১২৯৬ ত্রিপুরা—তাং ১৮ই জ্যৈষ্ঠ।

প্রণত—

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা

উভয় পত্রে যে পারিবারিক পূর্বসম্পর্কের কথার উল্লেখ আছে তা মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের কথা। কর্নেল মহিমচন্দ্রের 'দেশীয় রাজ্য' গ্রন্থের আলোচনায় আমরা তার উল্লেখ করেছি।

যে-সংস্কৃত রাজমালা অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না ব'লে মহারাজ লিখেছেন তা পরে আগরতলার উজির বাড়িতে পাওয়া গেছে।

এখানে আরেকটা কথা বলা দরকার। বীরচন্দ্র লিখেছেন বাঙলা রাজমালার লেখককে তিনি বাল্যকালে দেখেছেন। এই বাঙলা রাজমালার রচনা আরম্ভ হয় ধর্ম্মমাণিক্যের সময়ে। পাঁচশ বছরের আগেকার গ্রন্থের রচয়িতাকে বীরচন্দ্রের দেখা অসম্ভব। বোধ হয় তিনি কোন অনুলেখককে দেখে থাকবেন। রাজমালার একখানা পাণ্ডুলিপি আলোচনায় জানা যায় তা ১২৫৬ ত্রিপুরাব্দের লেখা। এ সময় আরো অনুলেখন হয়। বীরচন্দ্রের বয়সের হিসেবে এটা তার শৈশবের কথা। তাই মনে হয় তিনি কোন অনুলেখকের কথাই বলেছেন। কারণ বাঙলা রাজমালার প্রাচীনত্ব সন্দেহের অতীত।

'রবি'র এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের চারখানা পত্র আছে। পত্রগুলি ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে লেখা। প্রথম পত্রের একাংশ উল্লেখ ক'রে এ অধ্যায় শেষ করছি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"মনে দৃঢ়রূপে জান যে দারিদ্র্যে অপমান নাই। কৌপীনেও লজ্জা নাই, চৌকি টেবিল প্রভৃতি আসবাবের অভাবে লেশমাত্র

অসভ্যতা নাই। যাহারা ধন সম্পদ বাণিজ্য ব্যবসায় আসবাব আয়োজনের প্রাচুর্য্যকেই সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া প্রচার করে তাহারা বর্ব্বরতাকেই সভ্যতা বলিয়া স্পর্দ্ধা করে। শান্তিতে, সন্তোষে, মঙ্গলে, ক্ষমায়, জ্ঞানে, ধ্যানেই সভ্যতা; সহিষ্ণু হইয়া, সংযত হইয়া, পবিত্র হইয়া, আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত হইয়া, বাহিরের সমস্ত কলরব ও আকর্ষণকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত একাগ্র সাধনার দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম দেশের সন্তান হইতে, প্রথমতম সভ্যতার অধিকারী হইতে, পরমতম বন্ধনমুক্তির আস্বাদ লাভ করিতে প্রস্তুত হও। তুমি মুখে কোনো বাদ-প্রতিবাদ করিয়া অনর্থক সঙ্ঘর্ষে বল নষ্ট করিয়ো না—স্তব্ধ মৌনভাবে অটল নিষ্ঠার সহিত ভারতবর্ষের নিকট একান্তচিত্তে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ কর।

* * * *

ভারতবর্ষের আশীর্ব্বাদ তোমাকে রক্ষা করুক, ঈশ্বরের অভয়হস্ত তোমাকে রক্ষা করুক, তোমার নিজের প্রতিভা তোমাকে রক্ষা করুক। বিদেশী ম্লেচ্ছতাকে বরণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়, ইহা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়ো। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

পরিশিষ্ট

ভারত-ভাস্কর রবীন্দ্রনাথ

১৩৪৮ বাঙলার পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের আশি বছর পূর্ণ হয়। এ উপলক্ষে দেশময় রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র ত্রিপুরাও পিছিয়ে রইল না। মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর ত্রিপুরায় রবীন্দ্র জয়ন্তী দরবার আহ্বান ক'রে রাজকীয় প্রথানুযায়ী যথাবিধি কবিকে 'ভারত ভাস্কর' উপাধিতে ভূষিত করেন। মহারাজের রোবকারী কবির হাতে সমর্পণ করবার জন্য ত্রিপুরা থেকে শান্তি নিকেতনে রাজদূত প্রেরিত হয়।

ত্রিশে বৈশাখ উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্যে কবির হাতে রোবকারী সমর্পিত হয়। কবি সাদরে তা গ্রহণ করেন। কবির শরীর অসুস্থ থাকায় তাঁর ভাষণ পাঠ করেন তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ।

মহারাজের রোবকারী ও কবির ভাষণের অনুলিপি নিচে দেওয়া গেল।

রোবকারী

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চ শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্মা বাহাদুর কে-সি-এস-আই। এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরারাজ্য।

নরপতেরাদেশোয়ং কারকবর্গেষু প্রচরতু পরমস্তু বিরাজতে রাজধানী —হস্তিনাপুরী। ইতি—

১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২৫শে বৈশাখ।

যেহেতু বাঙ্গালার তথা সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব বিশ্ববরেণ্য জনপ্রিয় কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের অশীতিতম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে জয়ন্তী উৎসব হওয়া এপক্ষের অভিপ্রেত ;—

যেহেতু মর্ত্ত্য দেহে অমৃতের অনুসন্ধানই মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ— "মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি এতাবদনুশাসনম্" ঋষিরা কাব্যের ভিতর দিয়া ভগবদ্‌সত্তাকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ জগৎকে দিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনায় অঙ্কুরোদগত সেই অমর জ্যোতিঃ প্রকাশ এ রাজ্যের তদানীন্তন অধীশ্বর এপক্ষের প্রপিতামহ গুণী রসিক মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরকে আকর্ষণ করায়—তিনিই তরুণ কবিকে রাজ-অভিনন্দনে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন—

যেহেতু এপক্ষের পিতামহ ত্রিপুরা রাজ্যে নব-যুগ-আলোকবাহী মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সহিত অকৃত্রিম সৌহৃদ্য-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া কবিবর নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যে কাব্যে ও চিন্তাধারায় এরাজ্যের কল্যাণ কামনা করিয়া আসিতেছেন—যেহেতু কবিবরের সপ্ততিতম জয়ন্তী উৎসবে কলিকাতা-নগরীতে হোতৃকার্য্যে বৃত হইবার গৌরব লাভ এপক্ষের হইয়াছিল, তদ্ধেতু অশীতিতম জন্ম-বার্ষিকী দিবসে ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনার আলোকস্তম্ভ স্বরূপ কবিবরকে তদীয় পরিণত প্রতিভা-যুগে সসম্ভ্রমে অভিনন্দিত করা ত্রিপুর-রাজের কর্ত্তব্য—

"জ্যোৎস্নাভিরাহত মহহৃদয়ান্ধকারম্"—

অতএব

এই উৎসব জয়ন্তীকে চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়কে

"ভারত-ভাস্কর"

আখ্যায় ভূষিত করা যায়;—

এবং

শ্রীভগবান্ তদীয় আশীর্ব্বাদে কবিবরকে সুস্থ দেহে শতবর্ষ ভোগ করিবার সুযোগ দান করুন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষণ

"ত্রিপুরা রাজবংশ থেকে একদা আমি যে অপ্রত্যাশিত সম্মান পেয়েছিলাম আজ তা বিশেষ ক'রে স্মরণ করবার দিন উপস্থিত হয়েছে। এরকম অপ্রত্যাশিত সম্মান ইতিহাসে দুর্লভ। যেদিন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য এই কথাটি আমাকে জানাবার জন্য তাঁর দূত আমার কাছে প্রেরণ করেছিলেন যে তিনি আমার তৎকালীন রচনার মধ্যেই একটি বৃহৎ ভবিষ্যতের সূচনা দেখছেন, সেদিন একথাটি সম্পূর্ণ আশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

আমার তখন বয়স অল্প, লেখার পরিমাণ কম এবং দেশের অধিকাংশ পাঠক তাকে বাল্যলীলা বলে বিদ্রূপ করতো। বীরচন্দ্র তা জানতেন এবং তাতে তিনি দুঃখবোধ করেছিলেন। সেইজন্য তাঁর একটি প্রস্তাব ছিল এই, লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি একটি নূতন ছাপাখানা কিনবেন এবং সেই ছাপাখানায় আমার অলঙ্কৃত কবিতার সংস্করণ ছাপানো হ'বে। তখন তিনি ছিলেন কার্শিয়াং পাহাড়ে, বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য। কলকাতায় ফিরে এসে অল্পকালের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। আমি মনে ভাবলুম এই মৃত্যুতে রাজবংশের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বসূত্র ছিন্ন হ'য়ে গেল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তা হয়নি।

কবি-বালকের প্রতি তাঁর পিতার স্নেহ ও শ্রদ্ধার ধারা মহারাজ রাধাকিশোরের মধ্যেও সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন রয়ে গেল। অথচ সে সময়ে তিনি ঘোরতর বৈষয়িক দুর্য্যোগের দ্বারা দিবারাত্রি অভিভূত ছিলেন। তিনি আমাকে একদিনের জন্যও ভোলেন নি। তারপর থেকে নিরন্তর তাঁর আতিথ্য ভোগ করেছি এবং আমার প্রতি তাঁর স্নেহ কোনদিন কুণ্ঠিত হয়নি যদি চ রাজসন্নিধ্যের পরিবেশ নানা সন্দেহ বিরোধ দ্বারা কণ্টকিত। তিনি সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে ছিলেন পাছে আমাকে কোনো গোপন অসম্মান আঘাত করে। এমন কি তিনি আমাকে নিজেই স্পষ্ট বলেছেন, আপনি আমার চারিদিকের পারিষদদের ব্যবহারের বাধা

অতিক্রম করেও যেন আমার কাছে সুস্থ মনে আসতে পারেন, এই আমি কামনা করি। একারণে যে অল্পকাল তিনি বেঁচেছিলেন কোনো বাধাকেই আমি গণ্য করি নি।

যে অপরিণত বয়স্ক কবির খ্যাতির পথ সম্পূর্ণ সংশয় সঙ্কুল ছিল তার সঙ্গে কোনো রাজত্ব গৌরবের অধিকারীর এমন অবারিত ও অহৈতুক সখ্য সম্বন্ধের বিবরণ সাহিত্যের ইতিহাসে দুর্লভ। সেই রাজবংশের এই সম্মান মূর্ত্ত পদবী দ্বারা আমার স্বল্পাবশিষ্ট আয়ুর দিগন্তকে আজ দীপ্যমান করেছে। আমার আনন্দের একটি বিশেষ কারণ ঘটেছে, বর্ত্তমান মহারাজ অত্যাচার পীড়িত বহুসংখ্যক দুর্গতিগ্রস্ত লোককে যে রকম অসামান্য বদান্যতার দ্বারা আশ্রয় দান করেছেন তার বিবরণ প'ড়ে আমার মন গর্ব্বে এবং আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিল। বুঝতে পারলুম তাঁর বংশগত রাজ-উপাধি আজ বাংলাদেশের সর্ব্বজনের মনে সার্থকতর হোয়ে মুদ্রিত হোল। এর সঙ্গে বঙ্গলক্ষ্মীর সকরুণ আশীর্বাদ চিরকালের জন্য তাঁর রাজকুলকে শুভ শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত ক'রে তুলেছে। এবংশের সকলের চেয়ে বড় গৌরব আজ পূর্ণ বিকশিত হ'য়ে উঠলো এবং এইদিনে রাজহস্ত থেকে আমি যে পদবী ও অর্ঘ্য পেলেম তা সগৌরবে গ্রহণ করি এবং আশীর্ব্বাদ করি এই মহাপুণ্যের ফল মহারাজের জীবনযাত্রার পথকে উত্তরোত্তর নবতর কল্যাণের দিকে যেন অগ্রসর করতে থাকে। আজ আমার দেহ দুর্ব্বল, আমার ক্ষীণকণ্ঠ সমস্ত দেশের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁর জয় ধ্বনিতে কবি জীবনের অন্তিম শুভকামনা মিশ্রিত ক'রে দিয়ে মহা নৈঃশব্দের মধ্যে শান্তি লাভ করুক।"

কবির ভাষণটি ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীর সংক্ষিপ্ত 'রাজমালা' থেকে উদ্ধৃত।